Content

প্রশ্নোত্তরে

রমযানের ত্রিশ শিক্ষা

মূলঃ

ডা. জাকির নায়েক

islamerpath

www.islamerpath.wordpress.com

সূচিপত্র

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, অনেকে রমযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য বলে যে, 'রমযানুল মুবারক' কিন্তু কিছু লোক এটাকে বলে যে এটি বিদআত, আবার কিছু লোক বলে এটা সুন্নাত। এ বিষয়ে সঠিক মত কোনটি?

রমযানের ২য় শিক্ষা - ৪৬

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: আসসালামু আলাইকুম। আজকের আলোচনায় আমরা রমযান এবং এর পরিচিতি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। ডা. জাকির নায়েক, রমযানের পরিচয়টা কোনোভাবেই যথাযথ হবে না যদি প্রথমে এর সংজ্ঞাটা না দেওয়া হয়। সুতরাং আলোচনার শুরুতে আপনি কি রমযানের সংজ্ঞাটা দিতে পারবেন?

প্রশ্ন: আপনার রমযান সম্পর্কে দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে রোযার কথাটি বলা হয়েছে, যেটিকে আরবিতে সাওম এবং ইংরেজিতে বলা হয় Fasting। রমযানের আলোকে আপনি বলবেন কি, Fasting অথবা সাওম শব্দটি কীভাবে রমযানের সাথে জড়িত?

প্রশ্ন: রমযান মাসের বাইরে কি আর কোনো রোযা আছে যেটি মুসলমানদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে?

প্রশ্ন: দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক ভাইবোন আছে যারা পবিত্র রমযান মাসে রমযানের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাগুরো অবহেলা করে। এ ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে আপনি কিছু উপদেশ দিন। তাছাড়া রমযান মাসে মুসলমানদের জন্য রোযা রাখা ফরজ এই ব্যাপারটি প্রমাণ করলে খুশি হবে।

প্রশ্ন: এই প্রশ্নটি রমযানের ইতিহাস সংক্রান্ত। আসলে যেসব জিনিসগুলো রোযা ভেঙ্গে দেয় সেই সব ব্যাপারে বলেছেন কিন্তু রোযা ভেঙ্গে দেয় এমন সব ব্যাপার থেকে বিরত থাকার নির্দিষ্ট সময়সীমা কী এবং ঠিক কোন সময়ে মুসলমানদের জন্য এগুলো আরম্ভ হয়েছিলো?

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমে রোযা তিন দিনের জন্য ফরজ ছিলো এবং পরবর্তীতে এটি রমযানের পুরোমাস করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআনে সাংঘর্ষিক কিছু পরিলক্ষিত হয় কি?

প্রশ্ন: রমযান মাসে কি শুধু খাওয়া দাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে নাকি এর সাথে আরো অন্য কোনো নির্দেশনা রয়েছে?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: ডা. জাকির, আমি দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। প্রথমত, প্রত্যেক রোযা রাখার সময় কি নিয়ত করতে হবে? দ্বিতীয়ত, নিয়তটি ঠিক কোন সময়ে করতে হবে? এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

প্রশ্ন: যখন রমযান উপস্থিত হয় তখন আমাদের কি করা উচিৎ?

প্রশ্ন: আমাদের মাঝে রমযান মাস উপস্থিত হলে আমাদের কী করা উচিত? আপনার পক্ষ হতে রমযান মাসের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপদেশ দিন।

প্রশ্ন: রমযান কি ভ্রাতৃত্ববন্ধনের জন্য বিশেষ কোন বার্তা বহন করে?

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার : রমযান মাসে কি সকল মুসলিমের উপর রোযা ফরজ নাকে নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপের উপর?

প্রশ্ন: তাহলে রোযা কি শুধু মুসলমানদের উপর ফরজ, অমুসলিমদের উপর নয়?

প্রশ্ন: রোযার নিয়মকানুন অনুসারে রোযা রাখার জন্য সর্বোত্তম বয়স কী?

প্রশ্ন: রমযান মাসে যে সব লোক রোযা থেকে দায়মুক্ত আপনি কি তাদের একটি তালিকা দিতে পারবেন?

প্রশ্ন: তালিকায় উল্লিখিত সকলকেই কি পরবর্তীতে আগের না রাখার রোযাগুলো পূরণ করতে হবে?

প্রশ্ন: শিশু অর্থাৎ যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন কেউ যদি রোযা রাখে বা রাখতে চায় তাহলে এর জন্য আপনার কি মতামত?

প্রশ্ন: মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে কেন?

প্রশ্ন: যখন কোনো নারী ঋতুমতী কিংবা সন্তানপ্রসব উত্তর রক্তক্ষরণের ভিতরে থাকে তখন তার জন্য রোযা রাখাটা কি নিষিদ্ধ নাকি ঐচ্ছিক?

প্রশ্ন: যে সব লোক বিভিন্ন সাধারণ অসুস্থতা যেমন- স্বল্প অসুস্থতা, মাথাব্যথা, পেটেব্যথা ইত্যাদিতে ভোগে তাহলে কি ওই ব্যক্তিও রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি পাবে?

প্রশ্ন: যে সব লোকেরা রোযা রাখতে অক্ষম, তারা তাদের অক্ষমতার কারণে না রাখতে পারা রোযাগুলোর জন্য খেসারত দেবে কেন?

প্রশ্ন: কোন শ্রেণীর বৃদ্ধ ব্যক্তিরা রোযার দায় থেকে মুক্ত?

প্রশ্ন: মুসাফির অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভ্রমণ করছে তার জন্য রোযা নিষিদ্ধ নাকি ঐচ্ছিক?

প্রশ্ন: ভ্রমণকালে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সেকি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অধিক পুরস্কার লাভ করবে?

প্রশ্ন: জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি রোযা হতে মুক্ত কেন?

প্রশ্ন: রমযান মাসে যে সব জিনিস রোযা বাতিল করে দেয় আপনি কি সেগুলো একটি তালিকা দিতে পারবেন?

প্রশ্ন: আপনার উল্লিখিত দশটি বিষয়ের ভেতরে কোন বিষয়টি সবচেয়ে মারাত্মক এবং ক্ষতিকর যেটি রোযা বাতিল করে দেয়?

প্রশ্ন: এটির পরে দ্বিতীয় মারাত্মক অন্যায় কাজ কোনটি যেটি রোযা বাতিল করে দেয়?

প্রশ্ন: যে মহিলা ঋতুমতী অবস্থায় থাকে তখন তার জন্য নামাজ মাফ করে দেওয়া হয় যেটি পরবর্তীতে তাকে এর জন্য কাযা আদায় করতে হয় না এবং রোযার জন্যও কি মহিলাদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য? অর্থাৎ মাসিকের সময় বাদ দেওয়া রোযাগুলো পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না? এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন-

প্রশ্ন: ডা. জাকির, যে ধরেন একজন লোক সেহেরির পরে যদি কখনও অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন খাবারের কণা আঁটকে থাকে তার দাঁতের ফাকে আর তারপর যেহেতু আমাদের মুখের ভিতরে লালা আছে তাই ধরুন সেই খাদ্যকণা গলা দিয়ে চলে গেল পাকস্থলীতে। ধরেন সেই

খাদ্যকণাটা সে গিলে ফেলল, এখন এই অবস্থায় পড়লে তার রোযা কি ভেঙ্গে যাবে নাকি না? আর এর সাথে আমরা আরো একটা বিষয় জানতে চাই যদি কেউ নিজের লালা গিলে ফেলে সে ক্ষেত্রে তার কী করতে হবে?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি রোযা থাক অবস্থায় অসাবধানতাবশত কিছু খেয়ে ফেলে তবে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, এটাকে কি গুরুতর পাপ বলে ধরা যেতে পারে?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি রোযা থাক অবস্থায় অসাবধানতাবশত কিছু খেয়ে ফেলে তবে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, এটাকে কি গুরুতর পাপ বলে ধরা যেতে পারে?

প্রশ্ন: যদি কোনো রোযাদার ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্য খায় বা পান করে তাহলে তার জন্য কি পরবর্তীতে রোযা পূরণ করতে হবে? এটা কি গ্রহণযোগ্য?

প্রশ্ন: ডা. জাকির কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে ধূমপান করা হারাম। এ ব্যাপারে আমি আপনার মতামতটা জানতে চাই। আর ধূমপান করলে কি আমাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে কেউ যদি বিয়ে করে তাহলে সেই বিয়ের অনুমতি আছে কি?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযা অবস্থায় কি একজন লোক রক্ত গ্রহণ করতে পারে অথবা কোনো ইনজেকশন নিতে পারে, যেটাতে তার শরীর পুষ্টি গ্রহণ করবে। এটার কি অনুমতি আছে?

প্রশ্ন: একজন লোক দান করতে পারবে কি তার নিজের শরীর থেকে, যেমন ধরেন রক্তদান করা। রোযা অবস্থায় কি এটার অনুমতি আছে।

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: কিয়াম আল লাইল শব্দের অর্থ কী? এবং তারাবী নামাজের সাথে এর পার্থক্য কী?

প্রশ্ন: ইসলামে রাত্রিকালীন নামাজের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কতখানি?

প্রশ্ন: রমযান মাসে যেসব কিয়াম আল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাজ পড়া হয় সে ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

প্রশ্ন: কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে কিয়ামুল লাইলের নামাজ একাকী পড়তে হবে নাকি জামাআতে পড়তে হবে?

প্রশ্ন: কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাজ আদায়ের আদবগুলো কী কী?

প্রশ্ন: রাতের কোন অংশে কিয়ামুল লাইলের নামাজ আদায় করা উত্তম?

প্রশ্ন: কিয়ামুল লাইল কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা আছে কি?

প্রশ্ন: অনেকে বলেন যে, রমযানের রাতে জামাআতে কিয়ামুল লাইল নামজের প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রা.) এবং তারা বলে যে এটা বিদাআত। এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন কী?

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য মসজিদে তারাবীর নামাজ পড়ার অনুমোদন আছে কি?

প্রশ্ন: তারাবীর নামাজ সুন্নাত না ফরজ? কোনো লোক এই নামাজ এড়িয়ে যেতে পারবে কি?

প্রশ্ন: কিছু ইমাম অনেক দ্রুত রুকূ, সিজদা করে থাকে যেটা নামাজ অনেক জটিল করে দেয়। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

প্রশ্ন: রমযান মাসের তারাবি নামাজে কুরআন খতম দেওয়া কি বাধ্যতামূলক? মুসল্লিদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত শোনা বাধ্যতামূলক কি?

প্রশ্ন: মহিলারা যদি তাদের বাড়িতে জামাআতে নামাজ আদায় করে তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ইমামকে অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছে সে যদি ইমামের সামনে কুরআন ধরে রাখে যেখান থেকে ইমাম তিলাওয়াত করছে, তবে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: যদি কেউ মসজিদে তারাবির নামাজ ইমামের পিছনে আদায় করে এবং সে যদি পরে অনেক তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে চায় তাহলে সে কি ইমামের পিছনে বিতরের নামাজ আদায় করবে নাকি ইমামের পিছনে আদায় করার পর আবারও দ্বিতীয়বার বিতর করবে?

প্রশ্ন: প্রতি রাকাআতে কুরআনের কতটুকু আদায় করতে হবে?

প্রশ্ন: বাড়িতে তারাবি নামাজ আদায় করা গ্রহণযোগ্য কি? যদি স্বামী, সন্তান এবং তার জামাআতে ইমামতি করে তবে সে কি যারা মসজিদে যায় তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে?

রমযানের ৫ম শিক্ষা - ১০২

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে নিয়মিতভাবে মুসলমানরা একই ধরনের ভুলের ভেতর পতিত হওয়ার কারণসমূহ কী?

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে মুসলমানরা আরো কী কী সাধারণ ত্রুটি করে থাকে?

প্রশ্ন: আপনি কি রমযান মাসে কৃত সাধারণ ত্রুটিসমূহের একটি তালিকা দিতে পারবেন; শ্রেণী ১ এবং ২ এর আলোকে?

প্রশ্ন: তৃতীয় শ্রেণীর ভুলত্রুটি সম্পর্কে আপনি সংক্ষেপে আমাদেরকে কিছু বলতে পারবেন?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রমযান মাসে কৃত চতুর্থ শ্রেণীর অন্যায় ত্রুটিগুলো কী?

প্রশ্ন: আপনি কী এমন কোনো ভুলত্রুটি দেখতে পান যেগুলো বিশেষ করে বিভিন্ন দেশ এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত?

প্রশ্ন: ডা. জাকির আপনি আমাদেরকে এমন কোনো সুন্নাতের কথা বলতে পারেন যেটি মুসলমানরা এই ভেবে এড়িয়ে যাচ্ছে যে, এটি পালন করলে তাদের রোযা বাতিল হয়ে যাবে?

প্রশ্ন: এটি খুব সাধারণ এবং সকলের মনে উদয় হওয়া একটি প্রশ্ন তাহলো, রমযান মাসে যদি সব শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে তাহলে রমযান মাসে মানুষ নিয়মিতভাবে পাপ করতে থাকে কীভাবে?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: হাদীসে বলা হয়েছে যে, পবিত্র রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাহলে এটা কি এই অর্থ বহন করে যে, যারা রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করবে তারা সকলেই বেহেশতবাসী হবে?

রমযানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শিক্ষা - ১১৯

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ইসলামে রমযানের ফরজ রোযার পাশাপাশি অন্য কোনো রোযা আছে কি?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) ফরজ রোযার বাইরে আর কোন কোন রোযার ব্যাপারে তাগিদ করেছেন?

প্রশ্ন: এই নয় প্রকারের ঐচ্ছিক রোযার মধ্যে কোন রোযাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

প্রশ্ন: আরাফার দিনের রোযার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন কি? হজ্বকারীদেরও কি এই রোযা রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার গুরুত্ব কতখানি?

প্রশ্ন: শাওয়াল মাসের রোযার জন্য মুহাম্মদ (ﷺ) কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কি? এবং শাওয়ালের রোযা নিয়মিতভাবে এলোমেলোভাবে রাখা যাবে কি?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) শুধু ছয়টি রোযা রাখতে বললেন কেন, এটাতো ৫, ৮ কিংবা ৯ দিনেরও হতে পারতো? (শাওয়াল মাসের ক্ষেত্রে)

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) শা'বান মাসে রোযা রাখার জন্য বলেছেন কি?

প্রশ্ন: নিষিদ্ধ মাস বলতে কী বোঝায় এবং সেই মাসগুলো কী কী?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখার কথা বলেছেন কেন?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন?

প্রশ্ন: দাউদ (আ.)- এর রোযার গুরুত্ব কতখানি এবং তিনি কীভাবে রোযা রাখতেন?

প্রশ্ন: ফরজ রোযার সাথে ঐচ্ছিক রোযার পার্থক্য কী?

প্রশ্ন: কোন কোন দিনে বা মাসের রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না?

প্রশ্ন: দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষেধ কেন?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদুল আযহার পরের তিন দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন কেন?

প্রশ্ন: সন্দেহজনক দিন বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন: শুধু শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ কেন?

প্রশ্ন: শুধুমাত্র শনিবারকে ঐচ্ছিক রোযা রাখার জন্য বেছে নেওয়া যাবে না কেন?

প্রশ্ন: আমরা সারা বছর রোযা রাখতে পারবো না কেন এবং শুধু এক মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখা যায় কেন?

প্রশ্ন: স্ত্রী ঐচ্ছিক রোযা পালন করতে চাইলে তার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক কেন?

প্রশ্ন: যদি কোনো নারী রমযান মাসের কিছু রোযা কাযা করে এবং সে ওই কাযা রোযাগুলো পূরণ করার আগেই যিলহজ্ব মাস এসে গেছে এবং সে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন রোযা রাখতে চায়। তবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির নায়েক, রোযার প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। আপনি কি 'তাকওয়া' বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন?

প্রশ্ন: রোযা কিভাবে একজন বান্দাকে জান্নাতে পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তোলে? এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?

প্রশ্ন: রোযার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

প্রশ্ন: যদি কেউ রোযা পালন করে, তাহলে তার পক্ষে রোযার সবগুলো উদ্দেশ্য কি পূরণ করা সম্ভব?

প্রশ্ন: সিয়াম সাধনায় খাদ্য, পানীয় ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, রোযার আসল উদ্দেশ্য কী তা বলবেন কি?

প্রশ্ন: এবারের প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, "রোযা হলো আমার জন্য, আর এর প্রতিদান হলো আমি নিজেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, হাদীসে রোযাকে 'ঢাল' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আপনি এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করবেন যে কেন তা ঢাল হিসেবে বর্ণনা করা হলো?

প্রশ্ন: সাহরি এবং ইফতার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, সুবহে সাদেকের পূর্বে সাহরি খাওয়ার ফযিলত কী?

প্রশ্ন: সুন্নাত বলতে কি বোঝায় এবং সুন্নাত কত প্রকার?

প্রশ্ন: আপনি বিভিন্ন প্রকার সুন্নাতের উদাহরণ দেবেন কি?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সুন্নাতের গুরুত্ব কতখানি?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত পালনে অনিহা প্রকাশ করে তার মৃত্যুর পর শাস্তি হবে?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: দাঁড়ি রাখা সুন্নাত না কি ফরজ? যে শেভ করে তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: দাঁড়ির দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী? এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) কি করতেন?

প্রশ্ন: টুপি পরিধান করা কি সুন্নাত?

প্রশ্ন: দাড়ি রাখা এবং টুপি পরার পেছনে যৌক্তিক কারণ বলতে পারবেন কি?

প্রশ্ন: খাওয়া, অভ্যর্থনা এবং মহৎ কাজের ক্ষেত্রে কেনো শুধু ডান হাত ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাম হাত পছন্দ করা হয় না ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: দাড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ইসলামে কী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: পান করার নিয়মগুলো সংক্ষেপে বলবেন কি?

প্রশ্ন: অনেক মুসলমান খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম উচ্চারণ করে, এটা কি সুন্নাত?

প্রশ্ন: পুরুষ- নারীর পোশাকের ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তের বিধান কীরূপ?

প্রশ্ন: ইসলামের সুন্নাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? কুরআন কি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়?

প্রশ্ন: একজন মুসলিম আরেক মুসলিমকে সংশোধন করার সময় যদি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তবে সেটা ঠিক হবে?

প্রশ্ন: আত্মহত্যার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে? আর যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে তার শাস্তি কমানোর জন্য পিতামাতা কি করতে পারবে?

প্রশ্ন: কিছু লোক মনে করে যে ভালো জিনিস উপভোগ করা এবং মন্দ জিনিস নিষেধ করা ফরজ নয়। এই দাবির ব্যাখ্যা কী?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির, রোযা পালনের সময় যেসব কাজ মাকরূহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী তা উল্লেখ করবেন কি?

প্রশ্ন: রোযার সময় কোন কোন কাজ নাজায়েয?

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, কেউ যদি তার জিহবায় হেফাজত না করে, তাহলে কি তার রোযা পালন অনর্থক হবে না?

প্রশ্ন: রোযা রেখে যদি কেউ তার জিহবার হেফাযত না করে তাহলে কি তার পাপ হবে?

প্রশ্ন: রোযার মাসে গীবত ও পরনিন্দার পরিণাম কী?

প্রশ্ন: ডা. জাকির রোযার মাসে আরো কী কী কাজ আছে, যা করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রমযান মাসে ইসলামী তথা দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি কেন এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি মহিলারা খাবার জিহবায় চেখে দেখতে পারবে?

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো সুরমা ব্যবহার সম্পর্কিত। চোখে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানি যে, চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত, রোযা অবস্থায় কি সুরমা ব্যবহার করা জায়েয?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি আতর বা পারফিউম ব্যবহার করা জায়েয?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি ইনজেকশন নেওয়া জায়েয?

প্রশ্ন: মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে নাকের ড্রপ, জিহবাতে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা বা বিভিন্ন প্রকার টেস্ট করা কি রোযা অবস্থায় জায়েয হবে?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কারো সন্দেহ হলো যে, “এটা তার রোযা ভেঙ্গে দিতে পারে, রোযা অবস্থায় সন্দেহ হলে তার মাসআলা কী?

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়লো যে, তাকে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করা হলো কিংবা নিয়ম- কানুন তথা মাসআলা মাসায়েল না জানার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেললো। এমন পরিস্থিতিতে কি এই ব্যক্তির রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে? গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয?

প্রশ্ন: অযু করার পর বা মুখ ধোয়ার পর অনেকে থুথু ফেলতে থাকে। এ বিষয়ে বিধান কী?

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় যদি কেউ এ্যাজমাতে ভোগে তাহলে সে কি অক্সিজেন, ইনহেলার বা অন্য কোন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারবে?

প্রশ্ন: অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ, এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: রোযার সময় যেসব কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো কী কী?

রমযানের ১৪তম শিক্ষা - ১৯২

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: এর আগে আমরা রোযার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় রোযার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকারিতা আলোচনা করেছিলাম। আপনি কি রোযার অন্য উপকারিতাগুলো আলোচনা করবেন?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, একজন লোক কীভাবে বিনয় ও উদারতা বুঝবে? উদারতা ও বিনয় বলতে কী বুঝায়? একজন মুসলমান রমযান মাসে বিনয় ও নম্রতার জন্য কী কী করবে?

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযার মাস হলো ক্ষমার মাস এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসে পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। আপনি কি এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করবেন?

প্রশ্ন: এবারের প্রশ্ন রাগান্বিত হওয়া সম্পর্কিত। ডা. জাকির, রমযান মাস হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মাস। রোযার মাসে কোনো রোযাদার রাগান্বিত হওয়ার কারণে কোনো অজুহাত পেশ করতে পারে? অর্থাৎ রোযাকে রাগান্বিত হওয়ার কারণ বা ওজর হিসেবে পেশ করতে পারে কিনা। একজন রোযাদার বলল আমি রোযা রাখার কারণে ক্ষুদ্ধ।

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযার মাসে ওমরা পালন করা উত্তম করা হয়েছে। এ বিষয়ে কি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে?

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, হুসনুল খুলুক দ্বারা কী বুঝায়? এবং "তোমরা পরিবারের নিকট ভালো হও" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো- গান বাজনা সম্পর্কে। অনেক মুসলমান বলেন যে, গান জায়েয। গান- বাদ্য সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)- এর হাদীসের আলোকে আলোচনা করবেন কি?

রমযানের ১৫ ও ১৬তম শিক্ষা - ২০৩

প্রশ্ন: কাযা রোযার অর্থ কী?

প্রশ্ন: এটা কি বাধ্যতামূলক যে রমযানের পরপরই বাদ দেওয়া রোযাগুলোর কাযা পূরণ করতে হবে?

প্রশ্ন: ফরজ রোযা কাযা হয়ে গেলে তা পূরণ কারার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রোযা কাযা করেছে এবং তা পূরণ করার আগেই মারা গেছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী? আর যে ব্যক্তি রোযা কাযা করেছে এবং অসুস্থ হয়ে গেছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কেমন?

প্রশ্ন: ধরা যাক কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখছিলো তবে সে কিছু দিন পরে মারা গেল। তখন রমযানের যে কয়েকদিন বাকী ছিলো যে দিনগুলো শেষ হওয়ার আগেই সে মারা গেল, তবে তার ওয়ারিশদের সেই বাকি দিনগুলোর রোযা পূরণ করে দেওয়া উচিত?

প্রশ্ন: ধরা যাক কোনো ব্যক্তি রোযা শপথ করলো কিন্তু মারা গেল। এখন তার শপথকৃত রোযার সমপরিমাণ লোক রোযা রাখবে?

প্রশ্ন: যে নারী মাসিকের কারণে রমযানের রোযা কাযা করেছে সে শাওয়াল মাসের ছয় দিনের রোযায় সেই রোযাগুলোর কাযা রোযা রাখতে পারবে কি?

প্রশ্ন: কাযা রোযা কীভাবে রাখতে হবে? ক্রমানুযায়ী নাকি এলোমেলোভাবে?
প্রশ্ন: 'ফিদিয়া' শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন? এটা কাদের ওপর ফরজ?

প্রশ্ন: ত্রিশটি কাযা রোযার জন্য একদিনে ত্রিশজন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে নাকি একজনকে ত্রিশদিন ধরে খাওয়াতে হবে, কোনটি সঠিক?

প্রশ্ন: আপনি কাফফারার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবেন কি? আর যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় যৌনকর্ম বা সহবাস করে তার শাস্তি কী?

প্রশ্ন: ঐচ্ছিক রোযা পালনকালে যদি সহবাস করে তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কী?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে অযথা গড়িমসি করে তবে এর জন্য সে কি কোনো শাস্তি পাবে?

প্রশ্ন: রোযা কীভাবে গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কাজ করে?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত করে বলতে না পারে যে, কতগুলো রোযা সে ভেঙ্গেছে। তাহলে সে কাযা রোযা রাখার সময় কতটি রাখবে এবং তা কীভাবে হিসাব করবে?

প্রশ্ন: ধরা যাক, কোনো এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযান মাসের রোযা রাখতে পারে নি এবং সে যদি খাওয়ানোর জন্য কোনো মিসকীনকে না পায় তাহলে কি টাকা দান করা যাবে? যদি টাকা দান করা যায় তবে কত টাকা দান করতে হবে?

প্রশ্ন: আমাদের জানামতে এটা অনুমোদিত যে, গর্ভবতী এবং যে নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করায় তাদের রোযা থাকার দরকার নেই এবং তারা এর পরিবর্তে দরিদ্রকে খাওয়াবে। আসল সিদ্ধান্ত কী?

প্রশ্ন: নিজের সন্তান এবং নাতী- নাতনীকে ইফতার হিসাবে ফিদিয়ার খাবার দেওয়া যাবে কি?

প্রশ্ন: আপনি কি নির্দিষ্টভাবে কবীরা গুনাহ কি তার সংজ্ঞা দিকে পারবেন?

প্রশ্ন: আপনি বলবেন কি ৭০টি কবীরা গুনাহ কী কী?

প্রশ্ন: যে সমস্ত লোক এই গুনাহগুলো থেকে বিরত থাকবে তাদের জন্য কি পুরস্কার রয়েছে?

প্রশ্ন: গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

প্রশ্ন: উল্লিখিত গুনাহটি সাধারণত অমুসলিমদের দ্বারা ঘটে থাকে কিন্তু অনেক মুসলিমও আছেন যারা এমনটি করছেন।

প্রশ্ন: অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু মিডিয়া গুলো বলছে যে মুসলমান সন্ত্রাসীরা নিরাপরাধ লোকগুলোকে হত্যা করছে। নিরাপরাধীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারটি আপনি পরিষ্কার করবেন কি?

প্রশ্ন: যাদুমন্ত্র বিদ্যা অনুশীলন করা ইসলামে কবীরাহ গুনাহ কেন?

প্রশ্ন: ইসলামে পিতা- মাতাকে সম্মান এবং আনুগত্যের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

প্রশ্ন: যিনার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে এবং এর শাস্তি কী?

প্রশ্ন: সমকামিতার শাস্তি কি? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন এটি জেনেটিক ব্যাপার, এটা কতখানি সঠিক?

প্রশ্ন: দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান আছে যারা সুদকে বৈধ মনে করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি কেমন গোনাহ এবং এর ব্যাপারে কী বলা হয়েছে?

প্রশ্ন: আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সুদ কারবারী করে এমন কোনো ব্যাংকের একাউন্টে অর্থ রাখা মুসলামনের জন্য বৈধ হবে কি?

প্রশ্ন: মাদকের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এটা কি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ?

প্রশ্ন: পেছনে নিন্দা এবং কুৎসা রটনাকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী?

প্রশ্ন: পুরুষদের জন্য গোড়ালির নিচে পোশাক পরিধান করা কি হারাম?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণক বিদ্যায় বিশ্বাসী তার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদর শব্দের অর্থ কি এবং এর গুরুত্ব কতখানি?

প্রশ্ন: আমরা জানি যে কুরআন নাযিল হয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে এটা নাযিল হয়েছে লাইলাতুল কদর- এর রাতে, তাহলে দু'টি কথা কি পরস্পর বিরোধী নয়?

প্রশ্ন: কোন রাতটি লাইলাতুল কদরের রাত?

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ না করার পিছনে তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন: মুসলমানদের লাইলাতুল কদরের রাত কীভাবে খোঁজা উচিত?

প্রশ্ন: কুরআন হাদীসে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে আর কোনো নিশানা বা চিহ্ন আছে?

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদরের জন্য কি ধরনের কর্মসূচি পালন করতেন?

প্রশ্ন: যে নারী ঋতুমতী সে কিভাবে লাইলাতুল কদর পালন করবে?

প্রশ্ন: কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন, যদি তাই হয় তবে কেউ কোনো খুন করলে তার শাস্তি হবে কেন?

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদরের উপর ঈমান রাখা বলতে কি বোঝায়?

প্রশ্ন: সবকিছুই আল্লাহ দিয়েছেন, ভালো কাজ আল্লাহর জন্য এবং মন্দগুলো নিজের জন্য। এই ব্যাপারটি স্ববিরোধী নয় কি?

প্রশ্ন: কোনো কাজ করতে গেলে যদি বিপদ এসে পড়ে তাহলে মুসলমানদের কেমন দায়িত্বশীলতা দেখান উচিত?

রমযানের ২১ ও ২২তম শিক্ষা - ২৫২

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: আপনি ই'তিকাফ শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: ই'তিকাফ কি সকল মুসলিমের উপর ফরজ?

প্রশ্ন: ই'তিকাফের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কী?

প্রশ্ন: ইতিকাফে অবস্থান কালে কেউ কি মসজিদ ছেড়ে যেতে পারবে?

প্রশ্ন: কোন কাজগুলো ই'তিকাফকে বাতিল বা অকার্যকর করে দেয়?

প্রশ্ন: ই'তিকাফের সময় কী কী কাজ করা গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: এগুলো ছাড়া আর কোনো নির্দেশনা আছে যেগুলো পালন করলে ই'তিকাফ আরো খাঁটি এবং মজবুত হবে?

প্রশ্ন: ই'তিকাফের পূর্ব শর্তগুলো কী?

প্রশ্ন: রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফে বসার জন্যে ঠিক কোন সময়টিতে ইতিকাফে বসতে হবে? আর ইতিকাফের লক্ষ্য কী?

প্রশ্ন: ইতিকাফ কী শুধু রমযানের শেষ দশ দিনেই করা যাবে, নাকি অন্যান্য সময়েও করা যাবে?

প্রশ্ন: ই'তিকাফের পুরস্কারগুলো বলবেন কি?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: রমযান আমাদেরকে যে ধৈর্যের শিক্ষা দেয় সেটির গুরুত্ব কতখানি?

রমযানের ২৫ ও ২৬তম শিক্ষা - ২৭৪

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: দাওয়াহ শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন কি? ইসলাহ'র (সংশোধন) সাথে দাওয়াহ'র পার্থক্য কী?

প্রশ্ন: দাওয়াত দেওয়া বা দাওয়াতি কাজ করা কী? ফরজ নাকি সুন্নাত?

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম কৌশল কোনটি যা ব্যবহার করা যেতে পারে?

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া জন্য কুরআনের কোন আয়াতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

প্রশ্ন: একজন হিন্দু ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

প্রশ্ন: একজন খ্রিস্টানকে দাওয়াত দিতে হবে কোন পন্থায় এবং কীভাবে তার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে এক আল্লাহর প্রদর্শিত পথই আসল পথ?

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার সময় আর কোন বিষয়টি তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে যেটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন: একজন নাস্তিককে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন কৌশল ব্যবহার করতে হবে?

প্রশ্ন: তাওহীদ এবং রিসালাতের পরে আর কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেটি গুরুত্বপূর্ণ?

প্রশ্ন: দাওয়াত প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?

প্রশ্ন: দাওয়াত- এর এই মাধ্যমগুলোর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কী কী?

প্রশ্ন: আপনার মতে দাওয়াতি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম কোনটি?

www.islamerpath.wordpress.com

রমযানের ২৭তম শিক্ষা - ২৮৫

প্রশ্ন: রমজানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যাকাত। আজকে আমরা যাকাতের অর্থ এবং ইসলামে যাকাতের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

প্রশ্ন: একজন মুসলমানের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

প্রশ্ন: আপনি 'নিসাব' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন যাদের সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদেরকে যাকাত দিতে হবে। আপনি এই 'নিসাব' এবং 'নিসাব পর্যায়' ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: যে সমাজে যাকাত প্রচলিত আছে সেই সমাজে যাকাত কিভাবে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে?

প্রশ্ন: আপনি যাকাতের শিক্ষা এবং বিচক্ষণতা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলবেন?

প্রশ্ন: মুসলমানের কোন কোন জিনিসের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে?

প্রশ্ন: স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জন্য কি নিসাব একই পরিমাণে দিতে হবে?

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তির স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের গহনা থাকে এবং সে যদি এটি ব্যবহার করতে থাকে তবে এর জন্য যাকাত দেওয়া লাগবে?

প্রশ্ন: গবাদিপশুর ক্ষেত্রে নিসাবের পরিমাণ কী?

প্রশ্ন: যদি কোনো দোকানীর দোকানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য থাকে তাহলে সবগুলোর জন্যই কি যাকাত প্রযোজ্য?

প্রশ্ন: মূলধন এবং নোট মুদ্রার ক্ষেত্রে যাকাত হিসাব করতে হবে কীভাবে?

প্রশ্ন: কাউকে ধার দেওয়া অর্থের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে কি?

প্রশ্ন: মুসলমানদের আর এমন কোন বস্তু আছে যার জন্য যাকাত দিতে হবে না?

www.islamerpath.wordpress.com

প্রশ্ন: যাকাত হিসাব করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বলবেন কি?

প্রশ্ন: দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কিছুলোক আছে যারা ধনবান কিন্তু কৃপণতার কারণে যাকাত দিতে চয় না কিংবা যাকাতের কথা ইচ্ছা করেই বেমালুম ভুলে যায়। এদের জন্য আপনার উপদেশ কি?

প্রশ্ন: কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে?

প্রশ্ন: কিছু লোক দাবি করে যে, সম্পদের উপর জীবনে মাত্র একবার যাকাত দিতে হবে, বিশেষ করে স্বর্ণের ব্যাপারে তারা এমনটি বলে থাকে। এই ব্যাপারে ভিন্ন মতামত আছে কি?

প্রশ্ন: যাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হয় তাকে কি এটা জানানোর প্রয়োজন আছে যে, তোমাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: জমির যাকাত দিতে হবে কীভাবে? জমিটি বিক্রয় করার পরে অনেকগুলো বছরের যাকাত একবারে দিয়ে দিতে হবে?

প্রশ্ন: কিছু লোক আছে যারা রিয়েল এস্টেট (জমির ব্যবসা) ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কারণ তারা ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে চায় না। তারা দাবি করে যে, এই জমির জন্য যে ভাড়া পাওয়া যায় তার উপর যাকাত দিতে হবে, জমির মূল্যের উপরে নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

প্রশ্ন: অনেক লোক আছে যারা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ী বানায়। যে বাড়ীতে বসবাস করা হয় তার কোনো যাকাত দিতে হয় না। যদি কোন ব্যক্তি ছোট আকারের বাড়ী বানায় তাহলে সেখান থেকে যে টাকাগুলো বেঁচে যায় তার জন্য কি যাকাত প্রযোজ্য হবে? কিন্তু সে যদি বড় আকারের বাড়ী বানায় তাহলে? ওই বাড়ী কি যাকাত মুক্ত থাকবে, দয়া করে মতামত দিন।

প্রশ্ন: কিছু মুসলিম আছেন যারা অনেক ধনী এবং তাদের একাধিক কোম্পানি ফ্যাক্টরি ইত্যাদি রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে কি তাদের সকল সম্পদের উপর যাকাত দিতে হতে নাকি শুধু উৎপাদিত পণ্যের উপর?

প্রশ্ন: একজন মহিলার অলংকার ছাড়া যদি আর কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে সে কি ওই অলংকারের অংশবিশেষ বিক্রি করে যাকাত পরিশোধ করবে?

প্রশ্ন: যদি প্রতি বছরে ওই অলংকারের যাকাত পরিশোধ করতে হয় তাহলে ৪০ বছর পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কি হবে?

প্রশ্ন: ডায়মন্ড বা হীরা কি যাকাত থেকে মুক্ত?

প্রশ্ন: বাণিজ্যিক দ্রব্যসামগ্রীর যাকাত দিতে হবে কীভাবে? দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে?

প্রশ্ন: কোম্পানির মালিকানায় ভাড়া দেওয়া গাড়ী বা যানবাহনের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে কি?

প্রশ্ন: অনেক মুসলমান আছেন যারা পূর্বে যাকাত দিতেন না কিন্তু পরে তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং যাকাত দিতে চায়। কিন্তু তারা পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত হিসাব করবে কীভাবে?

প্রশ্ন: কেউ যদি ভুল করে তার যাকাত এমন কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে ফেলে যে যাকাত প্রাপ্তির যোগ্য নয়, তাহলে কি তার যাকাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: সদকা এবং যাকাতের ভিতর পার্থক্য কী?

রমযানের ২৮তম শিক্ষা - ৩২০

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর শব্দের অর্থ কী এবং ইসলামি শরীয়তে যাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে কি ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কি শুধু তাদের উপর ফরজ যারা যাকাত দেয়, না কি সকলের জন্যে ফরজ?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর প্রদানের পেছনে বিশেষ বিচক্ষণতাগুলো কী?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর হিসাবে ঠিক কি জিনিস দিতে হবে? এক্ষেত্রে কী টাকা দেওয়া গ্রহণযোগ্য?

প্রশ্ন: সুন্নাহ অনুযায়ী ঠিক কী পরিমাণ বস্তু যাকাতুল ফিতর হিসেবে দিতে হবে?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদেরকে দেওয়া উচিত?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর প্রদানের সঠিক সময় কখন?

প্রশ্ন: যাকাত এবং যাকাতুল ফিতরের ভেতর কী পার্থক্য রয়েছে?

প্রশ্ন: কোনো এক ব্যক্তি ঈদের এক সপ্তাহ আগে যাকাত দিয়েছে, এটা কি বৈধ? এখন কি করা উচিত?

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর শুধু যে শহরে বাস করা হয় সেখানেই দিতে হবে, না কি অন্য কোনো শহরে দেওয়া যাবে?

প্রশ্ন: কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের জন্যে কি এর মালিককে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে, না কি তারা নিজেরাই যাকাত আদায় করবে?

প্রশ্ন: যদি কেউ যাকাতুল ফিতর আদায় করতে ভুলে যায় এবং ঈদের পরে যদি মনে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে কী করা উচিত?

রমযানের ২৯তম শিক্ষা - ৩২৯

প্রশ্ন: ইসলামি মাস কীভাবে শুরু হয় ব্যাখ্যা করবেন কি?

প্রশ্ন: কোন ধরনের লোক চাঁদ দেখলে তাদের চাঁদ দেখার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রশ্ন: রোযার চাঁদ দেখার জন্য জ্যোতিষীর সাহায্য নেওয়া যাবে কি? যদি কেউ এভাবে চাঁদ দেখে তবে সাধারণ মানুষের সেই চাঁদ দেখার দরকার আছে কি?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখেছে বলে দাবি করছে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা ব্যবহার করা যাবে কি?

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি তার নিজ দেশে অবস্থান কালে রোযা আরম্ভ করলো তারপর অপর একটি দেশে ভ্রমণ করতে গেল। দ্বিতীয় দেশটিতে তার নিজের দেশের চেয়ে দু’দিন পরে মাস আরম্ভ

হয়। এমতাবস্থায় সে কি নিজের দেশের সময় অনুযায়ী নাকি ভ্রমণকৃত দেশের সময় অনুযায়ী রোযা শেষ করবে? ভ্রমণকৃত দেশের সময়ানুযায়ী রোযা করলে রোযা ৩১/৩২টি হয়ে যাবে। তাহলে কোনটি সঠিক, কি করতে হবে?

প্রশ্ন: পৃথিবীর মুসলমানরা সকলে এক সাথে রোযা রাখা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা পালন করার ব্যাপারে একতাবদ্ধ নয় কেন?

প্রশ্ন: যে শহরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রমযান এবং ঈদ পালন করা হয় সেই শহরের লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী?

প্রশ্ন: রমযানের নতুন চাঁদের প্রত্যক্ষদর্শী যদি কোনো নারী হয় তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি?

রমযানের ৩০তম শিক্ষা - ৩৩৪

প্রশ্ন: জনাব জাকির নায়েক, বিশেষ ব্যবহৃত শব্দ "ঈদ" এর সংজ্ঞা দেবেন কি?

প্রশ্ন: ঈদের নামাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গুলো কী?

প্রশ্ন: ঈদের দিন কত সকাল থেকে এবং সর্বশেষ কোন সময়ে নামাজ আদায় করা যাবে? (ঈদের নামাজ)

প্রশ্ন: ঈদের নামাজ পড়ার সহীহ- শুদ্ধ পদ্ধতি কেমন?

প্রশ্ন: ঈদের নামাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত?

প্রশ্ন: ঈদের দিন এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানান উচিত? এক্ষেত্রে 'ঈদ মুবারক' বলাটা কতখানি যৌক্তিক?

প্রশ্ন: ঈদের দিনে কী কী কাজ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন: ঈদের দিন গান, বাদ্য, আনন্দ ফূর্তি ইত্যাদি করা কী অনুমোদিত?

প্রশ্ন: ঈদ পালন করার সময় মুসলমানরা সাধারণত কোন ধরনের ভুলগুলো করে থাকে?

প্রশ্ন: মুসলমানদের জন্যে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া কি বাধ্যতামূলক, না কি মসজিদেও এই নামাজ পড়া যাবে?
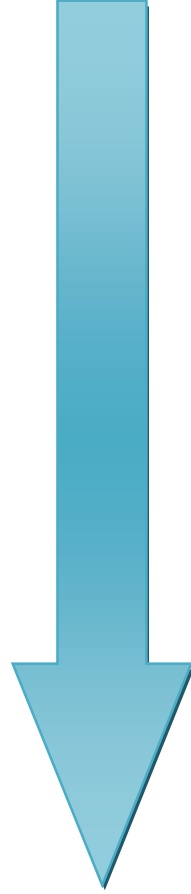
রমযানুল মুবারক
স্বাগত বক্তব্য

ইউসুফ চেম্বার:

প্রিয় দর্শকমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি আমাদের পিস টিভিতে প্রচারিত রমযানুল মুবারক উপলক্ষে বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালার এই পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে প্রতিদিনই আমি আপনাদের সাথে থাকবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমাদের প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে আমার আপনাদের সাথে আরো যিনি থাকবেন তিনি হলেন- আমাদের সকলের প্রিয় কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত জনাব ডা. আব্দুল করিম জাকির নায়েক। আসলে, বাস্তবিকভাবে পেশায় তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার, মেডিওকল এক্সপার্ট। কোনো এক সময় তিনি নিজেকে একজন মেডিকেল ডাক্তার অন্য কথায় শারীরিক সমস্যার চিকিৎসক হওয়ার জন্যই নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং করেছিলেনও। কিন্তু কোনো এক সময় তিনি মানুষের মন বা অন্তরের রোগের চিকিৎসা বিষয়ে ভাবতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তিনি দেখলেন যে মানুষের অন্তরের রোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা উপাদান হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এই অনুধাবন থেকেই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর পথে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছেন।

তিনি গত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন মিডিয়া, যেমন- ইলেকট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া- টিভি, রেডিও, বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং গণমাধ্যমের অন্যান্য উপায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং ইসলাম সম্পর্কিত হাজারের উপরে লেকচার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এসব বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ অনেক বইও তিনি রচনা করেছেন। সমান্তরালভাবে তিনি বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের উপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সুনিপুণ যুক্তি উপস্থাপন আর উপস্থাপনা ভঙ্গি দিয়ে তিনি বিশ্বব্যাপি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। আমি আমাদের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির নায়েক, আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। ডা. জাকির নায়েক, দীর্ঘ ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালার শুরুতে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো নিদের্শনা দিবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: পিস টিভির সকল দর্শক শ্রোতাকে জানাচ্ছি সালাম ও আন্তরিক মোবারকবাদ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। পিস টিভিতে প্রচার হতে যাওয়া পবিত্র রমযানে এ দীর্ঘ সিরিজ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি জাকির নায়েক নিজের

অবস্থান সুস্পষ্ট করাটা জরুরি মনে করছি। আমি সর্বদা নিজেকে একজন শিক্ষার্থী, জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মনে করি। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আসলে আমি সর্বদাই তালেবে ইলম। নিজেকে আমি কখনোই স্কলার বা পণ্ডিত মনে করি না এবং ফতোয়া বিষয়ক, ইসলামী শরীয়তের বিশ্লেষক বা বড় আলেম মনে করি না।

রমযান মাসের রোযার অনেক মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে। আবার এসব অসংখ্য মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

রোযা বিষয়ক আলোচনায় পবিত্র কুরআন পাকে সরাসরি চারটি আয়াত পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ আলোচনা এবং নির্দেশনা সম্বলিত এ চারটি আয়াত হলো- সূরা বাকারার ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫ ও ১৮৭ নং আয়াত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেওয়া হয়েছিলো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।
(সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৩)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। ইহা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদয়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে। (সূরা বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: রমযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবর্তীণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অর্থ: সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী- সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের সহিত সংগত হইও না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হইও না। এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনাবলি মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে। (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৭)

তাছাড়া অন্যান্য আরো কিছু আয়াতে রোযা বিষয়ে পরোক্ষ কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ কারণে রোযার মাসআলা- মাসায়েল অধিকাংশই হাদীসভিত্তিক। ইমামগণ দলিল হিসেবে এসব সহীহ, মওযু হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রিয় দর্শক- শ্রোতা আমি যেসব উত্তর দেবো এবং তা

অবশ্যই এ সকল ইমামদের মতামত ভিত্তিক হবে। ইমামদের যেসব ফতোয়া সহীহ্ হাদীস ও কুরআন ভিত্তিক মনে করি আমি কেবল সে সকল ফতোয়া উল্লেখ করবো। এসব ফতোয়ার সাথে কোনো কোনো দর্শক- শ্রোতার দ্বি‘ধা বোধ হতে পারে কিন্তু ফতোয়া ও মাসায়েল উল্লেখ করার সময় আমি অবশ্যই ইমামদের নামও উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। আশা করি এসব মাসায়েল ও মতামত কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক হবে ইনশাআল্লাহ। উত্তর দেওয়ার সময় আমি যে ইমামের ফতোয়া উল্লেখ করবো সাথে সাথে তাঁর নাম বলতে চেষ্টা করবো। আমি নিজের মত ছাড়া অন্য কারো মতামত উল্লেখ করলে তার নাম ও সূত্র বিষয়ে সুস্পষ্ট করতে পছন্দ করি। অন্যান্য বিষয়ে আমার লেকচার যেমন আমার নিজস্ব মতামত ভিত্তিক নয় ঠিক তেমনি রোযা বিষয়ক এ আলোচনার মতামতগুলোও আমার নিজস্ব হবে না। বরং তা বিভিন্ন ইমামদের দেওয়া ফতোয়া। কোনো বিষয়ে কোনো মাসআলা উল্লেখ করলে তা কোন ইমামের দেওয়া ফতোয়াভিত্তিক এবং তার সূত্র ও নাম বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমি আপনাদের আবারও বলছি, এসব বিষয়ে আমি আমার নিজের মতামত ব্যক্ত করবো না।

আমি বিশ্বাস করি আমার উত্তর কুরআন ও সহীহ্ হাদীসভিত্তিক হবে। যখন কোনো সূত্র সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন পড়বে তখন আমি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। উদাহরণস্বরূপ- বলা যায়, কোন হাদীস কোন গ্রন্থের কত নং খণ্ডের কত নং হাদীস, কুরআন হাদীসের এসব রেফারেন্স দর্শকগণ নিজেরাও দেখে নিতে পারবেন। এটা আমার উত্তর দানের সাধারণ পদ্ধতি।

আমার মুখ থেকে যা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তা কেবল মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুলভ্রান্তি তা আমার একান্তই ব্যক্তিগত এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। তাই আমি আমার ভুলের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ্র দরবারে দু’আ করি যেন আমাদের এই অনুষ্ঠান সবার জন্য কল্যাণকর হয়।

উপস্থাপক: প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আমরা এখন আমাদের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে চলে যাবো। আমাদের অনুষ্ঠানের দুটি পর্ব থাকবে। প্রথম পর্ব থাকবে আমার এবং ডা. জাকির নায়েকের মধ্যে রোযা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে থাকবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পর্ব। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন ডা. জাকির নায়েক।

প্রিয় দর্শক- শ্রোতা, আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের এ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ৩২ পর্বের। ৩২ দিনে আমরা এই ৩২টি অনুষ্ঠান প্রচার করবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, রোযা তো ৩০টির বেশি নয়, কিন্তু অনুষ্ঠান ৩২ পর্ব হবে কেনো? হ্যাঁ আপনাদের এমন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক কিন্তু আপনাদের এটাও জানা আছে যে পৃথিবীর সর্বত্র রোযা ঠিক একই দিনেও সময়ে শুরু হয় না এবং শেষ হয় না। এক্ষেত্রে এক বা দুই দিন পার্থক্য

হয়ে থাকে। আমাদের অনুষ্ঠান যেহেতু বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয় এবং আমরা যেহেতু কাউকেই এই অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করতে চাই না তাই আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান ৩২ পর্বের করেছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

রমযানের ১ম শিক্ষা

স্বাগত হে মাহে রমযান!

আসুন আমরা পবিত্র মাহে রমযানকে স্বাগত জানাই। আহলান- সাহলাম মাহে রমযান!

প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদের প্রচারিত ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের বিষয় সূচি আমি এবং ডা. জাকির নায়েক দু'জনের সিদ্ধান্তে ঠিক করেছি। আসুন, আলোচনা পর্বে যাওয়া যাক-

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির নায়েক, আমাদের অনুষ্ঠান সূচির বিষয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমাদের প্রচারিত অনুষ্ঠানের সূচি বিষয়ে আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছি। এ সব অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে করা হয়েছে। যাতে করে রোযা সম্পর্কিত এসব জ্ঞান, মাসআলা- মাসায়েল আগেই জেনে উপকৃত হন। যা আপনাদের রোযা পালনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

আর কিছু বিষয় আছে যা বছরের যেকোনো সময় আলোচনা করা যায়। যেমন- নফল রোযা, এ বিষয়ে বছরের যে কোনো সময় আলোচনা করা যায়। আগের কোনো কোনো টপিকস যেমন- ই'তিকাফ এবং লায়লাতুল কদর, এগুলো আমরা কেবল রোযার শেষের দশ দিনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। আবার এমন বিষয় যেমন ঈদুল ফিতর, তা ঈদুল ফিতরের কিছু আগে আলোচনা করা উচিৎ হবে। অধিকাংশ বিষয় যা রমযান মাস শুরু হওয়ার আগেই প্রচার করা উচিৎ যা আমি আগেই বলেছি। এক্ষেত্রে সাহরি ও ইফতারের উপর আমরা রোযার ৮ম দিনে আলোচনা করতে যাচ্ছি। অথচ এমন কিছু কর্মকাণ্ড আছে যা রোযাকে অর্থহীন করে তোলে তা অবশ্যই এসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো অবশ্যই রোযা শুরু হওয়ার আগে আমাদের জানা আবশ্যক। অথচ আমরা রোযার উপর আলোচনা শুরু করছি রোযার প্রথম দিন থেকে। এটার পরিবর্তন হওয়া ভালো ছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যা আমি নিজেও অনুধাবন করি, তাহলো যা রোযা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৩/৪ সপ্তাহ আগেই প্রচারিত হওয়া উচিৎ ছিলো তা আমরা রোযার প্রথম দিন থেকে আলোচনা করছি এই কারণে যে, অধিকাংশ মুসলিম ইসলামী প্রোগ্রাম কেবল রমযান মাসেই বেশি দেখেন। তাই রমযান মাসে ইসলামী অনুষ্ঠানের দর্শক বেশি

হয়। যাহোক, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা রোযার প্রথম দিন থেকেই অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারলাম। পরবর্তী রমযানের অনেক পূর্বেই এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। তাহলে পরবর্তী রোযার জন্য প্রস্তুতি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন: এবারের প্রশ্ন রমযান উপলক্ষে প্রস্তুতি বিষয়ক, ডা. জাকির, রাসূল (ﷺ) রমযান মাস উপলক্ষে রমযানের প্রস্তুতির জন্য কী কী করতেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সহীহ বুখারী শরীফের ৩য় খণ্ডের 'কিতাবুস সিয়াম' এর ১৯৬৯ নং হাদীসে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَا ئِشَةَ قَا لَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَا مَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهُو فِيْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًافِيْ شَعْبَانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُو وَكَانَ يَصَوْمُ شَعْبَانَ إِلاَّقَلِيْلاً-

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাবান মাস অপেক্ষা বেশি আর কোনো মাসে রোযা রাখতেন না। কারণ, তিনি শাবান মাসের অল্প কয়দিন ব্যতীত পুরো মাসই রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম, মহানবী (ﷺ) রমযান মাসের রোযার প্রস্তুতির জন্য অন্য মাসের চেয়ে শাবান মাসে বেশি রোযা রাখতেন।

অর্থাৎ এ হলো তাঁর রোযার প্রস্তুতি পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিরমিযী শরীফের ৫০তম খণ্ডের ৩৪৫১ নং হাদীসে এসেছে হযরত তালহা (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন,

অর্থাৎ, যখন রাসূল (ﷺ) নতুন চাঁদ দেখতেন তখন তিনি সর্বদাই আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং তিনি বলতেন হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর এ মাসে তোমার রহমত নাযিল করো এবং তিনি তখন সেই মাসের নাম উল্লেখ করতেন এবং তিনি বলতেন তুমি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই মাসে সত্যের পথে পরিচালিত করো।

রাসূল (ﷺ) নতুন চাঁদ দেখতেন রমযান মাসের নতুন চাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো না বরং সব নতুন চাঁদের ক্ষেত্রেই এসব করতেন।

"নবী করীম (ﷺ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন: আল্লাহ এ চাঁদকে আমাদের ওপর উদিত করুন নিরাপত্তা, শান্তি, ঈমান ও ইসলামের সাথে (হে চাঁদ) তোমার ও আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ; (হে আল্লাহ) এ চাঁদ যেন সঠিক পথের ও কল্যাণের কাজ হয়।"

রমযান মাসকে স্বাগত জানানেরা জন্য তার বিশেষ আয়োজন ছিলো তা হলো- তিনি সাধারণত জনতাকে এই বরকতময় মাস আগমনের বিষয়ে সতর্ক করতেন।

এসব হাদীস থেকে জানতে পারলাম মহানবী (ﷺ) রমযান মাসকে কীভাবে স্বাগত জানাতেন এবং সাহাবীদেরকে কীভাবে এই মাসের সুসংবাদ জানাতেন।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রমযান মাস নিকটবর্তী হলে আমাদের কী করা উচিৎ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমাদের প্রথমেই যা করা উচিৎ তাহলো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। এ জন্য যে, তিনি আমাদেরকে আবারও এই বরকতময় মাসে বেঁচে থাকার এবং সিয়াম পালন করার তৌফিক দিলেন। তাঁর এই অশেস রহমতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি যেন আমাদের পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি (আল্লাহ) যে অশেষ নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর রহমত বরকত ও ভালোবাসা কামনা করা। কেননা কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৪, ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন-

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এটার পরিবর্তে ফিদয়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। (সূরা আল- বাক্বারা, আয়াত- ১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: "রমযান মাস হলো সেই মাস যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা আর ন্যায়ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, - যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

তিনি এই সূরার ১৮৩ নং আয়াতে আরো বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারো।"

অর্থাৎ এ হলো সেই সেই মাস যে মাসে ব্যক্তি আরো তাকওয়াবান হবেন। ...এ হলো সেই মাস যখন ব্যক্তির তাকওয়ার স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। এ হলো সেই মাস যখন প্রশিক্ষণ চলে। এ মসে রোযাদারের পুরো শরীর ও মনের ওভারহোলিং তথা সংস্কার চলে। যেমন- বিভিন্ন মেশিনারীর নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে যেমন ৩ মাস ৬ মাস বা ১ বছর বা ৩ বছর অন্তর ওভারহোলিং চলে। আমি বলবো মানব শরীর হলো বিশ্বের সর্বাধিক জটিল ও উন্নত মেশিনারী। তাহলে কি এর জন্য ওভারহোলিং বা সংস্কার দরকার হবে না? অবশ্যই দরকার হয়। আর তা হলো রমযান মাসের রোযা। রমযান মাস হলো মানুষের ওভারহোলিংয়ের সময়। এতে মানবশরীর ও মনের ওভারহোলিং চলে। রোযা পালন হলো মানুষের জন্য সর্বাধুনিক উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে মানবশরীর ও আত্মার পরিশুদ্ধি চলে সুনিপুণভাবে। রমযান মাস হলো তাকওয়া বৃদ্ধির মাস। আমরা এ মাসে আমাদের আন্তরিকতা সর্বাধিক করবো যাতে করে এ মাসে আমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারি এবং কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করতে পারি।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, আমাদের মাঝে এখন রমযান মাস সমাগত। আপনি দর্শকদের জন্য বিশেষ কোন নসিহত করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী যাদের উপর রোযা ফরজ তারা একটি বিষয়ের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিবেন। তা হলো- তারা প্রত্যেক দিনই রোযা পালন করবেন এবং তা যেন অবশ্যই আন্তরিকভাবেই পালন করেন যেন

রোযার পরিপূর্ণ ফযিলত পাওয়া যায়। রোযার আসল উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। আমাদের উচিৎ আমরা যেন এই পবিত্র মাসে একটি মুহূর্তও অবহেলা না করি, অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় না করি। আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যেন আমরা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখি। রোযার সময়ে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মনকে নিবিষ্ট রাখা, এই সময় আমাদের আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহর ভীতি তথা তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করাও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ)- এর হাদীস যা **"বুখারী শরীফের ৩য় খণ্ডের ১৯০৩ নং হাদীসে** রয়েছে তা হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা একটা বিষয় বলতে পারি যে, এই মাসে আমরা অনেক ফযিলত পেতে পারি।

সহীহ বুখারীর কিতাবুস সিয়ামের ১৯০১ নং (খণ্ড নং ৩) হাদীসের বর্ণনা-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াব লাভের আশায় রমযানের রোযা রাখে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

আপনি বুঝতেই পারছেন, রোযার মাস হলো পূর্ববর্তী দিনগুলোর পাপ থেকে ক্ষমা লাভের মাস, ক্ষমা লাভের সুবর্ণ সুযোগ। এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ)- এর আরও একটি হাদীস। হাদীসটি অনেক বড়, আমি কেবল চারটি বিষয় উল্লেখ করবো-

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন- মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন- বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য রোযা ব্যতীত। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান।

আর রোযা হচ্ছে (গুনাহ থেকে) ঢালস্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন বাজে কথা না বলে। চেঁচামেচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিৎ, আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, রোযাদারেরর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশক অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। রোযাদারের দুটি খুশি, যা সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে সে ইফতারের সময় খুশি হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নূর এর ৩১নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করেও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা- রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যের সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

সূরা 'আরাফ' এর ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন-

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ
قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থ: তিনি "বললেন তুই এখান থেকে যা । এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল: আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।"

তাই আমার পরামর্শ হলো- এই মাসে কেউ যেন মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে। অপ্রয়োজনীয় কাজে যেন সময় ব্যয় না করে। এই পবিত্র মাসের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে। আল্লাহর ইবাদতে সময় ব্যয় করে আল্লাহর রহমত তালাশ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

প্রশ্ন: আপনি একটি হাদীসে আলোচনা করেছেন যে, রমযান মাস হলো ক্ষমা লাভের মাস। আমার প্রশ্ন হলো- রমযান মাসকে ক্ষমা লাভের মাস বলার কারণ কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে সহীহ বুখারী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ১৯০১ নং হাদীসটি উল্লেখ করেছি, যেটি- "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াব লাভের আশায় রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

এই একই বাণী মুসনাদে আহমদ এর ৩য় খণ্ডের ১১৫২৫ নং হাদীসে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে- "যে ব্যক্তি খাস নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

সহীহ মুসলিম শরীফে এ বিষয়ে আরো এসেছে-

عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ، مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

অর্থাৎ, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল (ﷺ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে, এক জুময়া থেকে আরেক জুময়া এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান। এ সমস্ত তাদের অন্তর্বর্তীকালে যে সব সগীরা গুনাহ হয় তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যখন সে (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫০)

এ মধ্যবর্তী সময় হলো আপনার সব পাপ বা গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সময়।

হাদীসের আলোচনা থেকে বুঝতেই পারছি, এই মাস হলো ক্ষমা লাভের মাস।

রমযান মাসে বান্দা ক্ষমা লাভের এই অপূর্ব সুযোগ পেয়ে থাকেন। এমনকি এই পবিত্র মাসে বান্দার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত থাকে এবং জাহান্নামের দরজা থাকে বন্ধ। এই জন্যই এ মাসকে ক্ষমা লাভের মাস বলা হয়।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, আমি জানতে চাচ্ছি, এমন বিশেষ কাজ যার প্রতি মুসলমানদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। যেন তারা তা আমল করে অধিক কল্যাণ লাভ করতে পারবে। আমরা তো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। কল্যাণকর সে কাজগুলো কি বলবেন যাতে করে আমরা এখনই পরবর্তী দিনগুলোর জন্য একটি পরিকল্পনা করতে পারি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমি মনে করি এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তবুও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমি এখানে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো। পরের অনুষ্ঠানগুলোতে যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করবো, তাই এখানে কেবল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলবো।

প্রথমেই যে বিষয়টি বলবো তা হলো নিয়ত। রোযার ক্ষেত্রে নিয়ত অতি তাৎপর্যপূর্ণ। রোযার নিয়ত কেবল আল্লাহর জন্য হবে। নিয়ত ছাড়া রোযা কবুল হবে না, নিয়তবিহীন রোযা কবুল হবে না, নিয়তহীন রোযা অর্থহীন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রোযার নিয়ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত হলো- রোযার সকল সুন্নাত একনিষ্ঠভাবে আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা যাবে। এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট আলোচনা করছি।

- রোযার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত হলো সাহরি খাওয়া। যথাসম্ভব দেরি করে সাহরি খাওয়া। সুবহে সাদিকের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সাহরি খাওয়া।

- ইফতার করা, যথা সম্ভব ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হবে। তা সূর্যাস্তের পরপরই করতে হবে।

আরো যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে, তাহলো, এই পবিত্র মাসে আমরা সকল প্রকার হারাম, মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকবো।

রমযান মাস হলো বান্দার পাপ কাজ- হারা, মাকরূহ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাস। এই মাসে এসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুশীলন পিরিয়ড; এই মাসে তা বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ থাকে। এই মাসে বান্দা যদি হারাম, মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে তাহলে পরবর্তী সময়টাতে তা ধরে রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি মাদকাসক্ত থাকে এবং সে যদি এই পুরো এক মাস সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নেশা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে অবশ্যই নেশা থেকে মুক্তি পেতে পারে। রমযান মাসে যদি তার পক্ষে মাদক থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তার পক্ষে মৃত্যু পর্যন্ত নেশামুক্ত থাকা সম্ভব। একইভাবে আমাদেরকে মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ, কারও যদি দাঁড়িয়ে পানি পান করার অভ্যাস থাকে এবং সে যদি এই রোযার মাস উপলক্ষে মনে করে যে এই এক মাস দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না তাহলে তার অভ্যাস নিশ্চিত পরিবর্তন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সে বসে পানি পান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন, রমযান মাস হলো হারাম, মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকার উত্তম সময়। এই মাস হলো- রাসূল (ﷺ)- এর সুন্নাত আমল করার উত্তম সময়। দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাতসমূহ বাস্তবায়ন করার কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার সুবর্ণ সুযোগ, ধরুন অনেক লোক এ মাসে দাঁড়ি রাখতে পারেন। দাঁড়ি রাখা যেহেতু রাসূল (ﷺ)- এর সুন্নাত; তাই সুন্নাতের আমল করার জন্য দাঁড়ি রাখা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যেসব দু'আ পড়া সুন্নাত তা নিয়মিত পড়া যেতে পারে। যেমন- ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ, বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, সফরে বের হওয়ার দু'আ, যানবাহনে আরোহন করার দু'আ।

এই মাসে যত বেশি সম্ভব সুন্নাতের আমল করা, যা অবশ্যই সিরাতুর মুস্তাকিম তথা- সরল সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

রোযার মাসে আপনি বেশি বেশি নামাজ পড়তে পারেন। রমযান মাসে বেশি বেশি নামাজ পড়ার সুযোগ পাবেন। আপনি এ সুযোগে শুধু ফরজ নামাজ নয় সুন্নাত ও নফল নামাজ বেশি করে পড়তে পারেন। আপনাদের যদি জামাআতে নামাজ পড়ার অভ্যাস না থেকে থাকে তাহলে জামাআতে নামাজ পড়ার অভ্যাস করুন।

রোযার মাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো তারাবীহ নামাজ। তাই অবশ্যই তারাবীহ নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। অনেকে মনে করে তারাবীহ যেহেতু সুন্নাত নামাজ, তাই এটি ত্যাগ করা সমস্যা না। কিন্তু তারাবীহ নামাজ গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ নামাজ আদায় যদিও ফরজ নয় তবুও প্রত্যেক মুসল্লির উচিৎ হবে এ নামাজ আদায় করা। কেননা এ নামাজ আদায়ে অশেষ সওয়াব হাসিল হয়। তাই মুসলমানদের এ নামাজ ত্যাগ না করা উচিৎ। আবার অনেক সময় দেখবেন, অতি দ্রুত তারাবীহ নামাজ আদায় করা হচ্ছে। তাদের ভাব পুরো কুরআন শেষ করতে হবে এজন্য তারা শত মাইল বেগে নামাজ পড়ে। তারাবীহ নামাজ অবশ্যই ধীরে- সুস্থে এবং নম্রতার সাথে পড়তে হবে। নামাজ এমনভাবে পড়তে হবে এবং তিলাওয়াত এমনভাবে করতে হবে যেন মুসল্লীগণ তা ভালভাবে বুঝতে পারে।

কারও পক্ষে সম্ভব হলে রোযার শেষ ১০ দিনে ই'তিকাফ করবেন। ই'তিকাফের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন ই'তিকাফ অবস্থায় সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ড আর ই'তিকাফ একত্রে চলে না। সামাজিক কর্মকাণ্ড ই'তিকাফের উদ্দেশ্য রহিত করে।

রমযান মাসে বেশি বেশি দু'আ পড়া, কেননা রমযান মাস হলো দু'আ কবুলের মাস। রোযার সময়টাতে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে এবং এর পেছনে যত বেশি সম্ভব সময় দিতে হবে। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগির মধ্যদিয়ে সময় কাটাতে হবে।

রোযার সময়টাতে যত বেশি পারে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। আপনি যদি আরবি না জানেন তা হলে এটাকে খুব বড় সমস্যা মনে করার কারণ নেই। আরবি যদি জানা না থাকে তাহলে তরজমা পড়ুন। আপনি যে ভাষা ভালো জানেন সেই ভাষায় তাফসীর পড়ুন। যদি আপনার ইংরেজি ভালো জানা থাকে তাহলে ইংরেজিতে অনুবাদ পড়ুন। উর্দু ভালো জানা থাকলে উর্দুতেই পড়ুন। কুরআন তিলাওয়াত করা অনেক সওয়াবের কাজ। তথাপি আপনি যদি তাফসীর পড়েন তাহলে আল্লাহর বিধি- নিষেধগুলো বুঝতে আপনার জন্য অনেক সহজ হবে। যদি সম্ভব হয় ৭ দিনে এক খতম দেওয়ার তাহলে তাই করুন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে দিনে কমপক্ষে ১ পারা করে পড়ুন। তাহলে রমযান মাসে পুরো কুরআন মাজীদ এক খতন দিতে পারবেন।

রমযান মাসে যত বেশি সম্ভব হাদীস পড়তে পারেন। কিন্তু হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সহীহ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ পড়া ভাল। তাছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থগুলোও পড়া যেতে পারে। রাসূল (ﷺ)- এর জীবনীগ্রন্থ (সিরাত গ্রন্থ) পড়তে পারেন।

রমযান মাস যাকাত আদায় করার উত্তম সময়। যাকাত আদায় করা ফরজ প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের সমপরিমাণ মূল্যের মূলধন আছে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ। অনেক লোক আছেন যারা সঠিকভাবে যাকাত হিসাব করেন না। যাকাত সঠিকভাবে হিসাব করতে হবে। হিাসাবে বেশি হলে ক্ষতি নেই কিন্তু কম হিসাবে করা যাবে না। সতর্ক এবং সঠিকভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

এই রমযান মাস হলো দান সদকা করার জন্য উত্তম মাস। এই মাসে দশগুণ বেশি পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই এই মাসে সাধ্যমত সর্বোচ্চ দান করা উচিৎ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এ মাসে সর্বদা হাসিখুশি থাকা, অনেকে আছেন যারা রোযা রেকে খুবেই বিমর্ষ থাকেন, মুখ গোমড়া করে রাখেন। রোযার সময়টাতে অবশ্যই হাসিখুশি থাকতে হবে। রমযান মাসে পরিবারকে বেশি করে সময় দিতে হবে। এই সময়টাতে পরিবারের সাথে বেশি সময় কাটানো উত্তম পরিবারের সাথে কাজে সহযোগিতা করা উত্তম।

হুসনুল খুলক তথা সদ্ব্যবহার বিষয়টি এ মাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের খোঁজখবর নেয়া তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হলো হুসনুল খুলক। সর্বোপরি প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ, তাদের সুবিধা অসুবিধায় খোঁজখবর নেয়া এই মাসে ক্ষমা করার চর্চা করা ভালো। কেননা রমযান মাস হলো ক্ষমার মাস। কেউ অন্যায়, ভুল করলে তাদের ক্ষমা করে দেয়া, তাছাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং সবার মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা উচিত।

রমযান মাসে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে বেশি ফিকির করতে হবে। রমযান মাসে শুরুতেই পুরো মাসের একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে। যাতে এই মাসে সময় অপচয় না হয়, এমনকি এক সেকেন্ডও যে অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট না হয়।

আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তাহলো- ইসলাহ যা মূলত আত্মসংশোধন এবং অন্যের কাজকর্মে সংশোধন করা। তা সামাজিক পর্যায়ে হতে পারে। প্রতিবেশীদের মধ্যে ইসলাহের কাজ করা যায়। তাছাড়া রমযান মাসে দাওয়াতী কাজ করার উত্তম সময়। তা অমুসলিমদের মাঝেও করা যায়। অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, আমি মুসলিম ভাই বোনদের অনুরোধ করবো তারা যেন একটি ভালো কর্মপরিকল্পনা করে নেন যাতে এ পবিত্র বরকতময় মাসের একটি সেকেন্ডও নষ্ট না হয়।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, রমযান মাস হলো রহমত ও ক্ষমার মাস। এই মাসে বান্দার আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কী? এ বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমল, ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য যে দুটি শর্ত রয়েছে, তার প্রথমটি হলো- নিয়ত; নিয়ত হবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই। একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো- আপনি যাই করেন না কেনো তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।' এই শর্ত যদি পূরণ না হয় তাহলে আপনার যাবতীয় কাজ ব্যর্থ হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা 'বাইয়েনা'র ৫নং আয়াতে বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

অর্থ: "তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক ধর্ম।"

সূরা 'দাহর' এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন-

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

অর্থ: (এবং বলে) "কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"

আপনার সকল কাজ কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূরা 'শূরা' এর ২০ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

অর্থ: "যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না।"

একই কথা আল্লাহ সূরা 'হুদ' এর ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বলেন-

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেই এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হলো সে সব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিলো সবই বরবাদ করেছে। আর যা কিছু উপার্জন করেছিলো, সবই বিনষ্ট হলো।"

তাই আমরা যা কিছু করবো তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবো।

ইসলোমের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি নিয়ত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সহীহ বুখারী'র ১ম খণ্ডের ১ নং হাদীস, এবং মুসলিম শরীফেও এসেছে- "হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাসূল (ﷺ)- কে বলতে শুনেছি যে, সমস্ত কাজ কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তা হবে যার সে নিয়ত করেছে। অতেএব যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের দিকে কিংবা কোনো মেয়েলোকের জন্য তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তার হিজরত সেই দিকেই (গণ্য) হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে।"

সুতরাং নিয়তের গুরুত্ব বুঝতেই পারছেন- এ বিষয়ে "সহীহ মুসলিম" এর কিতাবুল জিহাদ (৪র্থ খণ্ড) এর ৭১১৪ নং হাদীসে এসেছে- রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন- আমি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বেসর্বা, আমার কোনো সহযোগীর দরকার নেই এবং যদি কেউ আমার ব্যতীত অন্য কারও জন্য কাজ করে তাহলে আমি ঘোষণা করছি যে সে তার সঙ্গী হবে।"

তার অর্থ হলো- কোনো কাজের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য করবে এবং কিছু অংশ অন্য কারও জন্য করবে তা হবে না, আপনাকে সব কাজ আল্লাহর জন্য করতে হবে। তিনিই আপনার কাজের প্রতিদান দিবেন। তিনি তার সাথে কাউকে অংশীদার করা পছন্দ করেন না। সুতরাং আমল- ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য নিয়ত একটি মৌলিক বিষয়।

ইবাদত বা আমল কবুল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- আমাদেরকে অবশ্যই শরয়ী পন্থায় আমল করতে হবে। কাজকর্ম, ইবাদত সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী হতে হবে।

এ বিষয়ে **সহীহ মুসলিম- এর ৩য় খণ্ডের ৪২৬৭ নং হাদীসে** এসেছে- **“রাসূল (ﷺ) বলেন- যদি তোমাদের কাজ আমার নির্দেশিত পথ অনুযায়ী না হয় তাহলে তা কবুল হবে না।”**

অর্থাৎ আপনার আমল তখনেই কবুল হবে যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হবে।

হাদীস গ্রন্থ **‘আবু দাউদ’ এর ৩য় খণ্ডের ৪৯৫০ নং হাদীসে** এসেছে,

অর্থাৎ, রাসূল (ﷺ) বলেন- যে সব লোক আমাকে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণ করবে এবং নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে পালন করবে.....তাহলে সে সফল হবে।

আমল কবুল হতে হলে তা অবশ্যই আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়ত থাকতে হবে এবং তা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, অনেকে রমযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য বলে যে, ‘রমযানুল মুবারক’ কিন্তু কিছু লোক এটাকে বলে যে এটি বিদআত, আবার কিছু লোক বলে এটা সুন্নাত। এ বিষয়ে সঠিক মত কোনটি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাসকে স্বাগত জানানো ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) সর্বদা এ মাস সম্পর্কে সাহাবীদের অবহিত করতেন। মুসনাদে আহমদ এর ২য় খণ্ডের ২৪০ নং পৃঃ এবং সুনানে নাসায়ী এর কিতাবুস সিয়ামের ২১০৬ নং হাদীস যেখানে রসূল (ﷺ) সর্বদা মানুষদেরকে এই মাস নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে অবহিত করতেন। রসূল (ﷺ) নিজেই এ মাসকে স্বাগত জানাতেন। তিনি অন্যদেরকে এ মাস আগমনের বিষয়ে অবহিত করেছেন। কাজেই আপনিও এ কাজ করতে পারেন এ বরকতময় মাসের আগমন বার্তা অন্যদেরকে জানিয়ে এ মাসের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অন্যদেরকে সতর্ক করতে পারেন।

রমযান মাসকে কেউ কেউ স্বাগত জানানোর ভাষা হিসেবে রমযানুল মুবারক বলতে পারে। এই কথাটি আমাদের এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ‘বরকত’ একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ- পবিত্র, কল্যাণকর, যা সাধারণত পবিত্র মাসকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের জনগণ যখন মুবারক শব্দটি ব্যবহার করে তখন তারা এই শব্দটি স্বাগতম অর্থে ব্যবহার করে থাকে। তাই যখন রমযান মাস আসে তখন তারা রমযানুল মুবারক বলে। সুতরাং পবিত্র কল্যাণময় মাসকে পবিত্র বলা বা তাকে স্বাগত জানানো বিদআত হওয়ার কথা নয় বিদআত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনিতো এই পবিত্র কল্যাণময় মাসটি সম্পর্কে এর

আগমনের বিষয়টি অন্যকে অবহিত করছেন এবং মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, এ মাসটি কল্যাণের মাস। তাই এটা বিদআত হতে পারে না। এটা যদি বিদআত হয় তাহলে আপনি কোন শব্দটি পছন্দ করবেন যা এই মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য 'মুবাহ' হবে। আপনার অপশন তাহলে কী হবে?

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা যেমন বলি 'রমযানুল মুবারাক' ঠিক তেমনি উপসাগরীয় দেশগুলোতে বলে 'রমযানুল কারীম'। এগুলো সবই পবিত্র মাস, কল্যাণের মাস, ক্ষমার মাস বুঝায়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পছন্দ ও অঞ্চলভেদে ভিন্নতা হতে পারে। কিন্তু প্রিয় নবী (ﷺ) এই মাস আগমন উপলক্ষে অন্যদেরকে বলতেন- "হে লোক সকল, বরকতময় রহমতের মাস নিকটবর্তী হয়েছে, আগমন করেছে।"

যে কারণে আমি মনে করি আমাদের মধ্যে একে অপরকে এ মাস উপলক্ষে wish করবে এবং এ পবিত্র মাস সম্পর্কে একে অপরকে মনে করিয়ে দিবে।

রমযানের ২য় শিক্ষা

রমযানের পরিচিতি এবং ইতিহাস

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: আসসালামু আলাইকুম। আজকের আলোচনায় আমরা রমযান এবং এর পরিচিতি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। ডা. জাকির নায়েক, রমযানের পরিচয়টা কোনোভাবেই যথাযথ হবে না যদি প্রথমে এর সংজ্ঞাটা না দেওয়া হয়। সুতরাং আলোচনার শুরুতে আপনি কি রমযানের সংজ্ঞাটা দিতে পারবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ওয়ালাইকুম আসলাসাল। রমযান শব্দটা আরবি শব্দ রামিদা- আর রামাদান থেকে এসেছে। যার অর্থ- তীক্ষ্ণ, প্রখর, আগুনে ঝলসানো। এটি আরো একটি আরবি শব্দ 'রামাদাহ' থেকে এসেছে, যার অর্থ- 'সূর্যের প্রখর তাপে গরম হয়ে যাওয়া বালি'। ব্যাপক অর্থে রমযান বলতে একজন রোযাদার রোযা রাখার ফলে তার পাকস্থলীতে পিপাসার কারণে যে প্রখর তাপের সৃষ্টি হয় সেটাকে বোঝানো হয়েছে। দিনের বেলায় রোযা রাখার কারণে পিপাসার সৃষ্টি হয় এবং এটি পাকস্থলীতে অসম্ভব রকমের তাপ সৃষ্টি করে যেটিকে বলা হয়েছে- রমযান। আবার রমযানের আরো এক ধরনের অর্থ আছে যেটি হলো, রমযান মুসলিমের ভালো কাজের কারণ এবং এটি মুসলিমদের সকল গুনাহকে পুড়িয়ে দেয়। সুতরাং রমযান হলো এমন একটি মাস যেটি মুসলমানদের সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। রমযান মুসলমানদের

গুনাহগুলোকে ওইভাবে ছেকে ফেলে যেভাবে সূর্যের প্রখর তাপ জমিনকে তাপে সিদ্ধ করে ফেলে এবং সাধারণভাবে তাপ কিন্তু সকল বস্তুকে গলাতে এবং তাকে সুবিধামত আকার দিতে সহযোগিতা করে। ঠিক একইভাবে রমযানও মানবজাতির মানসিক ও চিন্তাগত দিক থেকে আকার প্রদান এবং পুনর্গঠনে সাহায্য করে এবং এটাই হলো রমযানকে রমযান বলার প্রধান কারণ।

প্রশ্ন: আপনার রমযান সম্পর্কে দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে রোযার কথাটি বলা হয়েছে, যেটিকে আরবিতে সাওম এবং ইংরেজিতে বলা হয় Fasting। রমযানের আলোকে আপনি বলবেন কি, Fasting অথবা সাওম শব্দটি কীভাবে রমযানের সাথে জড়িত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাওম এবং সিয়াম দুটি আরবি শব্দ যেটি আরবি শব্দ 'সমাহ' থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো- সাধারণ বিষয় থেকে সংযত থাকা, বিরত থাকা। সেটা হতে পারে খাওয়া পান করা কিংবা কথা বলা থেকে। যে ব্যক্তি সাওম পালন করে, সংযত থাকে, বিরত থাকে তাকে বলা হয় 'সায়িম' এবং এই শব্দগুলো পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা আছে, (সূরা মরিয়ম, আয়াত- ২৬) যেখানে আল্লাহ মেরী তথা মরিয়মকে বলেছেন,

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

অর্থ: "আহার করো, পান করো এবং চক্ষু শীতল করো। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও, "আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।"

এখানে সাওম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এখানে সাওম শব্দটির অর্থ খাওয়া দাওয়া কিংবা পান করা থেকে বিরত থাকা বোঝায় নি বরং এটি কোনো ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বোঝানো হয়েছে; কারণ এর পেছনে একটি ঘটনা ছিলো। উল্লিখিত আয়াতের ঠিক আগের আয়াতে আল্লাহ মরিয়মের উদ্দেশ্যে বলেন, (সূরা মরিয়ম, আয়াত- ২৫)

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

অর্থ: “তুমি নিজের দিকে খেজুরের কাণ্ড নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর পাকা খেজুর পতিত হবে।”

এবং এরপরই পরের আয়াতে বলা হয়েছে, খাও এবং পান করো যেটি তোমার উপর পতিত হয়েছে এবং এমতাবস্থায় যদি তুমি কাউকে দেখ তাহলে বলো যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি এবং আমি কোনো লোকের সাথে কোনো কথা বলবো না। সেখানে কথা বলার সম্পর্কে বলা হয়েছে সুতরাং সেখানে সাওম শব্দটি কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় সাওম বলতে ধর্ম পালনের একটি বিশেষ মাধ্যমকে বোঝানো হয়েছে। যেটি কোনো ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে থাকে এবং সে খাওয়া, পান করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে। সহজ কথায় ইসলামে সাওম শব্দের অর্থ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি রোযা ভেঙ্গে ফেলে এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে। এবং যে সব জিনিস রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলো খাবার এবং পানীয় যেটি মুখ অথবা নাক দ্বারা গ্রহণ করা হয়। এই পানীয় যেকোনো ধরনের হতে পারে, যেমন- দুধ, ফলের রস অথবা অন্যান্য পানীয় যেটি নাক কিংবা মুখ দ্বারা গ্রহণ করা হয় অথবা কোনো পুষ্টি যেটা শরীরের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে গ্রহণ করা হয় এবং সাওম একইভাবে যৌন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকাকেও নির্দেশ করে। এক কথায় সাওম বলতে পাকস্থলী এবং শরীরের বিশেষ অঙ্গগুলোকে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত রাখাকে বোঝায়। এটিই হলো ইসলামে সাওমের মৌলিক অর্থ। কিন্তু যদি আমরা ব্যাপক অর্থে সাওমকে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে, সাওম বলতে শুধু পাকস্থলী আর যৌনকর্ম হতে বিরত থাকাকে বোঝায় না বরং এটি পাকস্থলী এবং যৌনকর্মের সাথে সাথে জিহবার ব্যবহারের ব্যাপারেও বিরত থাকাকে বোঝায়। শুধু তাই নয় এটি চোখ, কান এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ব্যবহারের ব্যাপারে বিরত থাকাকে নির্দেশ করে এবং এগুলোই হলো সাওম শব্দটি ব্যবহার করার প্রধান কারণ: যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা যায়।

এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন, (বুখারী, রোযা, হাদীস নং ১৯০) **“যে ব্যক্তি সংযত হলো না, মিথ্যা কথা এবং অশ্লীল বাক্য ব্যবহার হতে বিরত হলো না তার খাওয়া এবং পান করা আর না করার ব্যাপারে আল্লাহর কিছু আসে যায় না।”**

অর্থাৎ খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আমাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলা, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস রয়েছে যেখানে মুহাম্মদ (সঃ) **বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি রোযা পালন করছে তার উচিৎ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সে যে মিথ্যা কথা এবং অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ওই রোযাদারের সাথে রাগারাগি, তর্ক- বিতর্ক অথবা মারামারি করতে চায় তাহলে ওই রোযাদার ব্যক্তি যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।”**

সুতরাং আমরা যদি এই হাদীসটার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারি যখন কোনো ব্যক্তি রোযা রাখে তাকে অবশ্যই মূলত তিনটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রথমত, পাকস্থলী এবং শরীরের বিশেষ অঙ্গগুলোকে ওই সমস্ত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে হবে যেগুলো রোযা ভেঙ্গে দেয়; যেমন- খাওয়া, পান করা এবং যৌনকর্ম।

দ্বিতীয়ত, শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলোর ব্যাপারেও রোযা রাখতে হবে অর্থাৎ সেগুলোর ব্যবহারে সংযমী কিংবা বিরত থাকতে হবে। সেগুলো হলো- চোখ, কান, জিহবা।

জিহবার রোযা বলতে বোঝায় রোযাদারকে অবশ্যই পরনিন্দা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা এবং অশ্লীল, শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে, বিরত থাকতে হবে বাজে গল্পগুজব করা থেকে।

চোখের রোযা বলতে বোঝায়, রোযাদারকে অবশ্যই অবৈধ এবং দৃষ্টিকটু জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। রোযাদারের জন্য অনৈসলামিক চলচ্চিত্র এবং অনৈসলামিক জিনিসপত্র দেখা উচিৎ নয়।

কানের রোযা বলতে বোঝায়, রোযাদারকে অবশ্যই নিষিদ্ধ এবং হারাম জিনিস শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন গান, বিশেষ করে অনৈসলামিক গান বাজনা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করেই আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলোকে বিভিন্ন নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত রাখতে পারি।

তৃতীয়ত, অন্তর এবং আত্মার রোযা। রোযাদারের উচিৎ ওই সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যেগুলো তাকে আল্লাহকে স্মরণ এবং ইবাদত করা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। সুতরাং এই সবগুলো সাওমের অর্থ প্রকাশ করে।

প্রশ্ন: রমযান মাসের বাইরে কি আর কোনো রোযা আছে যেটি মুসলমানদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ব্যাপক অর্থে রোযাকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. বাধ্যতামূলক রোযা ও ২. বাধ্যতামূলক নয়- এমন রোযা।

বাধ্যতামূলক রোযাগুলোকে আবার চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, আমি রমযান মাসের বাধ্যতামূলক রোযা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষ কারণে রমযান মাসের কোন রোযা পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে এর জন্য তাকে পরবর্তীতে পূরণ করতে হবে যেটিকে কাফফারা বলা হয়।

তৃতীয়ত, রোযা থাকা অবস্থায় কিছু কাজ আছে যেটি করলে রোযা ভাঙ্গে এবং এই রকম কর্মের ফলে যে রোযা রাখতে হবে সেটি বাধ্যতামূলক এবং এখানেও কাফফারা পালন করতে হবে।

চতুর্থত, যদি কোনো ব্যক্তি রোযা মানত করে, তবে তার জন্য সেটি বাধ্যতামূলক। সুতরাং এই চারটি হলো অবশ্যই পালনীয় রোযা।

প্রশ্ন: দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক ভাইবোন আছে যারা পবিত্র রমযান মাসে রমযানের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাগুরো অবহেলা করে। এ ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে আপনি কিছু উপদেশ দিন। তাছাড়া রমযান মাসে মুসলমানদের জন্য রোযা রাখা ফরজ এই ব্যাপারটি প্রমাণ করলে খুশি হবে।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কুরআনের অনেক আয়াত এবং একাধিক হাদীস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে মুসলমানদের ভিতরে যারা রোযা রাখার উপযুক্ত হয়েছে তাদের জন্য রোযা রাখা বাধ্যতামূলক, ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, **(সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৩)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।”

এই আয়াতে আরবি শব্দ **‘কুতিবা’** ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ নির্দেশিত, অবশ্য পালনীয়। বলা হয়েছে তোমাদের জন্যেও রোযা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের উপরেও একইভাবে বাধ্যতামূলক ছিলো। অর্থাৎ আমাদের পূর্বে যারা এসেছিলো তাদের জন্যও রোযা ফরজ ছিলো কিন্তু এটা ফরজ মুসলিমদের জন্য ঈমানদার এবং অন্যদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রথমত, রোযা তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের উপরও ফরজ ছিলো। তৃতীয়ত, রোযা ফরজ করা হয়েছে যেন

তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ **‘তাত্তাকুন’** যেটি এসেছে আরবি শব্দ ‘ওয়াকা’ হতে যেটি একইভাবে ‘তাকওয়া’ শব্দের ধাতুমূল; যার অর্থ অবশ্যই ‘আল্লাহকে ভয় করা’। সংক্ষেপে তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো- আল্লাহর ভয়, চেতনা। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন- তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো। রোযা মানুষের তাকওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি চেতনা আসে। যখন একজন ব্যক্তি রোযা থাকে তখন সে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে সে মলিন হয়ে যায়। কিন্তু সে রোযা ভাঙ্গে না।

রোযা রাখার ফলে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আমাদের আগ্রহ কমে যায় এবং আল্লাহর প্রতি ভয় অনেক গুণে বেড়ে যায়। কারণ রোযা আমাদের আত্মসংযমী হতে সহযোগিতা করে যেটি আমাদের তাকওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: “রমযান মাস হলো সেই মাস যাতে পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে।”

এখানে পুনরায় রোযাকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে। রমযান মাসে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। তবে এ ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যদি কেউ অসুস্থ কিংবা বিশেষ অসুবিধার ভিতরে থাকে তার জন্য ব্যতিক্রম রয়েছে কিন্তু রমযান মাসে মুসলমানদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে। রোযার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। সেই সমস্ত হাদীস থেকে আমি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাত্র একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (সহীহ বুখারী, ঈমান অধ্যায়) ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেগুলো হলো-

১. আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।
২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. হজ্ব পালন করা।
৫. রোযা রাখা।

সুতরাং হাদীসে বলা হয়েছে যে, রোযা হলো ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। এটা শুধু ফরজই নয় বরং এটি ইসলামের একটি অন্যতম নীতি, ভিত্তি। মুসলমানদের জন্য ইসলাম যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে রোযা তার মধ্যে অনন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এখান থেকে মুসলমানরা জানতে পারে যে রোযা পালন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ্

প্রশ্ন: এই প্রশ্নটি রমযানের ইতিহাস সংক্রান্ত। আসলে যেসব জিনিসগুলো রোযা ভেঙ্গে দেয় সেই সব ব্যাপারে বলেছেন কিন্তু রোযা ভেঙ্গে দেয় এমন সব ব্যাপার থেকে বিরত থাকার নির্দিষ্ট সময়সীমা কী এবং ঠিক কোন সময়ে মুসলমানদের জন্য এগুলো আরম্ভ হয়েছিলো?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুসলমানদের রোযার ব্যাপারটি পবিত্র কুরআনের (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫) ভিতরে উল্লেখ আছে যেটা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। ওই সময়ে মুসলমানরা তিন দিনের জন্য রোযা পালন করতো। কিন্তু যখন সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে আল্লাহ তায়ালা পুরো রমযান মাসেই রোযা পালনের নির্দেশ দেন। প্রাথমিকভাবে রমযান মাসে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ পুরো রমযান মাস রোযা পালনের নির্দেশ দেন। যে সব বিষয়গুলো রোযাদারের রোযা বাতিল করে দেয় তার মধ্যে একটি হলো- যৌনক্রিয়া। এমনটি স্ত্রীর সাথে করলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটি সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে এর কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যেতো না।

ওই সময়টিতে মুসলমানরা দিনে রাতে উভয় সময়েই স্ত্রী সহবাস করা থেকে বিরত থাকতো এবং এটি পুরো রমযান মাস ধরেই চলতো। এটি অনেক মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং এখন আমার কুরআনে উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এটি 'আল কুতাবি' নামক (কুরআনের তাফসীর) গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের ২১০ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আছে, "একদিন সাহাবি ওমর বিন খাত্তাব (রা.) মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে

সাক্ষাৎ শেষে বেশ রাত করে বাড়িতে ফিরলেন এবং তখন তার স্ত্রীর সাথে থাকার ইচ্ছা হলো এবং ওই রাতে তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। পরের দিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে খুব খারাপ এবং লজ্জাবোধ করতে থাকলেন। এমতাবস্থায় তিনি নবীর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছি, পাপ করেছি এখন এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি উপায় আছে? আমার অন্তর স্ত্রীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলো যার থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো?

তারপর মুহাম্মদ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, ওমর তুমি সত্যিই এমন কাজ করেছো? এটি পাপ। এবং তিনি বেশ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এর কিছু পরে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। আয়াতে বলা হয়েছে- "রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিচ্ছদ একই ভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা আত্ম প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তা থেকে আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়।"

অতঃপর রোযা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " সুতরাং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানদের জন্য রোযার নিয়মকানুন আরো সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ রোযাদাররা রাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার সুযোগ লাভ করে তবে দিনের বেলাতে নয়। সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রোযাদাররা সূর্যাস্তের পর তাদের রোযা ভাঙ্গতো অর্থাৎ ইফতার করতো এবং এর পরপরই যদি ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে তারা পরের দিনের সূর্যাস্তের পরে আবার খাওয়ার সুযোগ পেতো। কারণ এ ব্যাপারে তখন কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছিলো না। সাহাবী কায়েস (রা.) রোযা রাখা অবস্থায় খুব পরিশ্রমের কাজ করতেন এবং ইফতারের সময় হলে তিনি ইফতার করার জন্য বাড়িতে ফিরে আসতেন। একইভাবে একদিন তিনি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে খাবার দিতে বললেন এবং তার স্ত্রী বললেন ঘরে কোন খাবার নেই। তার স্ত্রী খাদ্য অন্বেষণে বেরিয়ে গেলেন। যেহেতু সাহাবি অধিক পরিশ্রম করেছিলেন তাই স্ত্রী খাবার আনতে যে সময় লেগেছিলো এর মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতঃপর যখন তার স্ত্রী বাড়ি ফিরলো দেখলেন যে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তিনি স্বামীকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডাকলেন না যার ফলে তিনি ওই রাতে খেলেন না বরং পরের দিন সূর্যাস্তের পর ইফতার করলেন। এরকম পরিস্থিতির ফলে লোকেরা মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো- যদি কোনো রোযাদার ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাতে খেতে না পারে তাহলে

তার জন্য কি ব্যবস্থা হবে? পরবর্তীতে যখন সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয় সেখানে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের অনুমোদনের পাশাপাশি বলা হয়- "তোমরা পানাহার করো ততক্ষণ, যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত এবং এই নিয়মটি এখনও পর্যন্ত পালিত হচ্ছে। অর্থাৎ রোযার অর্থ হলো আপনাকে অবশ্যই খাওয়া, পানাহার করা, পুষ্টিগ্রহণ, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি কাজকর্ম হতে বিরত থাকতে হবে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরে এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং এটাই হলো রমযানের ইতিহাস।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, আপনার বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমে রোযা তিন দিনের জন্য ফরজ ছিলো এবং পরবর্তীতে এটি রমযানের পুরোমাস করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআনে সাংঘর্ষিক কিছু পরিলক্ষিত হয় কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আসলে কুরআনে এই ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহ কুরআনে বলেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৮২)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থ: "এরা কি কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেতো।"

সুতরাং কুরআনে এমন কোনো শব্দ জোড়া নেই যারা পরস্পর সাংঘর্ষিক। কিন্তু মানুষ কুরআনের যে আয়াতগুলোর ব্যাপারে বৈপরিত্য আছে বলে মনে করে আসলে সেটি বৈপরিত্য নয় এটি আসলে রহিতকরণের মত অর্থাৎ পূর্বে আল্লাহ তায়ালা যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটিকে সংশোধন বা রহিত করার জন্য পরবর্তীতে আরেকটি আয়াত নাযিল করেন যেমনটি করেছেন রমযানের ক্ষেত্রে। প্রথমে আল্লাহ তিন দিনের জন্য রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে রহিত করে পুরো রমযান মাসটাই রোযা রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু মানুষ ভালো করে না বুঝে এই ধরনের ব্যাপারকে কুরআনের আয়াতগুলোর ভিতরে পারস্পরিক সংঘর্ষ রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করে এবং কুরআনে এই আয়াত রহিতকরণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১০৬)

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: “আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।”

আল্লাহ যখন বান্দাদের উপর বিভিন্ন আদেশ নিষেধ দিয়েছেন তখন দেখা গিয়েছে যে মানুষরা সেগুলো পালন করতে অসুবিধায় পড়ছে কিংবা কোন ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার অভাব বোধ করছে এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনের খাতিরে যথাযথ আয়াত অবতীর্ণ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মাদকদ্রব্যের উপর আল্লাহর আদেশ নিষেধের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি-

মাদক দ্রব্য সম্পর্কে প্রথমে আল্লাহ কুরআনে বলেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২১৯)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

অর্থ: লোকেরা আপনাকে মাদক ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, “বলুন, মাদকের উপকার ও অপকার সম্পর্কে, আসলে মাদকের উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।”

এখানে আপনার জন্য শুধু দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, মাদক গ্রহণে লাভের চেয়ে অধিক ক্ষতি রয়েছে।

পরবর্তীতে আল্লাহ বলেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৪৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো তখন নামাজের ধারে কাছে যেও না।”

কিন্তু এটা বলা হয়নি যে, যদি তোমরা নামাজ আদায় না করো তাহলে মাদকাসক্ত হও। এই কথাটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি বলেই একটা সমস্যা জাগিয়ে তোলে। আয়াতে শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, “মাদকাসক্ত অবস্থায় নামাজ পড়ো না।” সেহেতু মুসলমানরা নামাজের আগে মাদকাসক্ত হতে পারবে যেকোনো সুবিধাজনক সময়ে যেমন সকালে কিংবা বিকালে।

এমতাবস্থায় উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে সর্বশেষ যে আয়াতটি অবতীর্ণ করেন সেখানে আল্লাহ বলেন, (সূরা- মায়েদাহ, অধ্যায়- ৫, আয়াত- ৯০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ এই পর্যায়ে মাদক গ্রহণকে হারাম করে দিয়েছেন। প্রথমে মাদক নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে শুধু দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন সমস্যা দেখা দিল তখন এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুতরাং কুরআনে পরস্পর সাংঘর্ষিক কোনো আয়াত নেই। কিছু লোক আছে যারা বলে এখন কুরআনকে যেভাবে দেখা যায় এটি পূর্বে সেরকম ছিলো না। আমি এই লোকদের সাথে একমত নই। রহিতকরণের অর্থ কিন্তু সংঘর্ষ বা বিরোধপূর্ণ নয়। রহিতকরণ বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা আমরা সর্বশেষ আলোচিত তিনটি আয়াত থেকে বুঝতে পারি। এটি মূলত নিষিদ্ধকরণ বা রহিতকরণ। যেমন- সূরা বাকারাতে বলা হয়েছিলো রোযা রাখা ফরজ কিন্তু সেখানে রোযা তিন দিনের জন্য ফরজ সেটা কিন্তু উল্লেখ ছিলো না; এটা আমরা অন্য মাধ্যম থেকে জেনেছি। পরবর্তীতে সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে অবশ্যই পুরো রমযান মাসটাই রোযা রাখতে হবে।

সুতরাং রমযান মাসে তিন দিন রোযা রাখার ব্যাপারটি আসলে অন্য মাধ্যম থেকে গৃহীত। যদি কুরআনের এক জায়গায় বলা থাকতো যে তিন দিন রোযা ফরজ আবার অন্যখানে বলা থাকতো যে রোযা পুরো রমযানের জন্যই ফরজ তাহলে সেখানে সাংঘর্ষিক কিছু খুঁজে পাওয়া যেতো। পূর্বে কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে কিন্তু যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারবে না বা রোযা রাখতে সমস্যার সম্মুখিন হয় তার জন্য দুটি পথ রয়েছে। হয় সে রোযা রাখবে অথবা কোন দুস্থ গরীব ব্যক্তিকে খাবার খাওয়াবে। সুতরাং ওই সময়ে সমস্যাগ্রস্ত লোকদের জন্য রোযা ফরজ ছিলো না। রোযার পরিবর্তে দুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়ানোর বিধান ছিলো। কিন্তু গরিবকে খাওয়ানোর চেয়ে রোযা রাখাটা উত্তম ছিলো। কিন্তু এরপরে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত অবতীর্ণ হয় যেখানে সকলের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা অসুস্থ অথবা, অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যে শারীরিক এবং মানসিকভাবে রোযা রাখতে পারবে না।

অসুস্থ বলতে এমন অসুস্থতাকে বোঝানো হয়েছে যেটি দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা যেখানে সুস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং বৃদ্ধ বলতে এমন বৃদ্ধ যে তার বয়সের কারণে রোযা রাখতে পারে না।

এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি অবশ্যই রোযার পরিবর্তে সুস্থ ব্যক্তিকে খাইয়ে দিবে। একইভাবে স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে পূর্বে নিয়ম ছিলো পুরো রমযান মাসের দিনে রাতে কখনোই সহবাস করা যাবে না কিন্তু এই ব্যাপারে কুরআনে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ ছিলো না। আমরা এটি অন্য মাধ্যম থেকে পেয়েছি। কুরআনে শুধু বলা হয়েছে- রমযান মাসে রোযা রাখ। কুরআন সাংঘর্ষিক নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরো রমযান মাস ধরে স্ত্রী সহবাস না করাটা রোযাদারদের জন্য বড় ধরনের অসুবিধা তৈরি করে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ মানুষের জন্য রমযানের রাতে সহবাস করার অনুমোদন দিয়ে বিষয়টি সহজ করে দেন। তাই বলে এটিকে পূর্ববর্তী নির্দেশের সাথে সর্বশেষ নির্দেশের সংঘর্ষ বলা যাবে না, এটা নিছক সমস্যা এড়ানোর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সমাধান মাত্র। যেহেতু কুরআন দীর্ঘ সাড়ে বাইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে সুতরাং কুরআনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনাগুলো তৎক্ষণাৎ কিংবা সময়ের প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে রোযার জন্য মানুষ কিছু কিছু সমস্যায় পড়তো কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ এগুলোর জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব কুরআনে কোনো সাংঘর্ষিক আয়াত নেই

প্রশ্ন: রমযান মাসে কি শুধু খাওয়া দাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে নাকি এর সাথে আরো অন্য কোনো নির্দেশনা রয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: একজন রোযাদার ব্যক্তির জন্য যেসব বিষয় পালন করা ফরজ সেগুলো আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পূর্বের আলোচনায় যেসব বিষয়গুলো রোযা বাতিল করে দেয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস।

কিন্তু এর বাইরেও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটি হলো- নিয়ত। নিয়ত ছাড়া আখেরাতের জন্য যে কোনো ভালো কাজই অসাড়তায় পরিণত হয়। অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করা খুবিই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য রোযা রাখি। এটা ধর্ম পালনের একটি আইন। যদি নিয়ত ছাড়া রোযা রাখি তাহলে সেটি বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে রোযা রাখতে পারে, কেউ অনশন করে রোযা রাখতে পারে যেখানে মুসলিম অমুসলিম সকলেই যোগ দেয়। কোনো ব্যক্তি শারীরিক কারণে রোযা রাখতে পারে। ওজন কমানেরা জন্য কিংবা মেডিকেল চিকিৎসার জন্যও রোযা রাখতে পারে কিন্তু ওইসব রোযাগুলো আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাখা হয় না। নিয়ত করা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরীয়তে রোযা রাখার জন্য যেসব বিষয় থেকে

বিরত থাকতে হয়, সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তার সাথে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। নিয়ত ছাড়া রোযা রাখা ফলহীন। রোযাসহ যেকোনো ইবাদত করতে নিয়ত করতে হবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন, তুমি যদি নিয়তের মাধ্যমে তোমার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করো তাহলে এটি দানশীলতায় পরিণত হবে। সাহাবারা বললো, স্ত্রীর সাথে সহবাস দানশীলতা? এটা কীভাবে হে আল্লাহর নবী? তখন তিনি বললেন: যদি তুমি এমন কারোর সাথে সহবাস করো যে তোমার স্ত্রী নয় তবে এটি বেআইনি কিন্তু যদি তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে নিয়ত করে সহবাস করো তাহলে সেটি দানশীয়তায় পরিণত হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, (বাইয়েনাহ, আয়াত- ৫)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

অর্থ: "তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। নামায কায়ে করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।"

আয়াতে ব্যবহৃত **'লিইয়াবুদু'** শব্দটির অর্থ হলো- উপাসনা করা। কিন্তু **'আ'বুদু'** শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো একনিষ্ঠ, নম্র, বিনীত। আরবি ভাষায় 'লিইয়াবুদু' শব্দটি সাধারণত ইবাদত করাকে বোঝায় কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বিনীত, নম্র। আয়াতে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ **'মুখলিসুন'** যার অর্থ ভক্তির সহিত আনুগত্য করা ভক্তির সাথে উৎসর্গ করা। সুতরাং আমাদের আনুগত্য হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং যাবতীয় উপাসনা শুধু আল্লাহর জন্যই এবং এটাই হলো নিয়ত। আল্লাহ কুরআনে বলেন, (সূরা- বাকার, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৯)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থ: "তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত।"

অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু আমাদের জন্য এবং একমাত্র আল্লাহ'ই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকল ইবাদত, আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। যদি আমরা দ্বিতীয় কারোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করি তাহলে সেটি সারহীন হয়ে পড়বে। আমাদের যাবতীয় ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্য কারো নয়। আমরা এটা বলতে পারি না, আমি প্রথম রাকআত নামায পড়ছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় রাকআত

পড়ছি অন্য কারো উদ্দেশ্যে। আমরা বলতে পারি না যে, প্রথম ছাগলটি কুরবানী করছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় ছাগলটি কুরবানী করছি শাসকের উদ্দেশ্যে। আমাদের সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তায়ালা অন্য কেউ নয়। এ ব্যাপারে এখন আমার একটি হাদীস মনে পড়ছে। (বুখারী) "ওমর (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন- ভালো কাজগুলো এর নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তোমার কাজকর্মগুলো তোমার নিয়তেরই প্রতিফলন। যে ব্যক্তি রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সে আসলে হিজরত করেছে, আর যে ব্যক্তি সম্পদ এবং বিয়ের জন্য হিজরত করেছে সে আসলে ওগুলোর জন্যই নিয়ত করেছে। সুতরাং নিয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুমি কেনো হিজরত করবে? কেনো জিহাদ করবে? অবশ্যই আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতএব রোযাসহ প্রত্যেক ইবাদতের জন্য নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, আমি দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। প্রথমত, প্রত্যেক রোযা রাখার সময় কি নিয়ত করতে হবে? দ্বিতীয়ত, নিয়তটি ঠিক কোন সময়ে করতে হবে? এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিয়ত করা ফরজ। এটি আমি আগেই আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি রোযার নিয়ত না করে তবে তার রোযা গ্রহণযোগ্য হবে না।" সুতরাং নিয়ত আপনাকে করতেই হবে। নিয়তটি করতে হবে সাহরির পর অর্থাৎ সাহরি করে রোযার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই নিয়ত করতে হবে। আর নিয়ত শুধু রোযার জন্য নং বরং আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি পূণ্য কাজ করার পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। হ্যাঁ, আর প্রতিটি রোযার জন্যই নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন: যখন রমযান উপস্থিত হয় তখন আমাদের কি করা উচিৎ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমাদের মাঝে রমযান মাস উপস্থিত হলে প্রথমে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে হবে এজন্য যে, তিনি এই অসীম রহমতের মাসকে আবার আমাদের ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপর আমাদেরকে অবশ্যই তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে এবং এই মাসে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যাতে করে তিনি বিগত দিনসমূহে কৃত আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহকে আরো ধন্যবাদ জানাতে হবে কারণ তিনি পৃথিবীর সকল কিছুই আমাদের জন্য দান করেছেন। আল্লাহর সকল রহমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রমযান মাসটিই সবচেয়ে উত্তম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,
(সূরা- বাকার, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: "রমযান মাস হলো সেই মাস যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে।"

এবং একই সূরার আরেকটি আয়াত- ১৮৩ এর ভিতরে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

এই আয়াতে ব্যবহৃত **'তাত্তাকুন'** শব্দটি এসেছে **'তাকওয়াহ'** থেকে, যার অর্থ আল্লাহভীতি। অর্থাৎ বলা হয়েছে যেন তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো। সুতরাং রমযান মাস হলো এমন একটি মাস যেখানে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দাতে পরিণত হতে পারে এবং এটি এমন একটি মাস যেখানে কোনো ব্যক্তির তাকওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং এ মাস মানুষের জন্য একটি প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে থাকে। প্রতিটি মেশিন ১/২ কিংবা ৩ বছর পর পর মেরামত করতে হয় কিন্তু মানবদেহ এমন একটি মেশিন যার এই রকম কোনো মেরামতের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রমযান হলো সেই ধরনের মেরামতকরণ যা মানুষের দেহ, অন্তর এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে মেরামত করে। এটা এমন একটি মাস যেখানে আমাদের তাকওয়া বাড়াতে পারি। আল্লাহর প্রতি ভাবাবেগ এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারি এবং এই মাসেই আমরা মানুষের জন্য সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা তথা আল কুরআন পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: আমাদের মাঝে রমযান মাস উপস্থিত হলে আমাদের কী করা উচিত? আপনার পক্ষ হতে রমযান মাসের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপদেশ দিন।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমাদের মাঝে রমযান মাস উপস্থিত হলে প্রত্যেক মুসলমান নর- নারীকে প্রথমে অসীম রহমতময় এই মাসের প্রতিটি দিন রোযা রাকার মানসিক ঘোষণা দিতে হবে এবং এই মাসের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে এবং এই অসীম রহমতময় মাসের একটি মিনিটও ফলপ্রসূহীন কাজে নষ্ট করা উচিৎ নয়। যতদূর সম্ভব সবসময় আল্লাহর স্মরণে মনঃসংযোগ করতে হবে। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি আমাদের ভাবাবেগ এবং

আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি করে তার কাছে দয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ১৯০৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রোযা রাখলো অথচ মিথ্যা এবং বাজে কাজ করা ত্যাগ করলো না তার খাওয়া, পান করা আর না করার ব্যাপারে আল্লাহর কিছু আসে যায় না।"

যে ব্যক্তি খারাপ কাজ, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি ছাড়ে না তার ওই রোযাকে আল্লাহ কোন হিসাবে নেন না। তার সাথে তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা, অশ্লীল কথা ইত্যাদি ছাড়ছো না ততক্ষণ তোমার রোযা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

মুহাম্মদ (ﷺ) আরো বলেন, (আহমদ, ভলিউম- ২, পৃষ্ঠা- ২৩০, হাদীস নং ৭১৪৮ এবং নাসাঈ রোযা, হাদীস নং ২১০৬) "হে মানবজাতি, অসীম রহমতময় পবিত্র রমযান মাস উপস্থিত হয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এই মাসে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আর এই মাসে দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই মাসের একটি রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যদি কোনো ব্যক্তি এ মাসের আশীর্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে ওই ব্যক্তি আসলেই বঞ্চিত।"

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই এই মাসের সুযোগগুলো লুফে নিতে হবে মুহাম্মাদ (ﷺ) আরো বলেন, (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ৩, রোযা, হাদীস নং - ১৯০১)

অর্থাৎ, "পবিত্র রমযান মাসে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যয়ে রোযা রাখে আল্লাহ তার জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন।"

আল্লাহর পুরস্কারের আশায় সত্যিকার এবং মনোযোগের সাথে রোযা রাখলে আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেন। অতএব, রমযান মাস হলো নিজেদের গুনাহগুলো মাফ করে নেওয়ার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, ভলিউম- ৩, রোযা, হাদীস নং - ১৯০৪)

অর্থাৎ, "আদম সন্তানেরা রোযা ব্যতীত অন্য যে সকল ছওয়াবের কাজ করে সেগুলো সব তাদের নিজেদের জন্য কিন্তু তারা রোযা রাখে একমাত্র আমার জন্য সুতরাং এর পুরস্কার আমিই দেব।"

দ্বিতীয়ত, রোযা হলো এক ধরনের ঢাল, প্রতিরোধক, এটি ভুল পথ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি রোযাদারের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে বলা হয়েছে ওই রোযাদার যেন বলে আমি রোযাদার আমি রোযাদার। কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, ভলিউম- ৩, হাদীস নং - ২)

অর্থা, "শয়তান মানুষের ভিতরে ওইভাবে প্রভান বিস্তার করে যেভাবে মানবশরীরে রক্ত চলাচল করে।"

সুতরাং আমরা যখন রোযা থাকি তখন আমাদের ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং শরীরের বল শক্তি কমে যায় তখন ক্ষুধা নিরাময়ের জন্য খাবারের অপেক্ষ করি যেটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ দিয়েছেন; এতে করে আমাদের তাকওয়া বেড়ে যায়। এরপর যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন এটি আমাদের রক্ত প্রবাহে যুক্ত হয়। কিন্তু যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকি তখন শয়তানের প্রবেশপথও বন্ধ থাকে যেটি আল্লাহর প্রতি ভয় আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন: রমযান কি ভ্রাতৃত্ববন্ধনের জন্য বিশেষ কোন বার্তা বহন করে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "মুসলমানরা একটি শরীরের মত। সকল মুসলিম মিলে একটি শরীর। সেটি এইরকম যেমন শরীরের কোনো অংশে ব্যথা পেলে তা সব জায়গায় অনুভূত হয়। হোক সে যেকোনো দেশ, জাতি, কিংবা বর্ণের। তারা সবাই একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রিভূত আর তাহলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" সুতরাং এই কালেমার দ্বারাই পৃথিবীর সকল মুসলমানরা একত্রে সংযুক্ত। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- হুজরাত, আয়াত- ১৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ: "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে

পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ, সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।”

আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি, জাতি, বর্ণ দেশ ইত্যাদি দ্বারা পরিচিত নয় বরং ব্যক্তির পরহেজগারি, তাকওয়াটাই আল্লাহর কাছে বিবেচ্য।
আল্লাহ আরো বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।”

সুতরাং রোযা মুসলমানদের তাকওয়া বাড়িয়ে দেয়; সেটি সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহযোগিতা করে। ভিন্ন জাতি, বর্ণ, দেশ, লিঙ্গ মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে না। রমযান মাসে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধও বৃদ্ধি পায়। আর ভ্রাতৃত্ববোধের সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমরা মহানবীর (ﷺ) যুগে দেখতে পাই। সে সময় বিভিন্ন দেশ, গোত্র, জাতি, বর্ণ থেকে অনেক সাহাবা মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের, বেলাল (রা.) ইথিওপিয়া থেকে, শোয়েব (রা.) রোম থেকে, সালমান ফারসী (রা.) এসেছিলেন ইরান থেকে এবং ইসলামের ইতিহাসে আপনি যতই দেখবেন সর্বক্ষেত্রেই একই ধরনের ঘটনা পাবেন। ইমাম বোখারী হলেন বুখারার অধিবাসী, আরবের নয়, আল্লামা ইকবাল হলেন পাকিস্তানের। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে মুসলমানেরা সকলে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং রমযান আমাদেরকে এই ভ্রাতৃত্ববোধকে আরো বাড়িয়ে দেয়; কারণ এ মাসে আমাদের আল্লাহভীতি বেড়ে যায়।
মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, ভলিউন- ১, সালাত, হাদীস নং - ৪৬৮)

অর্থাৎ, “একজন বিশ্বস্ত, ধর্মপরায়ণ মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সাথে ওই রকমভাবেই সংযুক্ত যেভাবে, একটি ইট গাঁথুনীর দ্বারা আরেকটি ইটের সাথে যুক্ত থাকে।”

তিনি আরো বলেছেন, (মুসলিম, ভলিউম- ৪, হাদীস নং- ৬২১৯) “একজন মুসলিমের উচিৎ আরেকজন মুসলিমের বিপদে- আপদে সহযোগিতা করা এবং একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের বিরোধিতা করতে পারে না।”

সুতরাং এটাই হলো ভ্রাতৃত্ব যেটি মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এবং এটা শেখার জন্য রমযান মাস হলো সর্বোত্তম মাধ্যম; কেননা এই মাসে মুসলিমদের তাকওয়া বৃদ্ধি পায় আর তাকওয়াই একমাত্র মাধ্যম যেটি মুসলমানদেরকে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

রমযানের ৩য় শিক্ষা

যাদের জন্য রোযা ফরজ এবং ফরজ নয়

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার : রমযান মাসে কি সকল মুসলিমের উপর রোযা ফরজ নাকে নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপের উপর?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কোনো ব্যক্তির উপর রোযা ফরজ হতে হলে তার জন্য পাঁচটি শর্ত পূরণ হতে হয়। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।
২. ব্যক্তিকে নিরাপদ থাকতে হবে।
৩. ব্যক্তিকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
৪. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
৫. যে মুসলিম ভ্রমণের উপর নেই তার জন্য রোযা ফরজ।

এগুলো ছাড়া মহিলাদের উপর রোযা ফরজ হওয়ার জন্য আরো চারটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ওই নারীকে ঋতুমুক্ত হতে হবে।
২. তাকে সন্তান প্রসবের পর কিছুদিন পর্যন্ত যে রক্তক্ষরণ হয় তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
৩. সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
৪. গর্ভবতী নয় এমন হতে হবে।

সুতরাং এই নয়টি শর্ত পূরণ হলে নারীর উপর রমযান মাসে রোযা ফরজ হবে এবং প্রথম পাঁচটি শর্ত পূরণ করলে পুরুষের উপর রোযা ফরজ হবে।

প্রশ্ন: তাহলে রোযা কি শুধু মুসলমানদের উপর ফরজ, অমুসলিমদের উপর নয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অবশ্যই, এটা শুধু মুসলমানদের জন্যই ফরজ যারা অমুসলিম, অবিশ্বাসী তাদের রোযা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ **বলেছেন, (সূরা নূর, আয়াত- ৩৯)**

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থ: "যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার সদৃশ যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি সে যখন তার কাছে যায় তখন সে কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

অর্থাৎ অমুসলিমরা তাদের ভালো কাজের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে কোনো প্রতিদান পায় না। তাদের সব পুণ্যের কাজ অর্থহীন। সকল ভালো কাজের জন্যই নিয়ত করতে হবে। নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রোযাসহ প্রত্যেকটি উপাসনা নিয়তের সাথে করতে হবে। আর রোযা রাখার নিয়ত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না সে নিয়ত করবে কার উদ্দেশ্যে? এটিই হলো অমুসলিমদের উপর রোযা বৈধ না হওয়ার মূল কারণ। যদি সে রোযা রাখে তাহলে সেটা রোযা হবে না, হবে এমন কিছু যেটা ইবাদতের মধ্যে পড়ে না। এখানে নিয়ত সবচেয়ে বড় ব্যাপার; যে কারণে অমুসলিমদের সকল পুণ্য বিফলে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে তার জন্য রোযা ফরজ হয়ে যায় অর্থাৎ কেউ যদি রমযানের কোনো এক সময় ধরা যাক মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ওই মুহূর্তে তার জন্য রোযা ফরজ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ ওই ব্যক্তির পূর্বের কোনো গুনাহের হিসাব নেবেন না।

আল্লাহ বলেছেন, **(সূরা আনফাল, আয়াত- ৩৮)**

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

অর্থ: "আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দিন তারা যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে আরম্ভ করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

অর্থাৎ কোনো অবিশ্বাসী ইসলাম গ্রহণ করলে সাথে সাথেই তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে কিন্তু ওই মুহূর্তে তার জন্য রোযা ফরজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: রোযার নিয়মকানুন অনুসারে রোযা রাখার জন্য সর্বোত্তম বয়স কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন- ভারতে বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হলে ১৯ বছর লাগবে, যুক্তরাজ্যে এটি ১৬ বছর। প্রত্যেক দেশে তাদের নাগরিকদের পরিণত বয়সসীমা তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত। এটি তাদের নিজেদের বোঝাবুঝির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইসলামে নামাজ, রোযা ইত্যাদি ফরজ হয় যখন কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। প্রাপ্ত বয়স্কতা ব্যাপারটি নিশ্চিত বা মাপার জন্র তিনটি মানদণ্ড রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি ওই তিনটি মানদণ্ড পূরণ করে তাহলে সে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. শরীরের বিশেষ জায়গাগুলোতে চুল গজালে।
২. ব্যক্তির বয়স ১৫তে পৌঁছলে।
৩. স্বপ্নদোষ হওয়া আরম্ভ হলে এবং মেয়েদের জন্য ঋতুচক্র শুরু হলে।

তবে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি কোনো মেয়ের ৯ কিংবা ১০ বছর বয়স হতে মাসিক শুরু হয় তবে সেও প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়্

প্রশ্ন: রমযান মাসে যে সব লোক রোযা থেকে দায়মুক্ত আপনি কি তাদের একটি তালিকা দিতে পারবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ১৩ শ্রেণীর লোক আছে যারা রোযার দায় থেকে মুক্ত।
১. ওই ব্যক্তি যে অবিশ্বাসী, অমুসলিম।
২. নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক।
৩. মানসিক বিকারগ্রস্ত।
৪. ঋতুবতী নারী।
৫. সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ চলছে এমন নারী।
৬. গর্ভবতী নারী।
৭. সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন নারী।
৮. অসুস্থ কিংবা পীড়িত ব্যক্তি।
৯. রোযা রাখতে অক্ষম এমন ব্যক্তি।
১০. প্রবীণ ব্যক্তি।
১১. মুসাফির (ভ্রমণ করছে এমন) ব্যক্তি।

১২. যুদ্ধরত, যে যুদ্ধ করছে তার জন্য রোযা ফরজ নয়।
১৩. যার উপর শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে এমন ব্যক্তি।
এই হলো ১৩ প্রকারের ব্যক্তি যারা রোযার দায় হতে মুক্ত।

প্রশ্ন: তালিকায় উল্লিখিত সকলকেই কি পরবর্তীতে আগের না রাখার রোযাগুলো পূরণ করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: উল্লিখিত ১৩টি শ্রেণীর প্রথম তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য পরবর্তীতে রোযা পূরণ করার দরকার নেই তারা হলো-
১. অবিশ্বাসী ব্যক্তি।
২. অপ্রাপ্তবয়স্ক।
৩. মানসিক বিকারগ্রস্ত।

তালিকার নবম এবং দশম শ্রেণীর লোকদের জন্য পরবর্তীতে রোযা পূরণ করার দরকার নেই; তবে তাদেরকে অবশ্যই দুস্থ, গরীবদের খাওয়াতে হবে। তারা হলো-
১. অক্ষম ব্যক্তি।
২. প্রবীণ ব্যক্তি।

বাকি ৮ শ্রেণীর লোকেরা যখন তাদের সমস্যা থেকে মুক্ত হবে তখন পূর্বের না রাখা রোযাগুলো পূরণ করে নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো মহিলা ঋতু থেকে মুক্ত হবে তখন যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী রমযানের পূর্বেই পালন না করা রোযাগুলো পূরণ করে ফেলবে একইভাবে গর্ভবতী অসুস্থ ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা রোযা পূরণ করবে তবে সেটি হতে হবে অবশ্যই পরবর্তী রমযান মাসের আগে।

প্রশ্ন: শিশু অর্থাৎ যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন কেউ যদি রোযা রাখে বা রাখতে চায় তাহলে এর জন্য আপনার কি মতামত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যে ব্যক্তি এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তার জন্য রোযা ফরজ নয় সে রোযার দায়মুক্ত। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (তিরমিযী, হাদীস নং- ১৪২৩)

অর্থাৎ, "তিন শ্রেণীর লোক রোযার বাধ্যবাধকতার বাইরে। তারা হলো-
১. শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত,
২. বন্দী, মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ও
৩. বিকারগ্রস্ত, পাগল; স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আগ পর্যন্ত।

এই তিন শ্রেণীর লোক রোযা রাখার জন্য বাধ্য নয়। তবে আমাদের শিশুদেরকে যথাসম্ভব দ্রুত রোযা রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করা ভালো। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, (বুখারী, রোযা, হাদীস নং - ১৯৬০) **মুহাম্মদ (ﷺ) মদীনার আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যারা রোযা পালন করছে তাদের উচিৎ সেটি চালিয়ে যাওয়া আর যারা রোযা রাখছে না তাদেরও উচিৎ দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকা। এরপর সাহাবারা রাসূল (ﷺ)- কে প্রশ্ন করলো হে আল্লাহর নবী! আমরা কি রোযা রাখবো? অতঃপর তারা নির্দেশিত হলো এমনকি শিশুরাও। এক পর্যায়ে শিশুরা কান্না আরম্ভ করলে তিনি তাদেরকে খেলনা দেওয়ার জন্য বললেন যেন তারা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত খেলা করে সময় কাটায়।"**

অর্থাৎ তখন সাহাবারা তাদের শিশুদেরকে রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন যদিও শিশুদের উপর রোযা ফরজ নয়। কিন্তু এটা একটা ভালো অভ্যাস। বর্তমান যুগে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে, অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে রোযা থাকতে অনুৎসাহিত করেন যদিও তাদের সন্তানেরা রোযা রাখতে চায়। পিতামাতারা বলেন, তোমার ক্ষুধা লাগবে তাই রোযা রাখার দরকার নেই। কিন্তু তারা এটা বুঝতে সক্ষম হয় না যে স্বল্প বয়সে রোযা রাখাটা স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ নয়। বরং এটা তাদেরকে পরিণত বয়সে রোযা রাখার জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণ হিসাবে কাজ করে।'

আল্লাহ বলেছেন, (সূরা তাহরীম, আয়াত- ৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

সুতরাং সন্তানদেরকে অল্প বয়স থেকেই রোযার জন্য উৎসাহিত করা ভালো আমরা বিভিন্ন স্কুলের কিন্ডার গার্টেন, পঞ্চম, ষষ্ঠ, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে রোযা রাখার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকি এবং তাদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ রোযা রাখে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করি। তারপর তারা যখন স্ট্যান্ডার্ড ১ এ উঠে তখন দেখা যায় তাদের বেশিরভাগই পুরো মাস রোযা রাখে। **মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন** (তিরমিযী হাদীস) **"যখন শিশুরা ৭ বছর বয়সে পৌঁছে তখন তাদেরকে**

নামাজ পড়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিৎ এবং যখন তারা ১০ বছরে পৌঁছে তখন তাদেরকে জোর করা, উৎসাহিত করা, আদর স্নেহ, পুরস্কার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নামাজের অভ্যাস করা কর্তব্য।”

প্রশ্ন: মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: বিকারগ্রস্তরা রোযার দায়মুক্ত, কারণ মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (তিরমিযী, হাদীস নং - ১৪২৩) **“রোযা আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য একটি অন্যতম শর্ত হলো নিয়ত।”** আর নিয়ত একমাত্র তার দ্বারাই শুদ্ধ হতে পারে যে মানসিকভাবে সুস্থ, যে ব্যক্তি সুবিবেচিতভাবে নিয়ত করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত সে নিয়ত করে না বা শুদ্ধ হয় না। অতএব, তার রোযা রাখা না রাখার কোনো অর্থ হয় না। এই কারণে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এটাই হলো ইসলামের সৌন্দর্য। যে ব্যক্তি দায়িত্বশীল তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন: যখন কোনো নারী ঋতুমতী কিংবা সন্তানপ্রসব উত্তর রক্তক্ষরণের ভিতরে থাকে তখন তার জন্য রোযা রাখাটা কি নিষিদ্ধ নাকি ঐচ্ছিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ধরনের নারীদের সম্পর্কে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, মুসলিম) **“যে নারী ঋতুবতী কিংবা সন্তান প্রসবের পর সাধারণ রক্তক্ষরণে ভুগছে তাদের জন্য রোযা রাখা নিষিদ্ধ।** সুতরাং এটা ঐচ্ছিক ব্যাপার নয় বরং নিষিদ্ধ। কারণ ওই সময়ে নারীর শরীর থেকে রক্ত বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে আর এটি রোযা বৈধ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন: যে সব লোক বিভিন্ন সাধারণ অসুস্থতা যেমন- স্বল্প অসুস্থতা, মাথাব্যথা, পেটেব্যথা ইত্যাদিতে ভোগে তাহলে কি ওই ব্যক্তিও রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি পাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যে ব্যক্তি অসুস্থ সে রোযার দায় থেকে মুক্ত। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

"যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং যে ব্যক্তি ভ্রমণ করছে তারা পরবর্তীতে তাদের রোযাগুলো পূরণ করে নেবে।" কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যদি কেউ মাথাব্যথা, পেটেব্যথা ইত্যাদির মত সাধারণ রোগে ভোগে তবে সে রোযা রাখা ছেড়ে দেবে।

যদি কোনো ব্যক্তি এইরকম অসুস্থ থাকে যে তার অসুস্থতা সত্ত্বেও সে রোযা রাখতে সক্ষম, তবে তার জন্য রোযা রাখা ফরজ। তবে শুধু ওই সময়ই রোযা ছাড়া যাবে যদি তার অসুস্থতার জন্য রোযা রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। অথবা যদি এরকম হয় যে রোযা রাখার জন্য তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে, শরীরের অবনতি ঘটবে কিংবা অসুস্থতার কারণে সময়মত ওষুধ খাওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক ইত্যাদি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার জন্য রোযা ফরজ নয় কিন্তু সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা, পেটেব্যথার মত সাধারণ অসুস্থতার জন্য রোযা বাদ দেওয়া যাবে না, এটা বাধ্যতামূলক। কারণ আল্লাহ তায়ালা অসুস্থদেরকে রোযা থেকে দায়মুক্তি দিয়েছেন কিন্তু তিনি অসুস্থতার কোনে সীমারেখা টেনে দেননি, তবে তিনি বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৯৫)

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করো না। তোমরা সৎকাজ করো, আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালোবাসেন।

"তোমরা নিজেরা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করো না।" সুতরাং যদি আমরা বুঝতে পারি যে, রোযা রাখাটা আমাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ, স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরণের ক্ষতির কারণ অথবা রোযা মৃত্যুর কারণ হতে পারে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

একইভাবে আল্লাহ তায়ালা আবারো বলেন, **(সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ২৯)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

অর্থাৎ জীবনের জন্য ঝুঁকি কিংবা মৃত্যুর কারণ এমন কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। সুতরাং রোযা ওই অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য ফরজ নয় যারা এমন অসুস্থতায় ভুগছে যে রোযা রাখলে তাদের জীবন বিপদাপন্ন কিংবা মৃত্যুর মুখে পতিত হতে পারে। অর্থাৎ যারা ছোটখাটো অসুস্থতায় ভুগছে তাদের জন্য রোযার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: যে সব লোকেরা রোযা রাখতে অক্ষম, তারা তাদের অক্ষমতার কারণে না রাখতে পারা রোযাগুলোর জন্য খেসারত দেবে কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, **(সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৪)**

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: "আর রোযা যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে।"

অর্থাৎ একজন দরিদ্র, দুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে, যে ব্যক্তি অক্ষম অথবা যে ব্যক্তি এমন অসুস্থ যে তার পক্ষে সুস্থ হয়ে রোযা থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলে সে কি

পরবর্তীতে রোযা পূরণ করবে? কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং এটাই রোযা পরিবর্তে খেসারত দেওয়ার মূল কারণ। এক্ষেত্রে প্রতিটি রোযার জন্য একজন করে দুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে কিংবা সমপরিমাণ কিছু দিতে হবে।

প্রশ্ন: কোন শ্রেণীর বৃদ্ধ ব্যক্তিরা রোযার দায় থেকে মুক্ত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

"যার জন্য রোযা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় তারা এর পরবর্তী একজন মিসকীনকে খাইয়ে দেবে।" বৃদ্ধ বলতে ওই সব বৃদ্ধদেরকে রোযা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বয়সের কারণে যাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং রোযা রাখলে সেটি তাদের শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এই বৃদ্ধ বয়সটি ৬০, ৭০ কিংবা ৮০ বছর বয়সের উপর নির্ভর করে না, এটি ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির বয়সের কারণে তার শারীরিক অবস্থা যদি এমন খারাপ হয়ে যায় যেটি তাকে রোযা রাখা থেকে বিরত হতে বাধ্য করছে তাহলে তার রোযা রাখার দরকার নেই এর পরিবর্তে অবশ্যিই সে একজন করে অসহায়, দুস্থকে খাওয়াবে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, তাফসীর, হাদীস নং- ৪৫০৫) **"অতি বয়স্ক বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের রোযা রাখার দরকার নেই তবে তাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি ছেড়ে দেয়া রোযার পরিবর্তে একজন করে দুস্থকে**

খাওয়াতে হবে।" একইভাবে আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন, (সুনানে দারুকুতনী, ভলিউম- ২, হাদীস নং - ২০৮) "যদি কোনো ব্যক্তিকে রোযা না রাখার খেসারত দিতে হয় তাহলে প্রতিটি রোযার জন্য একজন করে দুস্থ ব্যক্তিকে দুই হাতের তালু এক সাথে লাগিয়ে প্রসারিত করলে তাতে যে পরিমাণ গম ধরে ওই পরিমাণ খাবার তাকে খাওয়াতে হবে।" আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (সুনানে দারুকুতনী, ভলিউম- ২, হাদীস নং- ২৭০) "কোনো এক বছরে যখন আনাস (রা.) অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তিনি রোযা রাখতে পারলেন না এবং রমযান মাস শেষ হলে তিনি ৩০ জন দুস্থ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং তাদেরকে সুজি, রুটি এবং গোশত দ্বারা খাওয়ালেন।"

অর্থাৎ প্রতিটি মিস করা রোযার জন্য একজন করে দুস্থকে খাওয়াতে হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে যদি কোনো ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ নয় কিন্তু স্বাস্থ্যবান তাহলে এসময়ে কি তাকে কোন দুস্থ ব্যক্তি খাওয়াতে হবে? কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সে প্রবীণ হয়ে যায় এবং তার মানসিক অবস্থা যদি ভালো না থাকে তাহলে তার রোযা রাখার দরকার নেই। তাকে রোযার জন্য খেসারতও দেওয়া লাগবে না, কারণ অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি শিশুতে পরিণত হয়ে যায়। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন তিন শ্রেণীর লোক রোযার দায় হতে মুক্ত তারা হলো-

১. শিশু,
২. বন্দী ও
৩. মানসিক বিকারগ্রস্ত।

অতিবৃদ্ধ লোকেরা পুনরায় শিশুতে পরিণত হয়। আমরা বলতে পারি যে বৃদ্ধরা এমন একটি বয়সে পৌঁছে যে সেখানে তাদের মানসিক অবস্থা দৃঢ় থাকে না। এজন্য তাদেরকে রোযা রাখতে হবে না এবং এর জন্য পরবর্তীতে রোযা পূরণ করা বা খেসারতও দিতে হবে না।

প্রশ্ন: মুসাফির অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভ্রমণ করছে তার জন্য রোযা নিষিদ্ধ নাকি ঐচ্ছিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

এখানে বলা হয়েছে- "যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে।" সুতরাং এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এক ধরনের বিবেচনা অর্থাৎ আপনি যদি ভ্রমণ করা অবস্থায় রোযা রাখতে চান তো রাখতে পারেন অথবা যদি না রাখতে চান তো নাও রাখতে পারেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়াগুলো পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ভ্রমণকারীকে অসুস্থ শ্রেণীর লোকদের সাথে তুলনা করেছেন। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, উমরাহ, হাদীস নং - ১৮০৪)

অর্থাৎ, "ভ্রমণ একটি শাস্তি, যখন কোনো ব্যক্তি ভ্রমণ করে তখন এটি তার জন্য শাস্তিস্বরূপ। ভ্রমণ খুবই অসুবিধাজনক কারণ ভ্রমণের সময় তাকে অনেক বিপদ আপদের ভিতর দিয়ে চলতে হয়।"

এ বিষয়ে আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, (বুখারী, রোযা, হাদীস নং- ১৯৪৩) "সাহাবা হযরত হামজা (রা.) সবসময় রোযা রাখার ইচ্ছা করেছিলেন এমনকি ভ্রমণের সময়েও। মুহাম্মদ (ﷺ) এ কথা শুনে তাকে বলেন, ভ্রমণের সময়ে তুমি রোযা রাখতে পারো নাও পারো।" অর্থাৎ ভ্রমণে কেউ রোযা রাখতে বা না রাখতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অনেক ভ্রমণ করছে কিন্তু সে কোন অসুবিধা বোধ করছে না এবং এই পরিস্থিতিতে সে যদি রোযা রাখে তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই অথবা কোনো ব্যক্তি যদি ভ্রমণের সময় বিপদ আপদের ভিতরে থাকে এবং এই পরিস্থিতিতে সে যদি রোযা না রাখতে চায় তাহলে তার রোযা রাখার দরকার নেই। এছাড়া আমরা আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে আরো জানতে পারি, সেখানে বলা হয়েছে, (বুখারী, রোযা, হাদীস নং- ১৯৪৭)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন, "যখন আমরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে ভ্রমণে যেতাম তখন আমাদের দলের ভেতর কেউ কেউ রোযা রাখতো আবার অনেকে রাখতো না। কিন্তু যারা

রোযা রাখতো তারা যারা রোযা রাখতো না তাদের সমালোচনা করতে এবং যারা রাখতো না তারা রোযাদারদের সমালোচনা করতো না। সুতরাং ভ্রমণকালে রোযা ঐচ্ছিক ব্যাপার।

প্রশ্ন: ভ্রমণকালে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সেকি আল্লাহর কাছ থেকে অধিক পুরস্কার লাভ করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৪)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। ইহা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদয়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।

এখানে বলা হয়েছে- "আর রোযা যাদের জন্য কষ্টদায়ক তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে" অর্থাৎ খেসারত দিতে হবে কিন্তু ওই আয়াতে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে- **"রোযা ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে রোযা রাখাটাই তাদের জন্য উত্তম।"** সুতরাং এটিই প্রমাণিত হয় যে, রোযা রাখাটা উত্তম। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, (মুসলিম, রোযা, হাদীস নং- ২৪৯২)

অর্থাৎ, "কোনো এক সময়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে সাহাবারা ভ্রমণ করছিলেন এবং ওই ভ্রমণটি খুব কষ্টসাধ্য ছিলো এবং পুরো দলটিতে মুহাম্মদ (ﷺ) ছাড়া আর কেউ রোযা ছিলো না।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (মুসলিম, রোযা, হাদীস নং - ২৪৭২, ২৪৭৩)

"মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে একটি দল ভ্রমণ করছিলো যেখানো কিছু সাহাবি রোযা ছিলেন কেউ ছিলেন না। এমতাবস্থায় যখন মুহাম্মদ (ﷺ) জানতে পারলেন যে রোযা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।"

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (মুসলিম, রোযা, হাদীস নং - ২৪৭২) **"মক্কার সোনালি যুগের কোন এক সময়ে মুহাম্মদ (ﷺ) তার সাহাবদের সাথে কোন এক জায়গায় গিয়েছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে কয়েকজন সাহাবা রোযা রেখেছে। যখন তিনি দেখলেন রোযা রাখাটা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে যাচ্ছে তখন আসরের সময় তিনি পানি পান করে ফেললেন। তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললেন এবং তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলার কারণে অন্যদের পক্ষেও ভেঙ্গে ফেলা সহজ হয়ে গেল।"** কিন্তু এ সকল হাদীস হতে জানা গেল যে, ভ্রমণের সময় মুহাম্মদ (ﷺ) রোযা রাখাকে পছন্দ করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত এটি কষ্টদায়ক না হতো। কষ্টদায়ক হলে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন কারণ তিনি চান নি যে কষ্ট করে রোযা রাখার ফলে কেউ অসুবিধার ভেতরে পড়ে যাক। সুতরাং দলের সকলে রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন। কিন্তু আমরা এখানে জানতে পারলাম যে যদি সম্ভব হয় তাহলে রোযা রাখা উত্তম কিন্তু যদি সম্ভব না হয় তবে অসুবিধা নেই পরবর্তীতে এটি পূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু রোযা রাখাটাই উত্তম। কেন? কারণ যে ব্যক্তি ভ্রমণের কারণে রোযা রাখচে না সে যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যায় যেটি তাকে পরবর্তীতে রোযা রাখা কষ্টদায়ক কিংবা অনিশ্চিত করে তোলে, তবে সে কিন্তু রোযার জন্য দায়ী থাকবে।

সুতরাং ভ্রমণের সময় যদি কেউ রোযা রাখতে পারে তবে এটি তার জন্য উত্তম হবে। ভ্রমণের সময় রোযা রাখাটা তার জন্য উত্তম এবং তার পরিবার ও আশপাশের লোকজনের জন্যও ভালো। এজন্য যে ভ্রমণকারী ব্যক্তি রমজানের পরে যখন বাড়ি আসে তখন সে একা রোযা রাখে যেটি অনেক সময় তার এবং পরিবার উভয়ের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ভ্রমণে কষ্ট হলেও রোযা রাখার জন্য এটি একটি অন্যতম যুক্তি হতে পারে। এবং এটিই উত্তম।

প্রশ্ন: জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি রোযা হতে মুক্ত কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যখন কোনো ব্যক্তি জেহাদ তথা আল্লাহর দিনকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করতে থাকে তখন সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ যুদ্ধ একটি পরিশ্রমের ব্যাপার এবং এটি যুদ্ধকারীকে দুর্বল করে দেয় যে কারণে যুদ্ধরত ব্যক্তি রোযা হতে মুক্ত।

প্রশ্ন: রমযান মাসে যে সব জিনিস রোযা বাতিল করে দেয় আপনি কি সেগুলো একটি তালিকা দিতে পারবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যে সব জিনিস, কাজকর্ম ইত্যাদি রোযা বাতিল করে দেয় সেগুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৭)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অর্থ: সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী- সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। তোমরা মসজিদে ই' তিকাফরত অবস্থায় তাদের সহিত সংগত হইও না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হইও না। এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনাবলি মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।

এখানে বলা হয়েছে- "রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে.......আর পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়.........।" সুতরাং এখানে আমরা তিন ধরনের জিনিস পাই যেটি রোযা ভেঙ্গে দেয়। সেগুলো-

১. খাওয়া,

২. পান করা ও

৩. যৌন কর্ম করা।

আরো অন্যান্য যে বিষয়গুলো রোযা ভেঙ্গে দেয় সেগুলো হাদীসে উল্লিখিত আছে যেগুলো ১০টির কাছাকাছি এবং আমরা সেইসব বিষয়গুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম

শ্রেণীর জিনিস যেটি আমাদের রোযা বাতিল করে দেয় তাহলো- এমন বস্তু বা ব্যাপার যেটি আমরা বাইরে থেকে আমাদের শরীরের ভিতরে গ্রহণ করি। এগুলোর মধ্যে প্রথম হলো- খাওয়া, পান করা, দ্বিতীয়ত, অন্য কোন কিছু খাওয়া বা পান করা যেটি প্রথম ক্যাটাগরিতে পড়ে।

তৃতীয়ত- ওষুধ, ইনজেকশান, রক্তগ্রহণ করা ইত্যাদি। আরেটি হলো কিডনী ডায়ারাইসিস। কিডনী পরিশোধন করার জন্য সেখানে পানি প্রবেশ করান হয় এবং পরিশোধিত হয়ে সেটি আবার বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো- যে সব জিনিসগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। এ ধরনের জিনিস ৬টি।

১. যৌনক্রিয়া,
২. হস্তমৈথুন,
৩. ঋতুস্রাব,
৪. সন্তান প্রসবের পরের রক্তরক্ষণ,
৫. ইচ্ছাকৃত বমি ও
৬. রক্ত পড়া।
সুতরাং এ দশটি বিষয় রোযা বাতিল করে দেয়।

প্রশ্ন: আপনার উল্লিখিত দশটি বিষয়ের ভেতরে কোন বিষয়টি সবচেয়ে মারাত্মক এবং ক্ষতিকর যেটি রোযা বাতিল করে দেয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: উল্লিখিত বিষয়গুলোর ভেতরে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক এবং অপরাধ যেটি রোযা বাতিল করে দেয় সেটি হলো- যৌনক্রিয়া। যখন কোনো ব্যক্তি যৌনক্রিয়ায় রত হয় এবং যে মুহূর্তে দু'জনের বিশেষ অঙ্গ দু'টি মিলিত হয় তখনি রোযা বাতিল হয়ে যায়। এর জন্য আপনাকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে, পরবর্তীতে রোযা রাখতে হবে, আবার ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। কাফফারা দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, **(সহীহ বুখারী, ভলিউম- ৩, রোযা, হাদীস নং- ১৯৩৬) "কোনো এক সময় মহানবীর (ﷺ) কাছে একটি লোক এসে বললো, হে নবী আমি সর্বনাশ করেছি, আমি সর্বনাশ করেছি। মহানবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটেছে? সে বললো, আমি রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। তখন মহানবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি বিরতিহীন ভাবে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল- না। আমি পারবো না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ৬০ জন দুস্থকে খাওয়াতে পারবে? লোকটি বলল, না, ... ।"**

এখান থেকে আমরা যেটি বুঝতে পারি তাহলো রোযা থাকা অবস্থায় সহবাস করা মহা অন্যায়। যে সব জিনিসগুলো রোযা বাতিল করে দেয় যেগুলোর মধ্যে যৌনকর্ম সবচেয়ে মারাত্মক এবং গুনাহের কাজ। যে ব্যক্তি এই অপরাধ করে ফেলে তার উচিৎ সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দোষ স্বীকার করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাকে অবশ্যই পরবর্তী রমজানের আগে ওই রোযা পূরণ করতে হবে, তাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ কীভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, হয় সে একজন দাস/ দাসীকে মুক্ত করে দেবে। যদি সে মুক্ত করে দেওয়ার মত কোনো দাস/দাসী খুঁজে না পায় বা সঙ্গতি না থাকে তাহলে তাকে বিরতিহীনভাবে দুই মাস অর্থাৎ ৬০টি রোযা রাখতে হবে। এবং সে যদি এটাও না পারে তবে সে অবশ্যই ৬০ জন দুস্থ, অসহায় ব্যক্তিকে খাইয়ে দেবে।”

সুতরাং এ হাদীস থেকে তিনটি অপশন পাওয়া যায়। ক্ষতিপূরণ হিসাবে কাফফারা দিতে হবে কিন্তু কোনো ব্যক্তি তিনটি অপশনের প্রথমটি পালন করতে পারলে তার জন্য পরের দুইটি অপশন পালন করা উচিৎ নয়। প্রথমটি হল, দাস/দাসী মুক্ত করে দেওয়া, যদি কেউ টাকার অভাবে কিংবা মুক্ত করার মত কাউকে খুঁজে না পায় তাহলে সে পরবর্তী অপশনে যেতে পারে যেটি হলো বিরতিহীনভাবে ৬০টি রোযা রাখা। কেউ যদি ১০টি রোযার পর একদিন বিরতি দিয়ে আবার শুরু করে তাহলে তাকে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে; পূর্বেরগুলো গণনায় আসবে না অর্থাৎ ৬০টি রোযা হতে হবে বিরতিহীন। যদি কেউ এটিও না পারে তবে সে তৃতীয় অপশনে যেতে পারবে। সেটি হলো ৬০ জন দুস্থকে খাওয়ান। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে, (দুই হাতের তালু একত্রিত করে প্রসারিত করলে তার ভিতরে যে পরিমাণ গম ধরবে) ওই পরিমাণ খাবার খাওয়াতে হবে। হযরত হাফছা (রা.) এর মতে, “উল্লিখিত পরিমাণ গম সমান ওই পরিমাণ গমের তিনগুণ আটা” এবং এগুলোই যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তার জন্য শাস্তি।

প্রশ্ন: এটির পরে দ্বিতীয় মারাত্মক অন্যায় কাজ কোনটি যেটি রোযা বাতিল করে দেয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দ্বিতীয় মারাত্মক জিনিস হলো হস্তমৈথুন, যেটি রোযাদারের রোযা বাতিল করে দেয়। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং - ১৮৯৪)**

“আল্লাহ বলেছেন, মানুষ তার সকল ভালো কাজগুলো করে নিজের জন্য কিন্তু একমাত্র রোযা হলো শুধু আমারই জন্য এবং এর পুরস্কার আমি নিজেই দেবো। যদি সে খাওয়া, পান করা এবং বিশেষ কিছু আকর্ষণ থেকে বিরত থাকে।”

এখানে বিশেষ আকর্ষণের একটি হলো হস্তমৈথুন। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্পর্শ, কিংবা স্ত্রীকে দেখে অথবা কোন নারীকে কল্পনা বা অন্য কারেরা কথা কল্পনা করে

হস্তমৈথুন করে তখন তার রোযা বাতিল হয়ে যায়। এরকম করলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে এবং পরবর্তীতে ওই রোটি পূরণ করতে হবে কিন্তু এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কাফফারা দিতে হবে শুধুমাত্র স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে। হস্তমৈথুন কিংবা যেকোনো কারণে যদি শুধু 'মজি' বের হয় তাহলে রোযা বাতিল হয় না। 'মজি' বলতে হস্তমৈথুনের প্রথম পর্যায়ে যে হালকা স্বচ্ছ পানি বের হয় সেটিকে বোঝায়।

প্রশ্ন: যে মহিলা ঋতুমতী অবস্থায় থাকে তখন তার জন্য নামাজ মাফ করে দেওয়া হয় যেটি পরবর্তীতে তাকে এর জন্য কাযা আদায় করতে হয় না এবং রোযার জন্যও কি মহিলাদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য? অর্থাৎ মাসিকের সময় বাদ দেওয়া রোযাগুলো পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না? এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন-

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যখন কোনো মহিলা ঋতুমতী অবস্থায় থাকে তার জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, খণ্ড - ৩, অধ্যায় - রোযা, হাদীস নং- ১৯৫১)

"মুহাম্মদ (ﷺ) এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিলো যে, নারীদের মাসিক চলাকালে যে রোযাগুলো রাখা হয় না সেগুলো কি পরবর্তীতে পূরণ করে নিতে হবে? তখন তিনি বললেন, রমযান মাসের ব্যাপারে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন যে মাসিকের কারণে যে রোযাগুলো বাদ যায় সেগুলো পরবর্তীতে পূরণ করতে হবে কিন্তু বাদ যাওয়া নামাজগুলো আর আদায় করতে হবে না।"

সুতরাং এই হাদীস অনুসারে বাদ যাওয়া নামাজ পরবর্তীতে পূরণ করতে হবে না কিন্তু রোযা পূরণ করে নিতে হবে। এই কারণে ঋতুমতী কিংবা সন্তান প্রসবের পর যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে সে সময় মহিলারা রোযা চালিয়ে যেতে পারে না। যদি কেউ এই দুই অবস্থায় মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থান করে তবে তাকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। "যদি কোন মহিলার ইফতারের কয়েক মিনিট আগেও ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায় তবে তাৎক্ষণিভাবে কয়েক মিনিট পূর্বেও যদি মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তাহলো সে রোযা রাখতে পারবে কিন্তু ফজরের ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরে যদি মাসিক বন্ধ হয় তাহল তখন আর রোযা রাখা যাবে না। এবং তাকে অবশ্যই পরবর্তী রমযানের আগে ওই রোযাগুলো পূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু মাসিক বা রক্তক্ষরণের কারণে কেন রোযা ভেঙ্গে যায়? যখন কোন মহিলা ঋতুমতী বা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের ভিতরে থাকে তখন তার শরীর থেকে বেশ পরিমাণে রক্ত বাইরে বেরিয়ে যায় এমতাবস্থায় আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর আরো বোঝা চাপিয়ে দিতে চান না।

সুতরাং আমাদের উপর এটা একটি দয়া। আল্লাহ কাউকে সমস্যার ভিতরে ফেলতে চান না কারণ মাসিক বা প্রসব পরবর্তী সময়ে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হয়ে যায় এবং

এমতাবস্থায় সে যদি বলে আমার খাবার, পুষ্টিগ্রহণের দরকার নেই তাহলে এটি তার জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে যায় এবং এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে ওই বিশেষ সময়ে রোযা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে রোযা পূরণ করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই মহিলাদেরকে অবশ্যিই পরবর্তীতে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। মাসিকের কারণে বাদ পড়া নামাজগুলো পরবর্তীতে পূরণ না করার কারণ হলো মুসলমানরা তাদের জীবনের প্রতিটি দিনে অন্ততপক্ষে পাঁচ বার নামাজ পড়ে সে কারণে পাঁচ ছয়দিনের নামাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই কিন্তু রোযা শুধু রমযান মাসেই বাধ্যতায় যেটি বছরে একবার আসে। সুতরাং সে যদি রমযান মাসের কয়েকটি রোযা মিস করে তাহলে পরবর্তীতে অবশ্যই সেটি পূরা করে নিতে হবে এবং এই কারণে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) নামাজ পূরণ করার কথা বলেন নি কিন্তু রোযা পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, যে ধরেন একজন লোক সেহেরির পরে যদি কখনও অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন খাবারের কণা আঁটকে থাকে তার দাঁতের ফাকে আর তারপর যেহেতু আমাদের মুখের ভিতরে লালা আছে তাই ধরুন সেই খাদ্যকণা গলা দিয়ে চলে গেল পাকস্থলীতে। ধরেন সেই খাদ্যকণাটা সে গিলে ফেলল, এখন এই অবস্থায় পড়লে তার রোযা কি ভেঙ্গে যাবে নাকি না? আর এর সাথে আমরা আরো একটা বিষয় জানতে চাই যদি কেউ নিজের লালা গিলে ফেলে সে ক্ষেত্রে তার কী করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক সময় দেখা যায় এরকম হতে পারে যে খাবারের কণা দাঁতের ফাকে আটকে গেছে, হতে পারে সেহরি খাওয়ার সময় এখন দাঁতের ফাকে আটকে থাকা খাবার পেটে চলে গেল কিন্তু সে লোক টের পেল না, আর যদি না বুঝে খাবারটা গিলে ফেলে তার রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি খাবারের কণাটা বড় হয় ঐ ব্যক্তি টের পেয়ে গেলে বের করে ফেলে দিতে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি সেই খাবারের কণা তার পেটের ভিতরে চলে যায় তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন রোযা বাতিল হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি টের পান আর ইচ্ছাকৃত ভাবে গিলে ফেলেন তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না। যদি আপনি টের পান যে দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আঁটকে আছে বের করে ফেলে দিবেন। আর এছাড়াও যদি কারও দাঁত থেকে রক্ত বের হয়, হয়ত মেসওয়াকের পরে অথবা রোযা থেকে ব্রাঁশ করার সময় সে রক্ত ফেলে দিতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি রক্ত আপনার পেটে চলে যায় তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে গিলে ফেলবেন না।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিয়ে বলি, তার মানে লালার ব্যাপারে, মাথা থেকে আসতে পারে অথবা নাক দিয়ে অথবা গলা ঝাকানি দিলে মুখের ভিতরে যে লালা চলে আসে সেটা যদি গলার ভিতরে পাকস্থলীতে চলে যায়, মুখের সামনে আসে না এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক মানুষেরই এমন হয় লালা গলার ভিতরে আটকে থাকে কোন একসময় পাকস্থলীতে চলে

যায় এতে কোনো সমস্যা নেই এতে রোযা ভেঙ্গে যায় না কারণ এটা প্রকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু লালা যদি মুখে চলে আসে তাহলে বাইরে ফেলে দিবেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখের আসার পর গিলে ফেললে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে গিলা যাবে না।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি রোযা থাক অবস্থায় অসাবধানতাবশত কিছু খেয়ে ফেলে তবে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, এটাকে কি গুরুতর পাপ বলে ধরা যেতে পারে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযা রেখে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করেন তাহলে সেটা গুরুতর পাপ বা বড় গুনাহ। রোযা রেখে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া বা পানাহার করলে সেটা একটা বড় গুনাহ। তখন তাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করতে হবে আর রমযানের পরে জরিমানা হিসেবে তাকে রোযাটা রাখতে হবে। যদি এ খাবারটা মুখ দিয়ে নেয়া হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে অথবা যদি নাক দিয়ে যদি কোনো তরল ভিতরে যায় তাহলে রোযাটা ভেঙ্গে যাবে। নবী (ﷺ) এর একটা হাদীস এ কথা বলছে, হাদীসটার উল্লেখ আছে- (সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড - ২, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৩৬০) আমাদের নবী (ﷺ) বলেছেন-

"তোমরা যখন অযু করবে তখন নাকের ভিতর বেশি করে পানি নেবে কিন্তু রোযার সময়টা বাদে"

এ থেকে বুঝতে পারছি যদি নাকে বেশি পানি দেওয়া হয় তাহলে যদি পানি গলায় চলে যায় তাহলে রোযাটা ভেঙ্গে যাবে। তাহলে নাক দিয়ে কোনো তরল ভিতরে ঢুকলে পেটে চলে যাবে গলার ভিতর দিয়ে এরকম হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করে, ভুলে খাওয়া দাওয়া করে তার রোযা ভাঙ্গবে না। আর রমযান মাসের প্রথম দিকে ভুলটা অনেকেই করে ফেলে, লোকজন অনেক সময় ভুল করে পানি খেয়ে ফেলে আবার খাবারও খেয়ে ফেলে। তাহলে প্রথম কয়েকটা দিন লোকজনের এরকম হতে পারে যে মনের ভুলে খাবার খেয়ে ফেলল অথবা হয়তো পানিও খেয়ে ফেলল। এখন কেউ অনিচ্ছাকৃত ভাবে অথবা ধরেন ভুলে গিয়ে যদি কিছু খায় বা পান করে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। আমাদের নবী(ﷺ)- এর একটা সহীহ হাদীস ও এ কথা বলছে- এটার উল্লেখ করা হয়েছে (সহীহ বুখারী, খণ্ড - ৩, অধ্যায় - রোযা, হাদীস নং - ১৯৩৩) আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেছেন যে-

"যদি কোনো লোক অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করে সে রোযাটা সম্পন্ন করবে, সে যেটা খেয়েছে বা পান করেছে সেটা আল্লাহ তায়াল পক্ষ থেকে"

আমাদের নবী (ﷺ) আরো বলেছেন এটার উল্লেখ আছে (সুনান ইবনে মাজাহ, খণ্ড - ৩, হাদীস নং - ২০৪৩, ২০৪৫) আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেছেন যে-

“আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিবেন যদি তারা ভুলে যায়, ভুল করে অথবা যদি জোর করে কিছু করানো হয়।”

যদি কেউ ভুল করে কিছু করে বা মনে না থাকে অথবা নিরূপায় হয়ে করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া দাওয়া করলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে আর সেটা বড় গুনাহ বা কবীরা গুনাহ।

প্রশ্ন: যদি কোনো রোযাদার ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্য খায় বা পান করে তাহলে তার জন্য কি পরবর্তীতে রোযা পূরণ করতে হবে? এটা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযা থাকার কারণে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কিংবা পিপাসার্ত হয়ে যায় সে যদি এ রকম অনুভব করে যে কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ না করলে তার শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধিত হবে কিংবা জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে এমতাবস্থায় সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং এটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে এই রোযাটি অবশ্যই পূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু কেউ যদি ছোটখাটো সমস্যার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সেটি মহা অন্যায়। এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন: ডা. জাকির কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে ধূমপান করা হারাম। এ ব্যাপারে আমি আপনার মতামতটা জানতে চাই। আর ধূমপান করলে কি আমাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ধূমপানের কথা যদি বলতে হয়, অনেক বছর আগে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নত হয়নি বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ সে সময় বলতেন যে ধূমপান মাকরূহ। একটা হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যেটা আছে সহীহ বুখারীতে (খণ্ড নং- ১, অধ্যায়- আযান, হাদীস নং- ৮৫৫)

নবীজী (ﷺ) বলেছেন, “কখনোও কেউ যদি কাঁচা রসুন বা পেঁয়াজ খায় সে আমার কাছ থেকে, মসজিদ থেকে দূরে থাকবে।”

নবীজী (ﷺ) বলেছেন, পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়ার পরে মসজিদে এসো না কারণ বাজে গন্ধ বের হয়। আর ধূমপান করলে তো আরও বাজে গন্ধ বের হয়। পেঁয়াজ, রসুনের চেয়ে বেশি গন্ধ।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেহেতু পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়া মাকরূহ, এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞগণ ফতোয়া দিলেন ধূমপান করা মাকরূহ। কিন্তু এখন বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে ধূমপান জিনিসটা আসলে এক ধরনের ধীর গতির বিষক্রিয়া। তামাক আপনি যেভাবে নেন না কেন ধূমপানের মাধ্যমে, সিগারেট অথবা বিড়ি বা হুক্কা খেলেন কিংবা তামাক চিবোলেন এই তামাকের মধ্যে রয়েছে বিষক্রিয়া। এখন আমরা জানি যে এটা ধীর গতির বিষক্রিয়া। আর এ কারণে বর্তমান পৃথিবীর

বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ তারা বলেন ধূমপান করা হারাম। শুধু মুসলিম বিশেষজ্ঞ না অমুসলিমরাও বলেন আর সেজন্যই সংবিধি বদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। সিগারেটের প্যাকেটে একটা সতর্কীকরণ দেয়া থাকে যে **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"**। আবার অনেক দেশে লেখা থাকে যে ডাক্তারের সতর্কবাণী অথবা সার্জেনের সতর্কবাণী **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"।** আর সিগারেটের বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে বা কোন ম্যাগাজিনে থাকুক, বাধ্যতামূলক ভাবে এই সতর্কবাণীটা দিতে হবে **"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর"**। শুধুমাত্র মুসলিমরা নয় অমুসলিমরাও এ ব্যাপারে একমত যে ধূমপান এক ধরনের ধীর গতির বিষক্রিয়া। আর বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে বলছে প্রতি বছর ৪০ লাক্ষের ও বেশি মানুষ মারা যায় শুধু ধূমপানের কারণে। সব ধরনের তামাক সেবন করলে সংখ্যাটা আরো বেশি হবে। এছাড়া আরো একটা পরিসংখ্যান বলছে, আমি এ ব্যাপারটা জেনেছি যখন আমি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম যে ফুসফুসে ক্যান্সারে যারা মারা যায় তাদের ৯০ ভাগেরও বেশি মৃত্যুর কারণ ধূমপান; সিগারেট, বিড়ি বা এরকম কিছু। লংকায় যারা মারা যায় তাদের ৭০ থেকে ৭৫ ভাগের ক্ষেত্রে একমাত্র কারণ ধূমপান। ধূমপান আসলে একটা ধীর গতির বিষ। এতে ঠোঁঠ কালো হয়ে যায়, হাতের নখ কালো হয়ে যায়, ঠোঁটের ক্ষতি হবে, হাতের আঙ্গুলের ক্ষতি হবে, ক্ষতিগ্রস্থ হবে পাকস্থলী, এতে করে দেখা যাবে কষ্টকাঠিন্য, খাওয়া দাওয়া অনিহা আসে, এতে যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে, দেখা গেল হয়তো ঔষুধ ঠিক মত কাজ করছে না, এছাড়াও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। এটার উপরে একটা লেকচার দেয়া যায় যে ধূমপান কেন হারাম। আমার একটা লেকচারে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এখানে বলার সময় নেই। তবে বিভিন্ন রিসার্চ এর উপর নির্ভর করে চারশো'র ও বেশি এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ, তারা বলেছেন যে ধূমপান করা হারাম। তামাক সেবন করাটাই হারাম। কিছু কিছু দেশে যেমন- পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আমাদের ভারতের বিশেষজ্ঞগণ বলেন এটা মাকরূহ কিন্তু পুরো পৃথিবীতে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন ধূমপান **"হারাম"**। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- আরাফ, অধ্যায়- ৭, আয়াত- ১৫৭)

"যারা আনুগত্য অবলম্বন করে রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ

করেন অসৎকর্ম থেকে; পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করে যা তোমাদের জন্য খারাপ তা নিষিদ্ধ করে।.............”

তাহলে নবীজী (ﷺ) যা দিয়েছেন তিনি যেগুলোকে ভালো বলেছেন সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করবো, আর যেগুলো খারাপ সেগুলো থেকে বিরত থাকবো। এটাই হচ্ছে আইন। আর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৯৫)

“তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।”

তার মানে নিজেকে মেরে ফেলো না। যেহেতু ধূমপান এক ধরনের ধীর গতি সম্পন্ন বিষক্রিয়া, তাই এটা আত্মহত্যা করার মত। বিষক্রিয়া, প্রত্যেক দিন আপনার ক্ষতি হবেই। এর উপর ভিত্তি করে চারশো'র ও বেশি ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে ধূমপান করা হারাম। আর এছাড়াও আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন- (সূরা- আরাফ, অধ্যায়- ৭, আয়াত- ৩১)

“পানাহার করো কিন্তু অপচয় করবে না”

পবিত্র কুরআনে (সূরা- আল ইসরা, অধ্যায়- ১৭, আয়াত- ২৬ ও ২৭)

“যে তোমরা অপচয় করো না, বাজে খরচ করো না, যারা অপচয় করে তারা তো শয়তানের ভাই”

আমরা সবাই জানি ধূমপান করা আসলে অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে টাকার একটা নোট নিয়ে অথবা সবুজ রং এর ডলার বা পাউন্ড নিয়ে তারপর সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। যখন ধূমপান করেন তখন সিগারেটে আগুন ধরান এটা আসলে টাকা পুড়িয়ে ফেলা, হোক সেটা রুপি বা টাকা বা ডলার বা পাউন্ড অথবা রিয়াল; এটা অপচয় ছাড়া কিছুই না, আর ইসলামে হারাম। আর আমি কারণও দেখাতে পারি কেন এটা হারাম। যখন ধূমপান করেন তখন তাতে পাশের লোকের আরো বেশি ক্ষতিও হয়, অন্যের ক্ষতি তো হতে পারে। আর ধূমপান করলে যখন ধোঁয়াটা বাইরে ছাড়েন তাতে পাশের লোকের বেশি ক্ষতি হয়। যে ধূমপান করে তার চেয়ে যে করে না তার বেশি ক্ষতি হয়। যদি কেউ সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছাড়ে তার পাশে যে থাকে তার শরীরেও ধোঁয়া চলে যায় এতে করে ধূমপায়ীর চেয়ে পাশের লোকের বেশি ক্ষতি হয়। সেজন্য সিঙ্গাপুরে বাইরে ধূমপান করা নিষিদ্ধ, নিজে একাকী খেতে পারে কিন্তু বাইরে জনসাধারনের সামনে খাওয়া নিষিদ্ধ। তাহলে ধূমপান করা ক্ষতি কর সেজন্য এটা হারাম। এবার আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আসি,

যে ধূমপান করলে কি রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে?

যখন কেউ ধূমপান করে ধোঁয়াটা চলে যায় ফুসফুসে, আর সিগারেটে বেশ কিছু উপাদান তখন চলে যায় পাকস্থলীতে। তাহলে আমরা যখন ধূমপান করি তখন ফুসফুস ছাড়াও পাকস্থলীতে ধোঁয়া চলে যায়, এভাবে সিগারেটের বেশ কিছু উপাদান পাকস্থলীতে চলে যায়। একারণে সব বিশেষজ্ঞ একমত হয়েছেন যে ধূমপানের কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়। রোযা বাতিল হয়ে যায়। তাহলে যখন ধূমপান করছেন তাতে রোযাটা ভাংছেনই পাশাপাশি একটা গুনাহও করছেন। এতে করে আপনার পুরস্কারটা কমে যায়। আবার অনেকে আছেন যারা **chain smoker**, তারা রোযা থাকার সময় ধূমপান করে না কিন্তু যখনই রোযাটা ভাংগে ইফতারের পরেই "চিস চিস" শুরু করে। সারারাত ধরে তখন ধূমপান করে। এতে রোযার উদ্দেশ্যটা ব্যাহত করে, যেটা হচ্ছে তাকওয়া বৃদ্ধি করা। একজন মানুষ যদি সিগারেট না খেয়ে ভোর বেলা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারে অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকে তাহলে সারা জীবনই সে ধূমপান ছাড়া থাকতে পারবে। ধূমপায়ীদের উদ্দেশ্যে এটাই আমার পরামর্শ এই রমযান মাসেই আপনারা ধূমপান ত্যাগ করেন, আশা করি বাকি জীবনও ধূমপান ছাড়া কাটাতে পারবেন, ইনশা- আল্লাহ।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, (তিরমিযী, রোযা, ৭২০)

"যদি কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে তাকে পরবর্তীতে পূরণ করতে হবে না কিন্তু যে ইচ্ছা করে বমি করে তাকে পূরণ করতে হবে।"

একই হাদীসে সুনানে আবূ দাউদ শরীফে বলা হয়েছে যে, (রোযা, Vol - 2, ২৩৭৪) **"কেউ যদি হঠাৎ করে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে ফেলে তবে এর জন্য তাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না অর্থাৎ রোযা ভাঙ্গবে না কিন্তু যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে তাকে অবশ্যই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"** সুতরাং কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতবাবে বমি করলে তার রোযা বাতিল হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি গলার ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে কোনো কিছু দেখা বা খোজার চেষ্টা করার ফলে যদি বমি করে দেয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং পরবর্তীতে এটি অবশ্যই পূরণ করে নিতে হবে। আরেকটি ব্যাপার হলো, বমি যদি মুখের ভিতরে উঠে আসে এবং সেটি যদি পুনরায় খেয়ে ফেলা হয় তাহলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসলে সেটি পুনরায় না খেয়ে ফেলে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে কেউ যদি বিয়ে করে তাহলে সেই বিয়ের অনুমতি আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাসে বিয়ে করার কথা যদি বলতে হয়, পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসে কোথাও বলা হয়নি যে রমযান মাসে বিয়ে করা যাবে না। একজন ব্যক্তি বিয়ে করতে পারেন বছরের যেকোনো সময়। তবে এই রমযান মাসে আমরা নিজেদের সংযত রাখি খাওয়া দাওয়া, পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস করা থেকে। এটা নির্ভর করবে তাদের উপরে যারা রমযান মাসে বিয়ে করবে । তাদের তখন কি করতে হবে? দিনের বেলায় নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে হবে ভোর বেলা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। নিজেদের সংযত রাখতে হবে আর এটাই পরীক্ষা। যদি সংযত রাখতে পারে সহবাস থেকে তাহলে বিয়ে করতে পারে তবে রমযান মাসে যদি কেউ বিয়ে করে নতুন স্ত্রী তার সাথে সময় কাঁটাতে হবে, যদি মনে কোনো দ্বিধা থাকে তাহলে দেরি করে বিয়ে করাটাই তার জন্য ভালো রমযান মাসটা শেষ হলে। রমযান মাসে নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করবে। তবে এমনিতে রমযান মাসে বিয়ে করাটা হারাম না।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযা অবস্থায় কি একজন লোক রক্ত গ্রহণ করতে পারে অথবা কোনো ইনজেকশন নিতে পারে, যেটাতে তার শরীর পুষ্টি গ্রহণ করবে। এটার কি অনুমতি আছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শরীরে রক্ত নেয়ার কথা যদি বলেন, এ কাজটা পুষ্টি গ্রহণের ক্যাটাগরিতে পড়বে। এটা অনেকটা খাবারে মত কারণ কারণ খাবারটা প্রথমে পাকস্থলীতে যায় এরপর উপাদান গুলো রক্তের সাথে মিশে যায়। তাহলে শরীরে রক্ত প্রবেশ করাতে গেলে সেটাকে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করার মত করে ধরে নেয়া হয় এতে রোযা ভেঙ্গে যায়। একই ভাবে যদি নাকের মাধ্যমে খাবার দেন তাহলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে, এভাবে খাওয়ানো হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অথাব যদি ইনজেকশন নেন এটা অনেকটা পুষ্টি গ্রহণের মত এক্ষেত্রে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। আপনি কিডনী থেকে রক্ত নিলেন বিশুদ্ধ করে তাতে বিভিন্ন উপাদান মিশালেন তারপর রক্ত শরীরে প্রবেশ করালেন এমন হলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। যে কোনো ধরনের ইনজেকশন হোক পুষ্টি গ্রহণের মত কিছু না থাকলে ঠিক আছে কিন্তু পুষ্টি গ্রহণের মত কিছু থাকলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি এটা শুধু চিকিৎসার জন্য হয় পুষ্টি গ্রহণ না হয় তাহলে তার রোযাটা ভাঙ্গবে না সে তখন রোযা রাখবে।

প্রশ্ন: একজন লোক দান করতে পারবে কি তার নিজের শরীর থেকে, যেমন ধরেন রক্তদান করা। রোযা অবস্থায় কি এটার অনুমতি আছে।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যখনই কেউ রক্তদান করে এটা অনেকটা শরীর থেকে রক্ত বের করার মত। এই রক্ত বের করার ব্যাপারে উলামাগণ বা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে, যে রক্তদান করা যাবে কিনা, রোযা থাকা অবস্থায় রক্তবের করা যাবে কিনা, এটা করার অনুমতি

আছে কিনা? একটা হাদীস এটার উল্লেখ আছে (সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড - ২, অধ্যায় - রোযা, হাদীস নং - ২৩৬৪) আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন-

"যদি কেউ রক্ত বের করে বা রক্ত বের হয় তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।"

যদি কেউ রক্ত বের করে অথবা কাউকে রক্ত বের করা হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে আরো একটা হাদীস আছে (সহীহ বুখারী, খণ্ড - ৩, অধ্যায় - রোযা, হাদীস নং- ১৯৮৮)

"রোযা থাকা অবস্থায় নবীজী (ﷺ) এর রক্ত বের করা হয়েছে ছিল।"

এ দুটো হাদীসের কারণে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে যেহেতু মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে কাউকে যদি রক্ত বের করা হয় আর যে রক্ত বের করবে তাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে। রক্ত বের করা এটা নিষিদ্ধ, রক্তদান নিষিদ্ধ। পরের হাদীসটা হচ্ছে একটা **'কাজ'** প্রথম হাদীসটা একটা **'নির্দেশ'** যখন **'নির্দেশ'** আর **'কাজ'** এভাবে আসবে তখন নির্দেশের গুরুত্বটাই বেশি। এর উপর ভিত্তি করে একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে রক্ত দান করা হারাম। এসব বিশেষজ্ঞ গণের মধ্যে আছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, শাইখ বিন বায বলেন রক্তদান হারাম, বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ শাইখ উসাইমীন বলেন যে এটা হারাম, সালেহ ফাওযান এবং শাইখ জিবরীন এই বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন রক্তবের করা হারাম। শাইখ জিবরীন বলেছেন কাউকে রক্তদান করা রক্তবের করার মত তাই এটা হারাম কিন্তু যদি কাউকে জীবন বাঁচাতে রক্ত দান করেন এর অনুমতি আছে তারপরও রোযা ভেঙ্গে যাবে আর এই রোযাটা তাকে পরে রাখতে হবে।

আরো একদল বিশেষজ্ঞ আছেন, যেমন শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী। তিনি বলেছেন যে আবূ দাউদের এই প্রথম হাদীসটা রহিত করা হয়েছে সহীহ বুখারীর হাদীসটার মাধ্যমে সে জন্য রক্তবের করা ও রক্তদান করার অনুমতি আছে। এই বিশেষজ্ঞগণের মতে রোযা থাকা অবস্থায় রক্তবের করা ও রক্তদান করার অনুমতি আছে। এতে রোযা ভাঙ্গবে না বলেছেন শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী। এরপর আছেন একজন সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রা.), তারপর হযরত আয়েশা (রা.), তারপর আছেন ইমাম মালিক (রহ.), তারপর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। তাহলে এই দলেও অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। যারা বলেন যে রক্তদান করলে রোযা ভেঙ্গে যায় না।

এছাড়াও আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন এটা মাকরূহ, আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যেহেতু আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ তাই রোযা অবস্থায় রক্ত না দেয়াই ভালো। রক্ত দিলে দিন সূর্য ডুবার পরে।

এ ব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞগণের অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু অন্য জিনিস গুলোর কথা যদি বলেন যেমন ধরেন যদি সামান্য রক্ত বের হয়ে যায় শরীরের কোথাও কেঁটে গেলে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। অথবা যদি পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত দেন। শরীর থেকে যদি কয়েক মিলিলিটার রক্ত দেন পরীক্ষার জন্য তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না, অথবা কোথাও কেঁটে গিয়ে সামান্য রক্ত বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না অথবা যদি নাক দিয়ে রক্ত পড়ে এরকম হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে না অথবা ধরেন ছোটখাট অপারেশন যেখানে খুব সামান্য রক্তপাত হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। যদি অনেক বেশি রক্তপাত হয় ব্লাডসার্জারিতে যেটা অনেকখানি রক্ত দানের মত ব্যাপারে এমন হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তাহলে যদি এই ধরনের কিছু হয় যেমন টেস্টের জন্য রক্ত দিলেন, নাক দিয়ে রক্ত পড়ল বা সামান্য ক্ষত এক্ষেত্রে সবাই একমত সব বিশেষজ্ঞ বলেন এতে রোযা ভাঙ্গবে না।

রমযানের ৪র্থ শিক্ষা

রাত্রিকালীন নামাজ (কিয়াম আল লাইল)

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: কিয়াম আল লাইল শব্দের অর্থ কী? এবং তারাবী নামাজের সাথে এর পার্থক্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো এবং লাইল অর্থ- রাত সুতরাং কিয়াম আল লাইল এর অর্থ হলো রাত্রে নামাজে দাঁড়ানো। ইসলামী শরীয়তে কিয়াম আল লাইল বলতে এমন ঐচ্ছিক নামাজকে বোঝানো হয় যা ঈশার পর হতে ফজরের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময়ের মধ্যে পড়া হয়। ঈশার সময় শুরু হয় সন্ধ্যায় সূর্যের লালিমা কেটে যাওয়ার পর এবং কিয়াম আল লাইল পড়া যায় ঠিক ফজরের সময় শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। যেহেতু এই নামাজে অনেক লম্বা সূরা পাঠ করতে হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সে কারণে এটাকে কিয়াম আল লাইল বা 'রাত্রিকালীন দাঁড়ানো' বলা হয়েছে। এই কিয়াম আল লাইল বা রাত্রিকালীন দাঁড়ানোর আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন- সালাতুল লাইল, অর্থাৎ রাত্রিকালীন নামাজ। তাহাজ্জুদ, বিতর এবং তারাবীর নামাজ। রমযান মাসের রাত্রিকালীন আদায় করা নামাজকে তারাবীর নামাজ বলা হয়। তবে তারাবীহ শব্দটি এই ক্ষেত্রে যথাযথ নয়, কারণ মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সময়ে রসূল (ﷺ) এবং তার সাহাবীরা তারাবীহ শব্দটি ব্যবহার করেননি, এটা ছিলো কিয়াম আল লাইল। কিন্তু তারাবীহ শব্দটি পরে এসেছে।

প্রশ্ন: ইসলামে রাত্রিকালীন নামাজের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কতখানি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে একাধিক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- সাজদা, অধ্যায়- ৩২, আয়াত- ১৬)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থ: "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে, তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।" এবং

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থ: "তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেতো, রাত্রের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" (সূরা- আয যারিয়াত, অধ্যায়- ৫১, আয়াত- ১৭, ১৮)

তাছাড়া আরো আছে, (সূরা- ফুরকান, অধ্যায়- ২৫, আয়াত- ৬৪)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

'"এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে।"

হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং- ২৬১২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

অর্থ: "ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া আর যে নামাজ পড়া হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম নামাজ হলো রাত্রিকালীন নামাজ।"

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তাহাজ্জুদ, হাদীস নং - ১১৩১) "সর্বোত্তম নামাজ হলো দাউদ (আ.)- এর নামাজ এবং সর্বোত্তম রোযা হলো দাউদ (আ.)- এর রোযা। তিনি রাতের প্রথম অর্ধাংশ ঘুমাতের এবং বাকি রাতের তিন ভাগের একভাগ আল্লাহর ইবাদত এবং প্রার্থনা করে কাটাতেন এবং বাকি অংশ আবার ঘুমাতেন।"

হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তাহাজ্জুদ, হাদীস নং- ১১৪২)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিট দেয়। প্রতি গিটে সে এই বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত রয়েছে। তারপর সে যদি জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে তবে একটি গিট খুলে যায়। তারপর ওযু করলে আরো একটি গিট খুলে যায়। অতঃপর নামাজ আদায় করলে আর একটি গিট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।”

বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং - ১৬৫৬)

অর্থাৎ, “আল্লাহ রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং ওই সময় যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং যে ব্যক্তি পুণ্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, আল্লাহ তার সাথে অবিচার করেন না এবং এটা ফজরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।”

আরো বলা হয়েছে, (সুনান তিরমিযী, অধ্যায়- প্রার্থনা, হাদীস নং - ৩৫৭৯) “রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ এবং তার বান্দারা সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে এবং এই সময়টা হলো প্রার্থনা করার সর্বোত্তম সময়।” অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সুনান তিরমিযী, অধ্যায়- প্রার্থনা, হাদীস নং - ৩৪৯৯) “এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)- কে জিজ্ঞেস করলেন, ইবাদত বা প্রার্থনা করার সর্বোত্তম সময় কোনটি? তিনি বললেন, রাতের তিন প্রহরের শেষ প্রহর।”

হাদীসে আরো বলা হয়েছে, (সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং - ১৪১৭) “প্রাত্যহিক ৫ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা আর একটি নামাজ যোগ করে দিয়েছেন, সেটা হলো সালাতুল বিতর। যদি কেউ ৫ রাকাআত বা ৩ রাকাআত বা ১ রাকাআত পড়ে তবে যথেষ্ট হবে।” আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং - ১৩০৩) “যে ব্যক্তি গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়, যদি স্ত্রী ঘুম থেকে না জাগেও, তবে আল্লাহ তাদের ওপর রহম বর্ষণ করেন।” আরো বলা হয়েছে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং - ১৩০২) “আয়েশা (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) নিয়মিত কিয়াম আল লাইল আদায় করতেন এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও সুতরাং উক্ত আলোচনা হতে আমরা রাত্রিকালীন নামাজের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

প্রশ্ন: রমযান মাসে যেসব কিয়াম আল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাজ পড়া হয় সে ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শেস প্রশ্নের উত্তরে কিয়াম আল লাইলের যত তাৎপর্য রহমত এবং গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে, রমযান মাসে সেইগুলো দ্বিগুণতর হয়ে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং - ২০০৯) "যে ব্যক্তি রমযান মাসে বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর পুরস্কারের আশায় রাতে কিয়াম আল লাইল আদায় করে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।" আরেকটি হাদীসে আছে যে, (সহীহ ইবনে হিব্বান, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং- ৩৪৩৮) "এক লোক মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসে বললো, যদি আমি বলি যে, আল্লাহ এক তাঁর কোন শরীক নেই।........... এবং আমি গভীর রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, কিয়ামতের দিন তুমি সিদ্দিকিনদের সাথে ছায়ার নিচে অবস্থান করবে।"

সুতরাং রমযান মাসে কিয়াম আল লাইলের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি।

প্রশ্ন: কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে কিয়ামুল লাইলের নামাজ একাকী পড়তে হবে নাকি জামাআতে পড়তে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি কিয়ামুল লাইলের নামাজ একাকী বা জামাআতের সাথে পড়তে পারবে এবং উভয় নিয়মই প্রযোজ্য। তবে কোন নিয়মটি উত্তম? সহীহ বুখারীতে বলা আছে যে,

অর্থাৎ, কেউ যদি একাকী নামাজ না পড়ে জামাআতে নামাজ আদায় করে তবে সে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাবে।" এবং রমযান মাসের কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তারাবীই, হাদীস নং - ২০১২)

অর্থাৎ, "একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে লোকজন একাকী নামাজ আদায় করছে। সুতরাং তিনি কিয়ামুল লাইলের নামাযে দাঁড়ালেন এবং লোকজনও তার পিছনে যোগ দিল। পরের দিন এই খবর ছড়িয়ে ছিলো এবং রাতে মসজিদে মুসল্লিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং তৃতীয় রাতেও কিয়ামুল লাইল পড়ার সময় মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো। চতুর্থ রাতেও এরকম হলো কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) সে দিন আর নামাজ পড়ালেন না, কারণ তিনি মনে করলেন, আমার উম্মতরা এটাকে ফরজ মনে করে বসে কিনা!"

সুতরাং কিয়ামুল লাইল জামাআতে আদায় করা উত্তম। অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৩৭০) "একদিন রাত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) কিয়ামুল লাইলের নামাজ শেষ করলেন এবং যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন লোকজন বলতে লাগলো, আপনি আরো নামাজ পড়ছেন না কেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম নামাজ শেষ করা অবধি নামাজ আদায় করে সে যেন সারা রাত্রই নামাজ পড়ে সুতরাং কিয়ামুল লাইলের নামাজ জামাআতে পড়া উত্তম।

প্রশ্ন: কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিকালীন নামাজ আদায়ের আদবগুলো কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে কিছু হাদীসে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, (বাইহাকি, হাদীস নং ১৬৩) "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যখন তুমি গভীর রাতে জেগে ওগো তখন নামাজ পড়ার আগে মেসওয়াক করো এবং অযু করো।" সুতরাং মেসওয়াক করা সুন্নত। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তাহাজ্জুদ, হাদীস নং ১১৪৫) "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গভীর রাতে জাগ্রত হয় সে নিচের দু'আটি পড়তে পারে- লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলক ওলাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, আল হামদুলিল্লাহে সুবহানাল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অয়াল্লাহু আকবার, অয়াল্লাহু অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ এবং সে আরেকটি দু'আ পাঠ করতে পারে- আল্লাহুম্মা মাগফিরলি।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে, (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়- কিয়ামুল লাইল, হাদীস নং ১৬২১) "আয়েশা (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) যখন গভীর রাতে জাগ্রত হতেন তখন তিনি পাঠ করতেন- সুবহানা রাব্বিল আলামি এবং সুবাহানাল্লাহি অবি হামদিহি।"সুতরাং যে ব্যক্তি গভীর রাতে নামাজের জন্য জাগ্রত হয় তার উচিত উল্লিখিত আদবগুলো অনুসরণ করা। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৩২২) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) যখন কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন তখন তিনি এমনভাবে আয়াত পাঠ করতেন যে আমি ভিতরের কক্ষ হতে শুনেত পেতাম।" অর্থাৎ তিনি খুব বেশি জোরে বা খুব আস্তেও পাঠ করতেন না। অতএব, কিয়ামুল লাইল আদায় করার সময় উল্লিখিত নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন: রাতের কোন অংশে কিয়ামুল লাইলের নামাজ আদায় করা উত্তম?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (মুসনাদ আহমদ) "আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে আরো একটি নামাজ যোগ করেছেন তাহলো বিতরের নামাজ। সুতরাং ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে বিতর আদায় করো।" অর্থাৎ ইশা শুরু হয় সূর্যাস্তের পরে এবং ইশার পর হতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজ পড়া যাবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, সালাত, হাদীস নং ৪৬২৩) "যদি কেউ অনুমান করে যে সে গভীর রাতে জাগ্রত হতে পারবে না, তবে সে সন্ধ্যা রাতেই বিতর এবং কিয়ামুল লাইলের নামাজ আদায় করে নেবে। আর যদি সে নিশ্চিত হয় যে সে গভীর রাতে জাগ্রত হবে পারবে তবে তার উচিত গভীর রাতে উঠে নামাজ আদায় করা, কারণ গভীর রাতের ইবাদত অধিক উত্তম।" আরো বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৬৫৬ এবং সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তাহাজ্জুদ, হাদীস নং ১১৪৫) "আল্লাহ শেষ রাতে নিচের আসমানে অবস্থান করেন, ওই সময়ে যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং যে ব্যক্তি পুণ্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে আল্লাহ তার সাথে অবিচার করেন না এবং এমনটি ফজরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।"

অপর হাদীসে বলা হয়েছে, (তিরমিযী, অধ্যায়- প্রার্থনা, হাদীস নং ৩৫৭৯) "রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ ও তার বান্দারা সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় এবং ওই সময়টি প্রার্থনা করার সর্বোত্তম সময়।" সুতরাং রাতের শেষ ভাগে কিয়ামুল লাইল আদায় করা সর্বোত্তম। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তারাবী, হাদীস নং ২০১০) হযরত ওমর (রা.) বলেন, রমযান মাসে লোকজন ইশার নামাজের পরেই কিয়ামুল লাইল আদায় করে এবং সেটা ভালো, তবে আরো উত্তম হয় যদি সেটি রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে আদায় করা হয়।" অতএব শেষ রাত হলো উত্তম সময়, কিন্তু ইশার জামাআতের পর কিয়ামুল লাইল আদায় করা যেতে পারে, কারণ মসজিদে বৃদ্ধ, শিশু, যুবক, অসুস্থ ইত্যাদি সকলেই থাকে এবং জামাআতে পড়া হলে তারা সকলেই কিয়ামুল লাইলের নামাজে যোগ দিতে পারে এবং ইশার জামাআতের পর জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই তবে গভীর রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করা সর্বোত্তম।

প্রশ্ন: কিয়ামুল লাইল কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে, যেখানে বলা হয়েছে, যে মুহাম্মদ (ﷺ) দীর্ঘ সময় ধরে কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন। বলা হয়েছে যে, (মুসলিম, সালাত, ১৬৯৭)

"একদিন একজন সাহাবা মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সাথে কিয়ামুল লাইলের নামাজ আদায় করছিলেন, যখন মুহাম্মদ (ﷺ) ১০০ আয়াত শেষ করলেন তখন তিনি ভাবলেন যে এখন মুহাম্মদ (ﷺ) রুকুতে যাবেন কিন্তু তিনি তা না করে তারপরের সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা পাঠ করলেন এগুলো ছিলো এক রাকাআতের।"

আরেকটি হাদীসে আছে, (আবু দাউদ, সালাত, ৮৭৩) "সাহাবা বলেন, কিয়ামুল লাইল আদায়ের সময় মুহাম্মদ (ﷺ) সূরা ফাতেহার পর সূরা বাকার পাঠ করতেন এবং রুকুতে যেয়ে ততক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন আবার রুকূ হতে উঠেও ততক্ষণ থাকতেন এবং সিজদায় যেয়ে ততক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং সিজদাহর মাঝখানে বসে থাকতেন ততক্ষণ যতক্ষণ সিজদায় থাকতেন।"

সুতরাং এই হাদীস থেকে কিয়ামুল লাইলের দৈর্ঘ্য বোঝা যায় এবং দীর্ঘ নামাজ হলো সর্বোত্তম নামাজ।

প্রশ্ন: অনেকে বলেন যে, রমযানের রাতে জামাআতে কিয়ামুল লাইল নামজের প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রা.) এবং তারা বলে যে এটা বিদাআত। এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেকের মধ্যে এ রকম ভুল ধারণা আছে যে, ওমর (রা.) তাদের অন্যতম যিনি রমযান মাসে জামায়াতে কিয়ামুল লাইল নামাজের প্রচলন করেছেন। হাদীসে এসেছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তারাবী, হাদীস নং ২০১০) "এক রাতে মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে একাকী রমযান মাসের কিয়ামুল লাইল আদায় করছে এবং তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন, অতঃপর লোকেরা তার পেছনে যোগ দিলো, পরের দিন এবং সংবাদ প্রচার হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় রাতে মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তৃতীয় রাতেও মসজিদ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল, চতুর্থ রাতে মসজিদের বাইরে এবং ভিতরে লোকেরা অপেক্ষা করতে থাকলে তিনি আর সেদিন নামাজ পড়ালেন না, কারণ তিনি মনে করলেন আমার উম্মতরা এটাকে ফরজ মনে করে কিনা!" অতএব আমরা জানতে পারি যে মুহাম্মদ (ﷺ) এই জামাআতের সূচনা করেছেন এবং এটা মহানবীর (ﷺ) সুন্নাত। কিন্তু আবু বকর (রা.)- এর সময়ে খুব কম লোকই ছিলো যারা জামাআতে এই নামাজ আদায় করতো। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- তারাবী, হাদীস নং ২০১০) "কোনো এক সাহাবি বলেন, তিনি একদিন ওমর (রা.)- এর সাথে মসজিদে হাঁটছিলেন এবং দেখলেন যে, কিছু লোক একাকী কিয়ামুল লাইল আদায় করছে এবং কিছু লোক ছোট ছোট দলে নামাজ পড়ছে। তখন ওমর (রা.) সবাইকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং বললেন চলো আমরা

জামাআতে আদায় করি এবং তিনি উবাই বিন কাব (রা.)- কে ইমাম নিয়োগ করলেন এবং সকলে তার পিছনে নামাজ আদায় করলো। তারপর কিছুদিন পরে তিনি যখন রাত্রে মসজিদে এলেন তখন দেখলেন যে লোকজন জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করছে, তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, এই সময়ে নামাজ আদায় করার চেয়ে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ আদায় করা অধিক উত্তম।”

সুতরাং রাত্রের শেষ ভাগে কিয়ামুল লাইল আদায় করা উত্তম, তবে কেউ যদি আগে করে তবে কোনো সমস্যা নেই। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যারা ওমর (রা.)- কে বিদআতের অপবাদ দেয় তারা ভুল বলে, কারণ তিনি ধর্মে নতুন কিছু যোগ বা বিদআত আনয়ন করেন নি। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৮৮৫) “ধর্মে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বিদআত।” অন্যত্র বলা হয়েছে যে, সকল বিদআত জাহান্নামের আগুনে যাবে। বিদআত হলো ধর্মে নতুন কিছু যোগ করা কিন্তু ওমর (রা.) ধর্মে নতুন কিছু যোগ করেন নি বরং তিনি লোকদিগকে রাসূলের সুন্নাতের দিকে ধাবিত করার চেষ্ট করেছেন। সুতরাং জামাআতে তারাবি পড়ার মধ্যে কোনো বিদআত নেই।

প্রশ্ন: তারাবীর নামাজ আট রাকআত নাকি বিশ রাকআত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী সালাত, ৪৭২) এক ব্যক্তি নবী করীম (ﷺ)- এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, কিয়ামুল লাইল কীভাবে পড়বো? তিনি বললেন এটা দুই রাকআত করে পড়া উচিত। যেমন- দুই রাকাআত, তারপর দুই রাকআত, তারপর দুই রাকআত এভাবে এবং যদি সূর্য উদিত হওয়ার সময় হয়ে যায় তবে এক রাকআত।” এভাবে যতখুশি তত পড়া যাবে, তবে আমরা যদি মুহাম্মদ (ﷺ) এর অনুশীলনের দিকে তাকাই তাহলে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (বুখারী, তাহাজ্জুদ, ১১৪৭)

অর্থাৎ “আয়েশা (রাঃ)- কে রসূল (ﷺ)- এর রমযানের তারাবি নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) রমযান মাসে যখন কিয়ামুল লাইল বা তারাবির নামাজ আদায় করতেন তখন এগার (১১) রাকাআত আদায় করতেন এবং এর বেশি করতেন না। অন্য মাসে ৮ রাকআত কিয়ামুল লাইল এবং ৩ রাকাআত বিতরের নামাজ আদায় করতেন।”

অনেক হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, নবী করিম (ﷺ) এগার রাকাআত (৮+৩) কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন। তবে এ ব্যাপারে আমরা যদি সাহাযা, সালফে সালেহীন এবং তাবেয়ীনদের অনুশীলন দেখি তাহলে তারা ১১, ১৩, ১৯, ২৩, ৩৯ রাকাআত এ রকম

আদায় করতেন। আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, পৃ.- ১৬৫, ১৬৬) **"তাবেয়ীনরা রমযানের রাতে ২০ রাকাআত তারাবীহ্ আদায় করতেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তারা ৩৬ রাকাআত আদায় করতেন"** কিন্তু নবী করীম (ﷺ) ১১ রাকাআত আদায় করতেন। তবে তিনি ২+২+২+.......এভাবেও আদায় করতে বলেছেন। সুতরাং তারাবীর নামাজ যতখুশি তত আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য মসজিদে তারাবীর নামাজ পড়ার অনুমোদন আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৮৩৪)

"নারী বান্দাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রেখো না।"

আরেকটি হাদীসে আছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৮৬৫)

অর্থাৎ, "যদি নারীরা তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় এবং তখন যদি রাতও হয় তবুও তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দাও।"

ইশার নামাজ বা কিয়ামুল লাইলের জন্যও অনুমতি দিতে হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৩৭০) **"মুহাম্মদ (ﷺ) তার পরিবারের সকলের সাথে ইফতার করতেন এবং সকলে এক সাথে তারাবির নামাজ আদায় করতেন। এভাবে তারা প্রায় সাহ্রীর সময়ের কাছাকাছি চলে যেতেন।"**

সুতরাং নবী করীম (ﷺ) এক সাথে নামাজ আদায় করতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৮৮১) **"নামাজে পুরুষের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার। আর বালকদের জন্য উত্তম হলো শেষ কাতার। আর নারীদের জন্য সর্বোত্ত কাতার হলো শেষ কাতার এবং বালকদের জন্য তাদের সামনের কাতার।"** সুতরাং নারীরা নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে পারবে, যদিও সেটা হয় তারাবীর নামাজ। তবে তার জন্য কিছু শৃঙ্খলা রয়েছে কারণ মাঝে মাঝে নারীরা সাজসজ্জা করে থাকে এবং এটা পুরুষদের মনে কামনা তৈরি করে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- নূর, অধ্যায়- ২৪, আয়াত- ৩১)**"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌন অঙ্গের হেফাজত করে............তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য পদচারণা না করে।"** এবং

(সূরা- আহযাব, অধ্যায়- ৩৩, আয়াত- ৫৯)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

অর্থ: "হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"

অতএব মসজিদে আসতে হলে এমন সাজসজ্জা পরিধান করতে হবে যাতে কোনো ধরনের ফেতনা তৈরি না হয়।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৮৪৯)

অর্থাৎ, "জামাআতে নামাজ আদায়ের পর মুহাম্মদ (ﷺ) মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসতেন এবং তৎক্ষণাৎভাবে নারীরা উঠে চলে যেত।"

সুতরাং নারীরা জামাআতে নামাজ এবং তারাবীর নামাজও পড়তে পাবে।

প্রশ্ন: তারাবীর নামাজ সুন্নাত না ফরজ? কোনো লোক এই নামাজ এড়িয়ে যেতে পারবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে বলা হয়েছে যে, (বুখারী, তারাবী, ২০১২) একদিন রমযানের রাতে মুহাম্মাদ (ﷺ) মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, লোকেরা একাকী বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীর নামায আদায় করছে। অতঃপর তিনি নামাজে দাড়িয়ে গেলেন এবং লোকেরা তার পিছনে দাড়িয়ে গেল। পরের দিন এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঐ দিন রাতে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে তৃতীয় রাতেও মসজিদ ভরে গেল। চতুর্থ রাতে লোকজন মসজিদের ভিতর এবং বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলো। কিন্তু তিনি সেদিন নামাজ পড়ালেন না। তিনি ভাবলেন, এভাবে চলতে থাকলে তার উম্মতরা এই নামাজকে আবার ফরজ ভেবে নেয় কিনা!" কিন্তু আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (বুখারী, তারাবী, ২০০৯) "যে ব্যক্তি রমযান মাসে বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর পুরষ্কারের আশায় তারাবীর নামায বা কিয়ামুল লাইল আদায় করে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

সুতরাং যদিও এটা ফরজ নয় তবে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং যৌক্তিক কারণ ছাড়া তারাবীর নামাজ বাদ দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: কিছু ইমাম অনেক দ্রুত রুকূ, সিজদা করে থাকে যেটা নামাজ অনেক জটিল করে দেয়। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, এমনটা হরহামেশাই দেখা যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল পন্থা। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (বুখারী, সালাত, ৮৫৭)

"একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তাকে একটি লোক অনুসরণ করছিলো। সে নামাজ আদায় করে মুহাম্মদ (ﷺ) কে সালাম দিলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও এবং নামাজ পড়, কারণ তুমি নামাজ পড় নি। সে নামাজ পড়ে ফিরে এলে তাকে আবার নামাজ পড়তে বললেন এবং তিনবার লোকটিকে এভাবে নামাজ পড়তে বলা হলো। তারপর লোকটি বলল, আমি এর চেয়ে ভালোভাবে নামাজ পড়তে জানি না, হে রসূল (ﷺ) কীভাবে নামাজ পড়তে হয় তা আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম (ﷺ) বললেন, নামাজ পড় সেই ভাবে যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।"

সুতরাং দ্রুত নামাজ পড়া যাবে না, আস্তে আস্তে নামাজ পড়তে হবে। যদি মনে হয় যে ২০ রাকআত নামাজ পড়া সম্ভব নয়, তবে ৩ রাকআত পড়তে হবে, তবুও দ্রুত নামাজ পড়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: রমযান মাসের তারাবি নামাজে কুরআন খতম দেওয়া কি বাধ্যতামূলক? মুসল্লিদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত শোনা বাধ্যতামূলক কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, রমযান মাসের তারাবী নামাজে কুরআন খতম দিতে হবে। তবে খতম দেওয়া মুস্তাহাব, অধিক পছন্দনীয় এবং ইমামের কুরআন পঠন শ্রবণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মনোযোগ নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রশ্ন: মহিলারা যদি তাদের বাড়িতে জামাআতে নামাজ আদায় করে তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ আততারগীব, সালাত, ৩৩৬) **"নারীদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ হলো সেই মসজিদ যেখানে অনেকগুলো কক্ষ রয়েছে এবং সর্বোত্তম নামাজের জায়গা হলো সেই কক্ষগুলো"।**

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"একদিন এক নারী মুহাম্মদ (ﷺ)- কে বলল যে আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করা পছন্দ করি। তিনি বললেন, আমি জানি তুমি পছন্দ করো। কিন্তু নিজের কক্ষে নামাজ আদায় করা উত্তম হবে, বাড়ির কোনো জায়গায় নামাজ পড়ার চেয়ে। আবার আশপাশের বাড়িতে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম নিজের বাড়িতে নামাজ পড়া এবং আশপাশের বাড়িতে নামাজ পড়া উত্তম হলো মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে। আর নিজের এলাকার চেয়ে উত্তম হলো আমার মসজিদে নামাজ পড়া।"** (মুসনাদ আহমদ, ২৭২০২ এবং সহীহ আততারগীব, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ৩৩৫)

সুতরাং নারীদের কক্ষের ভিতরে নামাজ পড়াই উত্তম।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, আমার মসজিদে নামাজ আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় ১০০০ (এক হাজার) গুণ উত্তম (পুরুষের জন্য) এবং কক্ষ হলো নারীদের নামাজের জন্য সর্বোত্তম স্থান।"** (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- হজ্ব, হাদীস নং ৩২১০)

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, **"আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি মহিলাদের জামাআতে ইমামতি করতেন কিন্তু তিনি কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াতেন।"**
(বাইহাকি, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১৯২২)

আরো বলা আছে যে, **"উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, তিনি মহিলাদের জামাআতে ইমামতি করেছিলেন এবং তিনি প্রথম কাতারের কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন।"** (মুসন্নাফ ইবনে আবি শায়বা, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৫৯৫৩)

সুতরাং নারীরা জামাআতে নামাজ আদায় করতে পারবে, তবে কক্ষের ভিতরে আদায় করা উত্তম। তারা নারীদের জামাআতে ইমামতি করতে পারবে এবং মসজিদেও যেতে পারবে।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ইমামকে অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছে সে যদি ইমামের সামনে কুরআন ধরে রাখে যেখান থেকে ইমাম তিলাওয়াত করছে, তবে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, যখন মুকতাদি কুরআন মাজীদ নিয়ে ইমামের সামনে ধরে রাখবে তখন সে নামাজের মৌলিক রীতিগুলো অনুসরণ করতে

ব্যর্থ হবে। যেমন সে তার ডান হাত বাম হাতের ওপর স্থাপন করতে ব্যর্থ হবে। তাছাড়া সিজদাহ করার স্থানে সে দৃষ্টি স্থির করতে পারবে না। সুবিধামত রুকু, সিজদাহ করতে পারবে না, যেগুলো নামাজের মৌলিক বিষয়। সুতরাং এটা উপদেশযোগ্য নয় যে, সে ইমামের সামনে কুরআন ধরে রাখবে। বরং নামাজ পড়তে হবে অত্যন্ত ধৈর্য এবং মনোযাগের সাথে।

প্রশ্ন: যদি কেউ মসজিদে তারাবির নামাজ ইমামের পিছনে আদায় করে এবং সে যদি পরে অনেক তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে চায় তাহলে সে কি ইমামের পিছনে বিতরের নামাজ আদায় করবে নাকি ইমামের পিছনে আদায় করার পর আবারও দ্বিতীয়বার বিতর করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৩৭০)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ শেষ করলো সে যেন সারা রাত নামাজ পড়লো। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে,

(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৪৭২) এক ব্যক্তি নবী করীম (ﷺ)- কে জিজ্ঞাসা করলো কিয়ামুল লাইল কীভাবে পড়া উচিত? তিনি বললেন ২ রাকাআত, তারপর ২ রাকাআত অর্থাৎ ২+২+২+২..............এভাবে পড়তে থাকো, আর যদি দেখ যে সূর্য উদয় হওয়ার কাছাকাছি তখন এক রাকাআত পড়।"

সুতরাং এক্ষেত্রে দুইটি সুযোগ রয়েছে-

১. ওই ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ শেষ করবে এবং পরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করবে।
২. যদি ওই ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ শেষ না করে তবে পরে বিতরের নামাজ পড়ে নেবে।

সুতরাং বিতরের নামাজ দুইবার নয় বরং একবার পড়তে হবে।

প্রশ্ন: প্রতি রাকাআতে কুরআনের কতটুকু আদায় করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো রীতি নেই। হাদীসে বলা হয়েছে, (মুসতাদরাক আল হাকিম, প্রার্থনা, ১১৬০) "যে ব্যক্তি ১০০টি আয়াত পাঠ করে সে হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি অত্যন্ত অনুগত" আরো বলা হয়েছে যে, (মুসতাদরাক আল হাকিম, ১১৬১) "যে ব্যক্তি ১০০টি আয়াত পাঠ করে সে বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।" অন্যত্র বলা

হয়েছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৩৯৩) “যে ব্যক্তি কিয়ামুল লাইল নামাজে ১০টি আয়াত পাঠ করবে সে বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত পাঠ করবে সে একান্ত অনুগতদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ১০০০ (এক হাজার) টি আয়াত পাঠ করে সে অনেক অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে।”

সুতরাং যত বেশি পারা যায় ততই উত্তম।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ১৬৯৭) “একজন সাহাবা মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সাথে কিয়ামুল লাইলের নামাজে দাঁড়ালেন এবং তিনি মুহাম্মদ (ﷺ)- কে সূরা ফাতেহার পর সূরা বাকারা তারপর সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা পাঠ করতে শুনলেন এবং এগুলো ছিলো প্রথম রাকআতের জন্য।” (সংক্ষেপিত)। অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, (মুয়াত্তা, প্রার্থনা, ৪) “উবাই বিন কাব (রা.) যখন কিয়ামুল লাইলের নামাজ পড়াতেন তখন তিনি ১০০টি আয়াত পাঠ করতেন এবং মাঝে মাঝে ফজরের ওয়াক্তের কাছাকাছি চলে যেতেন।” একটি হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং ৯৪৩) “যখন তোমরা নামাজের ইমামতি করো তখন নামাজ অতি দীর্ঘ করো না; কারণ, সেখানে নারী, বৃদ্ধ শিশু এবং অসুস্থ, দুর্বল লোকজন থাকে। আর যদি একাকী নামাজ পড়, তবে যত খুশি দীর্ঘ করতে পারো।”

প্রশ্ন: বাড়িতে তারাবি নামাজ আদায় করা গ্রহণযোগ্য কি? যদি স্বামী, সন্তান এবং তার জামাআতে ইমামতি করে তবে সে কি যারা মসজিদে যায় তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: একাকী নামাজ আদায়ের চেয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম এবং মসজিদে নামাজ আদায় ঘরে আদায়ের চেয়ে উত্তম। আর পুরুষের জন্য উত্তম হলো মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা। নারীর ক্ষেত্রে, মসজিদের চেয়ে তার নিজের কক্ষ উত্তম (হাদীস অনুযায়ী)। সুতরাং নারীরা ঘরে নামাজ পড়লে ভালো হয়। তারা যদি ঘরে জামাআত করে তবে ভালো কিন্তু পুরুষদের মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ পড়া উচিত।

রমযানের ৫ম শিক্ষা

রোযাদারের দ্বারা কৃত সাধারণ ত্রুটিসমূহ

ইউসুফ চেম্বার: মুসলমান এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সালাম জানাচ্ছি। সকলের উপর আল্লাহর দয়া, আশীর্বাদ এবং শান্তি বর্ষিত হোক। পবিত্র রমযান নিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে আলোচনায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আজ আমরা পবিত্র রমযান মাসে মুসলমানরা যে সমস্ত সাধারণ ভুল করে থাকে সেসব নিয়ে আলোচনা করব।

অতএব চলুন ডা. নায়েকের কাছে এ ব্যাপারে প্রথম প্রশ্নটি করা যাক।

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে নিয়মিতভাবে মুসলমানরা একই ধরনের ভুলের ভেতর পতিত হওয়ার কারণসমূহ কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র রমযান মাসে রমযানের নিয়মকানুন সম্পর্কে একই ধরনের ভুল করার প্রধান কারণ হলো- আল্লাহ তায়ালা ও তার দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং সবচেয়ে বড় কারণ হলো যারা ভুলে পতিত হচ্ছে তারা আল্লাহর পবিত্র বাণীগুলো পড়ে না। তারা কুরআন বুঝে পড়ে না। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাদীসগুলো পড়ে না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুরআন এবং হাদীসগুলো বুঝে পড়া উচিৎ। তাহলে আমরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানসমূহ লাভ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে রোযার নিয়ম-কানুনসমূহ জানতে পারবো। আল্লাহ মুসলিম জাতির জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক কিন্তু সেখানে কিছু মানদণ্ড রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, (সূরা আনকাবুত, আয়াত- ৬৯)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করছে সে আসলে আল্লাহর পথে জেহাদ করছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর ওহী সব জেহাদকারীদের জন্য পথপ্রদর্শন করে। এই মানদণ্ডটি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তাহলে সঠিক পথ পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা (সূরা নাহল, আয়াত- ৪৩) বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা করো।

এখানে বলা হয়েছে- "যদি তোমরা অনুধাবন করতে না পারো অথবা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে তার কাছে জিজ্ঞাসা করো।" যদি তুমি সন্দেহ করো তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করো, যে ওই ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন একটা জাতি যেখানে অগণিত ব্যক্তি আছেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং যারা দ্বীন এবং এর নিয়ম- কানুনের ব্যাপারে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ তাদের কাছে জেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য পালনীয় দায়িত্ব। আজকের আলোচ্য বিষয় রোযা, যেটি ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রোযার সময় সম্পর্কে জানা উচিৎ। আরো জানা উচিতৎ রোযার নিয়ম- কানুনসমূহ এবং আজকের এই বিজ্ঞানের জয়জয়কারের দিনে এটি জানা কোনো সমস্যাই নয়। না জানাটা তাদের জন্য তাদের অমনোযোগিতাই দায়ী। সামান্য চেষ্টা করলেই তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে। কখন রোযা রাখার সময়, কখন রোযা শুরু করতে হয়, কখন ফজরের সময় আরম্ভ হয়, কোন সময়ে রোযা ভাঙ্গার জন্য ইফতার করতে হবে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো জানা খুবই সহজ। মূলত এই ব্যাপারগুলো না জানা মুসলমানদের অমনোযোগ এবং অসাবধানতার ফল যেটি আমাদেরকে নিয়মিতভাবে একই ধরনের ক্রটিতে পতিত করছে।

প্রশ্ন: পবিত্র রমযান মাসে মুসলমানরা আরো কী কী সাধারণ ক্রটি করে থাকে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাসে মুসলমানদের দ্বারা যেসব ক্রটিগুলো ঘটে সেগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীর ক্রটি যেটি ঘটে থাকে সেটি মুসলমানরা রোযার নিয়ম- কানুন সম্পর্কে ঘটিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রটি হলো, রমযান মাসে মুসলমানদের দ্বারা কৃত সুন্নাত পরিপন্থী কাজ- কর্মসমূহ।

তৃতীয় শ্রেণী প্রধানত এই রকম ক্রটি, তাহলো মুসলমানরা ইসলামের আদেশ এবং নিষেধগুলো অবহেলা করে।

চতুর্থ শ্রেণীতে মুসলমানরা আর অন্যান্য যেসব ভুলক্রটি করে সেগুলো পড়ে।

প্রশ্ন: আপনি কি রমযান মাসে কৃত সাধারণ ক্রটিসমূহের একটি তালিকা দিতে পারবেন; শ্রেণী ১ এবং ২ এর আলোকে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রথম শ্রেণীতে কৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি হলো রোযার বাধ্যবাধকতা এবং নিয়ম- কানুন সম্পর্কে, সেটি হলো- অনেক সময় রোযাদার রোযা রাখার জন্য নিয়ত করে না। নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ত ছাড়া রোযা গ্রহণযোগ্য হয় না। নিয়ত করা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় ক্রটি হলো, অনেক সময় মুসলমানরা ফজরের আজান শুরু হলে এমনকি আজানের পরেও খেতে থাকে যদিও তারা ফজরের আজানের আগে সময় পেয়েছিলো। তারা মনে করে আজান শেষ হলে পরে সাহরির সময় শেষ হয়ে যায় কিন্তু আসলে যে মুহূর্তে ফজরের আজান আরম্ভ হয় ঠিক তখনই সাহরির সময় শেষ হয়ে যায়। এটা এমনই একটি ক্রটি যা খুব সহজভাবেই রোযাদারের রোযাকে অকার্যকর করে দেয়।

তৃতীয় ক্রটি হলো, অনেক লোক ফিতরা শোধ করতে অযথা কালক্ষেপণ করে। অনকে সময় তারা এটি ঈদুল ফিতর নামাজের পরে প্রদান করে। যদি কেউ ফিতরা ঈদুল ফিতরের পরে প্রদান করে তাহলে এটি সাধারণ দানে পরিণত হয়। এটি তখন ফিতরার আওতায় বিবেচনা করা যায় না। এই তিনটি হলো প্রথম শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে ভুলসমূহ তা হলো- সুন্নাতের পরিপন্থী কাজকর্ম।

প্রথমত, কিছু লোক আছে যারা সেহরি করে না। দ্বিতীয়ত, কিছু লোক আছে যারা সাহরির যথাযথ সময়ের অনেক পূর্বেই সাহরি গ্রহণ করে। তারা ফজরের আজানের এক / দুই ঘণ্টা আগেই সাহরি গ্রহণ করে। সাহরি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এবং প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ সাহরি খাওয়া এবং মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, **যতটা সম্ভব দেরি করে আমাদের সাহরি খাওয়া উচিৎ। এটি অবশ্যই ফজরের আজানের পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে।**

তৃতীয় ক্রটি হলো, কিছু রোযাদার আছে যারা রোযা ভাঙ্গতে অর্থাৎ ইফতার করতে কালক্ষেপণ করে। অবহেলা করে যদিও সময় আসন্ন, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন,

অর্থাৎ "ওই ব্যক্তি উত্তম যে যথাসময়ে ইফতার করে।"
সুতরাং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার শুরু করা উচিৎ।

চতুর্থ ত্রুটি হলো, অনেক মুসলমান যারা ইফতারের সময় অশুদ্ধ দু'আ পাঠ করে। সবচেয়ে শুদ্ধ দু'আ যেটি ইফতারের সময় পড়া উচিৎ তাহলো- "যাহাবা জামাআ ওয়া ইয়াবতাল্লালাতি রুকু ওয়াসাবাতিল আরয ইনশাআল্লাহ। কিছু লোক আছে যারা ইফতারের জন্য দু'আ পড়ে কিন্তু ইফতারের আগেই পড়ে ফেলে যেটা এর অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক। উল্লিখিত দু'আর অর্থ হলো- আমার পিপাসা নিবারিত হয়েছে। আমার ক্ষুধা নিবারিত হয়েছে। কিন্তু ইফতার করার আগে কি তৃষ্ণা নিবারণ হতে পারে? তাই সহজভাবে এ দু'আ পড়া উচিৎ, খেজুর খাওয়ার পরে, পানি পান করার পরে, সন্তুষ্টি অর্জনের পরে সর্বসাকুল্যে ইফতার শেষ করার পরে অথবা শুরু করার কয়েক মিনিট পরে।

পঞ্চম ত্রুটি হলো, অনেক মুসলমান আছে যারা ইফতারের সময় অতিরিক্ত খাদ্য খায়।

ষষ্ঠ ত্রুটি, রাতের খাবার হিসাবেও বিবেচনা করে।

সপ্তম ত্রুটি, অনেক রোযাদার তারাবি নামাজ অবহেলা করে। কারণ এটি ফরজ নয়, তাই তারা মনে করে তারাবি নামাজ না পড়াটা কোন সমস্যাই নয়। যদিও তারাবি ফরজ নামাজ নয় কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত ইবাদত এবং যে মুসলামান তারাবি হারালো সে অবশ্যই অনেক বড় ধররেন পুরস্কার হতে বঞ্চিত হয়।

অষ্টম ত্রুটি, অনেক মুসলমান আছে যারা তারাবির নামাজ খুব দ্রুত পড়ে। তারা অল্প সময়ের ভিতরে শেষ করে, আসলে তারা তারাবির আসল উদ্দেশ্যটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। যদি সে বা তারা মধ্যম পন্থায় তারাবি পড়ে বা পড়ায় তাহলে জনগণ অনুধাবন করতে পারে এবং আল্লাহর বার্তাসমূহকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার প্রয়াস পায়।

নবম ত্রুটি, মসজিদে ই'তেকাফ করার জন্য যাওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি। অনেক মুসলিম আছেন যারা মসজিদে এতেকাফ বসে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। যদিও এই সময়ে লোকজন, বন্ধু- বান্ধব ইত্যাদির সাথে মেলামেশা কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে সুন্নাতের পরিপন্থী।

দশম ত্রুটি, অনেক মুসলমান ধরে নেয় যে, রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত্রে পবিত্র লায়লাতুল কদর, যদিও মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **"তোমরা রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রগুলোতে পবিত্র লাইলাতুল কদর তালাশ করো।"**

এখানে শেষ দশ দিনের বিজোড় তারিখের রাত্রসমূহের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ তারিখের যেকোনো এক রাতে পবিত্র লাইলাতুল কদর নির্ধারিত হয়ে থাকতে পারে।

একাদশ ত্রুটি, অনেকেই যদিও রোযা রাখে কিন্তু আল্লাহর ইবাদত এবং তাকে স্মরণ না করে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল কাজে সময় ব্যয় করে। কিন্তু তাদের উচিৎ ফরজ নামাজের সাথে সাথে নফল এবং সুন্নাত নামাজগুলো আদায় করা।

দ্বাদশ ত্রুটি, অনেকে আছেন যারা দু'আ করেন না বা চান না। কিন্তু সকলের উচিৎ আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া। কারণ এটি বিশেষ দয়া, রহমতের মাস। এবং যতটা সম্ভব বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

ত্রয়োদশ ত্রুটি, অনেকে আছেন যারা রোযা রাখেন, ক্ষুধার্ত থাকেন কিন্তু তারা মনে-প্রাণে, মানসিকভাবে রোযার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে না। এটি তাদের রোযাকে এক ধরনের না খেয়ে থাকাতে পরিণত করে। কিন্তু রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর অনুগ্রহ আদায় করে নেওয়া।

এগুলো হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত সাধারণ ত্রুটিসমূহ।

প্রশ্ন: তৃতীয় শ্রেণীর ভুলত্রুটি সম্পর্কে আপনি সংক্ষেপে আমাদেরকে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ত্রুটিসমূহ হলো ইসলামের অবশ্যই পালনীয় বা ফরজ কাজের পালনে অবহেলা কেন্দ্রিক ত্রুটি। অনেক মুসলমান আছেন যারা রাত গভীর হওয়ার আগেই সাহরি খেয়ে ফেলে এবং এই লোকগুলো ফজরের নামাজ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ফজরের নামাজ পড়তে না পারাটা তাদের জন্য একটা সাধারণ ব্যাপার। আবার অনেকে আছেন যারা সারা রাত জেগে থাকেন আর সারা দিন ঘুমান এবং এই ধরনের লোকেরা জোহর, আছর নামাজ মিস করে, কারণ তারা দিনে ঘুমিয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত বড় ধরনের বোকামি, কারণ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করছে অথচ ইসলামের ফরজগুলো পালনে অবহেলা করছে যেটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আবার অনেক মুসলিম আছেন যারা যাকাত দেয় না। যদিও তাদের জন্য যকাত ফরজ কিংবা তারা যাকাত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়েছে, যাকাত হলো ইসলামের একটি স্তম্ভ যেখানে যেসব মুসলমানরা নিসাবের মালিক তাদেরকে যাকাত দেওয়া ফরজ করা হয়েছে। যে ব্যক্তির কাছে ৪৫ গ্রাম সোনা বা সমপরিমাণ অর্থ সঞ্চিত আছে তার জন্য ওই সঞ্চয়ের ২.৫% যাকাত দেওয়া ফরজ।

এই শ্রেণীর আরেকটি ত্রুটি হলো, বেশির ভাগ মুসলমান যাকাতের সঠিক হিসাব নিকাশ না করেই যাকাত প্রদান করে। রমযান মাস এমন একটি পবিত্র মাস যখন সব ধরনের সন্দেহযুক্ত কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। তাই আমাদের উচিৎ আরো বেশি সতর্ক থাকা।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ত্রুটি হলো, অধিকাংশ মুসলমান রমযান মাসেও পরনিন্দা এবং কটু কথাতে লিপ্ত থাকে। পরনিন্দা একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা হুজরাত, আয়াত ১২ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে করো।"

অতএব, পরনিন্দা এবং কুৎসারটনা করা মহা অপরাধ।

দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, অনেক মুসলমান আছেন যারা রমযান মাসেও মিথ্যা কথা বলে থাকে।

তৃতীয়ত, অনেকেই আছেন যারা বাজে এবং কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে যেটি ইসলাম এবং রোযার সাথে সাংঘর্ষিক।

চতুর্থ, অনেকেই বিভিন্ন শব্দের অপব্যাখ্যা করেন।

পঞ্চম, কিছু লোক বিভিন্ন ধরনের গল্প গুজব, আড্ডাবাজিতে অংশগ্রহণ করে।

ষষ্ঠ, অনেকেই অসত্য ভিত্তিহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

সপ্তম, অনেক মুসলমান বিভিন্ন ধরনের গান এবং অনৈসলামিক গান শুনে রমযান মাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো হত্যা করে।

অষ্টম, অনেকেই বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র, মুভি এবং অনৈসলামিক মুভি দেখে সময় নষ্ট করে।

নবম, কিছু রোযাদার অনৈসলামিক পত্রিকা, বই, ছবি ইত্যাদি পড়ে এবং দেখে যেটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

দশম, অনেক মুসলমান রমযান মাসে বিভিন্ন অনৈসলামিক ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে; যেটিও নিষিদ্ধ।

একাদশ, তাদের অনেকেই বেশি ব্যয় এবং বেশি ভোগ করে।

দ্বাদশ, অনেক ধনী ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে খাদ্য অপচয় করে।

এইগুলো হলো তৃতীয় আওতাভুক্ত কৃত ত্রুটি যেগুলো মুসলমানরা রমযান মাসে করে থাকে। এই ত্রুটিগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রমযান মাসে কৃত চতুর্থ শ্রেণীর অন্যায় ত্রুটিগুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: চতুর্থ শ্রেণীতে যে সব ত্রুটিগুলো পড়ে সেগুলো হলো-

অনেক রোযাদার আছেন যারা সারারাত না ঘুমিয়ে থাকেন এবং দিনে ঘুমান এবং রাতে বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজকর্ম করে থাকেন। অর্থাৎ রাতে না ঘুমিয়ে সারাদি ঘুমিয়ে কাটায়। তারা রাতটাকে দিন এবং দিনটাকে রাতের মত ব্যবহার করে যেটি রোযার আসল উদ্দেশ্যটাকেই ব্যাহত করে।

* অনেকেই দিনের বেলায় অলসতা এবং কোন কাজ না করেই কাটিয়ে দেয় যেটি রোযার আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।

* অনেক রোযাদার দিনের বেলায় বিভিন্ন ধরনের টুর্নামেন্ট কিংবা ঘরোয়া খেলা খেলে রমযানের মূল্যবান সময়গুলোকে হত্যা করে। যেটি রোযার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

* অনেকেই অনেক ঝাকাল এবং জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার পার্টির আয়োজন করে যেখানে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়। অনেক সময় তারা এটা লোককে দেখানোর জন্য কিংবা প্রদর্শনীর জন্য করে থাকে।

* অনেকেই আছেন যারা তাদের স্ত্রীকে পরিবারের জন্য বিভিন্ন আইটেমের ইফতার তৈরি করার জন্য বলেন যেটি মহিলাদেরকে অধিকাংশ সময় রান্নাঘরে থাকতে বাধ্য করে। অথচ রমযান মাসে পরিবারের সকলেরই উচিৎ অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করা।

* অনেকেই আছেন যারা বাড়িতে না থেকে বিভিন্ন বিপণীতে সময় কটান, আল্লাহকে স্মরণ না করে বিভিন্ন কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকেন।

* অনেকেই আবার রাতে আল্লাহকে স্মরণ না করে বিভিন্ন সারবস্তুহীন কাজ করে সময় অতিবাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনেকেই তারাবীর পরে বিভিন্ন গল্পগুজব, সামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন এবং এটিও এক প্রকারের ত্রুটি।

* তাদের অনেকেই রাতের বেশির ভাগ সময় নিজের দোকানে বিক্রয় করার জন্য সময় কাটায়।

* অনেকেই আছে যারা রাতের অধিকাংশ সময় চুরি কিংবা ওই ধরনের ফিকির ফন্দিতে সময় কাটায়!

* আবার অনেকেই রাতের বেলায় ডাকাতি কিংবা ছিনতাই করে সময় অতিবাহিত করে।

* রমযানের শেষ দিনে মুসলমানদের উচিৎ বেশি বেশি করে আল্লাহর ইবাদত করা কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান এই সময়টাতে কেনাকাটা, উৎসব এবং নিজেদেরকে ঈদ উদযাপরেন জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকে। এবং তারা ইবাদত না করে বিভিন্ন ধরনের বাজে কাজ করে থাকে।

এই হলো চতুর্থ শ্রেণীতে কৃত ত্রুটিসমূহ। আশা করি ভবিষ্যতে এখনকার দুরাবস্তাগুলো দূর হবে ইনশা- আল্লাহ।

প্রশ্ন: আপনি কী এমন কোনো ভুলত্রুটি দেখতে পান যেগুলো বিশেষ করে বিভিন্ন দেশ এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: পূর্বে যে সমস্ত ত্রুটিগুলোর কথা আলোচনা করলাম সেগুলো মূলত সারা বিশ্বের ইসলামি চিন্তাবিদদের চিন্তা এবং গবেষণার ফসল। কিন্তু আমরা আরো কিছু কিছু ত্রুটি দেখতে পাই যেটি মূলত বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা শ্রীলংকাতে বসবাস করে, রমযান মাসে দেখা যায় এইসব দেশের অনেক মুসলিম খেলোয়ার রাত্রিকালীন ক্রিকেট খেলে এবং তারা রাতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল না থেকে রাত্রিকালীন ক্রিকেটে খেলায় মশগুল থাকে। সুতরাং আমাদের উপমহাদেশে এই ক্রিকেট খেলাটি খুবই লক্ষণীয়। যদি আমরা আরব কিংবা উপসাগরীয় দেশসমূহতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারো যে তারা তাদের অফিস, কর্মস্থল, মার্কেট ইত্যাদির সময় পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা দিনের বেলায় কদাচিৎ কাজ করে কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময় তারা দোকান, বিপণী ইত্যাদি খুলে রাখে। এর ফলে যেটা ঘটে সেটি হলো, এটি মানুষকে দিনের বেলার পরিবর্তে রাতে কেনাকাটা করতে উৎসাহিত করে। এতে করে বিপণী মালিকরা বেশি হারে লাভবান হয় এবং তারা আসলে আল্লাহকে স্মরণ করার পরিবর্তে মানুষকে রাতের বেলায় কেনাকাটার জন্য আহবান করে। এই সময় অনেক মুসলমান খাওয়া- দাওয়া কেনাকাটা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে।

অন্যদিকে আবার যারা ওই সব বিপণী বিতানের কর্মচারি তারা রাতের বেলায় দোকানে আসতে বাধ্য হয় কারণ এটা তাদের ডিউটি। সুতরাং ওই সব দোকানের মালিকরাও কিছু মুসলমানকে আল্লাহ স্মরণ থেকে বিরত রাখছে। তারা অধিকাংশ সময় নিজেদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে ব্যস্ত রাখছে যেটি রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্ছে না।

প্রশ্ন: ডা. জাকির আপনি আমাদেরকে এমন কোনো সুন্নাতের কথা বলতে পারেন যেটি মুসলমানরা এই ভেবে এড়িয়ে যাচ্ছে যে, এটি পালন করলে তাদের রোযা বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ। এই রকম কিছু সুন্নাহ আছে যেগুলোকে কিছু মুসলমান এই ভেবে এড়িয়ে যায় যে, এটি তাদের রোযাকে বাতিল কিংবা মাকরূহ করে দেবে এবং এই সুন্নাতগুলোর ভিতরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ যেটি মানুষ রমযান মাসে ত্যাগ করে সেটি হলো মিসওয়াক করা। অনেক মুসলিম মনে করে যে, এটি ব্যবহার করা মাকরূহ। এর কারণ হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) একটি হাদীসে বলেছেন, **(সহীহ বুখারী, খণ্ড - ৩, হাদীস নং ১৯০৪)**

অর্থাৎ, "রোযাদারের নিশ্বাসের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর চেয়েও উত্তম।"

এই কারণে অনেক মুসলিম মনে করে যে, যদি তারা মিসওয়াক করে তাহলে তাদের মুখ হতে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুগ্রহ, ছওয়াব পাবে না তাই তারা মিসওয়াক ব্যবহার এড়িয়ে যায়। এই লোকগুলো এটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, মিসওয়াক রোযাদারের নিশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করতে সক্ষম হয় না। মিসওয়াক কিংবা ব্রাশ মানুষের দাঁত পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখে কিন্তু এটি নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ বিশেষ করে

রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পারে না। মিসওয়াক সম্পর্কে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (সহীহ বুখারী, খণ্ড - ২, হাদীস নং ৮৮৭)

অর্থাৎ, "আমার উম্মতদের যদি কষ্ট না হতো তাহলে আমি তাদের জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজের পূর্বে অজু করার সাথে সাথে মিসওয়াক করাটাও ফরজ করে দিতাম।"

এটি প্রমাণ করে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতটি চালিয়ে যেতে হবে যদিও রমযান মাস আসে অর্থাৎ রমযান মাসেও চালাতে হবে। এটি মাকরূহ নয় বরং মুস্তাহাব অর্থাৎ উৎসামূলক। এই রকম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত যেটি মুসলমানরা অবহেলা করে সেটি হলো, তারা এই ভেবে নাসারন্ধ্রে পানি প্রবেশ করায় না যে, এটি তাদের গলার ভিতরে ঢুকে তাদের রোযা বাতিল করে দেবে। বিশেষ করে এরকমটা মনে করে থাকে অযু করার সময়। তাই অনেক রোযাদার আছেন যারা যদিও অযু করেন কিন্তু নাসারন্ধ্রে পানি ঢুকায় না বরং পানিটুকু নাকের কাছাকাছি নিয়ে শুধু নাকের ডগা স্পর্শ করায় এবং এটি এটাই প্রকাশ করে যে, তারা নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করায় না অথচ নাক পরিষ্কার করে। কিন্তু নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করান অযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি বড় ধরনের শর্ত এবং এটি এই মনে করে করা হয় যে, নাক দিয়ে পানি ঢুকালে সেটি গলার ভিতরে ঢুকে যাবে এবং রোযা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু কেন এই রকম চিন্তা, কেন এমন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা?

এ ব্যাপারে আমাদের নবী (ﷺ) কি বলেছেন? মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড - ২, হাদীস নং ২৩৬০)

অর্থাৎ, "তোমরা রমযান মাস ব্যতীত ওযু করার সময় অধিকহারে নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করাও যাতে করে পবিত্র হতে পারো।"

কেননা যদি রমযান মাসে অতিরিক্ত আকারে পানি প্রবেশ করান হয় তাহলে গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করার একটি সম্ভাবনা থেকে যায় তবে এরকম সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু আমরা যদি সাধারণভাবে নাকের ভিতরে পানি ঢুকাই তাহলে এটি গলার ভিতরে প্রবেশ করার কোন সম্ভাবনা নেই। এটা বলা হয়েছে যে, রমযান মাস ব্যতীত তোমরা নাকের ভিতরে অধিকহারে পানি প্রবেশ করাও। সুতরাং রমযান মাসে আমরা সাধারণ হারে নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতটি পালন করতে পারি। অতএব এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত যেটি মানুষ পবিত্র রমযান মাসে এড়িয়ে যায় বা ত্যাগ করে।

প্রশ্ন: এটি খুব সাধারণ এবং সকলের মনে উদয় হওয়া একটি প্রশ্ন তাহলো, রমযান মাসে যদি সব শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে তাহলে রমযান মাসে মানুষ নিয়মিতভাবে পাপ করতে থাকে কীভাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, আমি এই সাধারণ প্রশ্নের সাথে একমত এবং এখন আমার বিভিন্ন আয়াত, হাদীস ইত্যাদির কথা মনে হচ্ছে যেখানে উল্লেখ আছে যে, রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, শুধু আমাদেরই নয়, বিভিন্ন মুসলিম এবং অমুসলিমদের ভেতরেও এই প্রশ্ন ওঠে যে যদি শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় তাহলে মানবজাতি এরকম পাপ কাজ চালিয়ে যেতে পারে কীভাবে? এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় মূলত মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাদীসদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন,

"হে মানবজাতি তোমাদের মাঝে পবিত্র রমযান মাস সমাগত এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এই মাসে রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন আর এই মাসে বেহেশেতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া হয় আর এই মাসেই আছে কদরের রাত যেটি হাজার মাস থেকে উত্তম এবং যে ব্যক্তি এই মাসের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হলো সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই বঞ্চিত, দুর্ভাগা।" (মুসনাদ- ই আহমদ, পৃষ্ঠা- ২৩০, হাদীস নং ৭১৪৮ এবং সুনানে নাসাঈ, অধ্যায়- ৫, রোযা- ৫, রোযা, হাদীন নং ২১০৬)

তিনি এই হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র রমযান মাসে শয়তানকে আল্লাহ তায়ালা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেন। সুতরাং খুব সহজভাবেই এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার পরেও মানবজাতি পাপ কাজে লিপ্ত থাকে কীভাবে। এখন এই লোকগুলোকে বোঝাতে আমাদেরকে এটি অনুধাবন করতে হবে যে, শয়তান যদিও শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শয়তান একেবারে শেষ বা মরে গেছে বরং শয়তান জীবিত তারা মরে যায় না। তাদের ক্ষমতা রোধ হয়ে যায়। ব্যাপারটি ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাঘের কথাই ধরুন। যে বাঘটি মুক্ত তার পক্ষে মানুষ হত্যা করার সম্ভাবনা খুবই বেশি এমনকি বাঘে পেলে হত্যা করে বৈকি! আপনার জীবন তখন বিপদাপন্ন কিন্তু যখন ওই বাঘটি খাঁচাবন্দি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে তখন কিন্তু আপনি ওই বাঘ হতে নিরাপদ। তবে আপনার ওই নিরাপত্তা নির্ভর করে যতটুকু দূরত্ব আপনি বাঘের সাথে রেখেছেন তার ওপর। বাঘকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার পরেও আপনি যদি ওই বাঘের খুব কাছাকাছি চলে যান তাহলে আপনাকে হত্যা করার একটা সুযোগ কিন্তু ওই বাঘের জন্য থেকে যায়।

সুতরাং যতটা সম্ভব, ওই বাঘের কাছ থেকে বেশি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তাহলেই আপনি নিরাপদ থাকবেন। একইভাবে আপনি যদি রমযান মাসে শয়তান হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন তাহলে আপনিও নিরাপদ থাকতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থ: হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহর করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৬৮)

এখানে বলা হয়েছে- "শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তার কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক হও" কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এই শয়তানের পদাঙ্ক হতে বাঁচার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ এই কথা বলেন নি যে তোমরা শুধু শয়তানের কাছ থেকে সতর্ক হও, কারণ অনেক সাধারণ এবং ঈমানদার মুসলমান আছেন যারা তাদের সামনেই শয়তানকে দেখতে পান এবং এতে করে তারা নিজেরাই সতর্ক হতে পারে বা সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি যুবতী মেয়ে একজন ঈমানদার যুবকের কাছে এসে বলল, চলো আজ আমরা দু'জনে একসাথে রাত কাটাই। তখন ওই যুবক বলবে, দু'জনে একসাথে রাত কাটাব! একটা মেয়ের সাথে রাত কাটাব! এটা হারাম, এটা যিনা, ব্যভিচার। সে তাৎক্ষণিকভাবে এটার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু ওই একই যুবতী যদি ওই যুবকের সাথে ফোনে কথা বলে তাহলে এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়, পরবর্তীতে মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, চলো আমরা স্ন্যাকস, ম্যাকডোনাল্ড, ফ্রাইড চিকেন ইত্যাদি খাই।

এটার জন্য তাদের আধা ঘণ্টা ব্যয় হলো এবং এটিও তেমন কোন ব্যাপার নয়। এরপর মেয়েটি বলল আচ্ছা আমরা রাতের খাবার কেন খাচ্ছি না, চলো রেস্টুরেন্টে যাই। তারা গেল কিন্তু এটাও তেমন কোন সমস্যা নয়। এরপর মেয়েটি বলল, তাহলে রাতটা তুমি আমার সাথে কাটাচ্ছো না কেন? তখন ছেলেটি বলল, একটি মেয়ের সাথে রাত কাটাব চমৎকার, কোন সমস্যা নয়। আর এটাই হলো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ। আর শয়তানের এই পদাঙ্ক অনুসরণ একজন মুমিন বান্দাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে সতর্ক হতে বলেছেন। যদি শয়তান সরাসরিভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয় তাহলে ওই মুমিন ব্যক্তি তাকে ভয় করে এবং তার থেকে বাঁচতে পারে। শয়তানের পদাঙ্ক হলো এমন একটি জিনিস যেটি খুবই বিপদজনক।

সুতরাং আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, যখন শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে তখন পদচারণাও বন্ধ থাকে। যে কারণে অনেক পাপ কাজও বিরত থাকে। এখন যদি কেউ আগ বাড়িয়ে শয়তানের

কাছে যায় তাহলে শয়তানের কাছে তার মাথানত এবং বিভিন্ন পাপ কাজ করার বা পাপে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা চরমে পৌছে। তাই পবিত্র রমযান মাসে আমরা যতই শয়তানের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবো ততই আমাদের পাপ কাজে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। আপনি যদি শৃংখলাবদ্ধ বাঘের কাছে যান যদিও সে আবদ্ধ, তবুও সে কিন্তু অল্প জায়গার ভেতরে ঘোরাফেরা করতে পারে একইভাবে শয়তানও একই কাজ করতে পারে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "শয়তানরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যায়।" তারা স্বল্প জায়গায় ঘোরাফেরা করতে পারে। সুতরাং কেউ যদি শয়তানের ঘোরাফেরার আওতায় বাইরে থাকে তাহলে সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

আমি এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে কারণটি অনুভব করি সেটা হলো- আমরা একটি ব্যাপার অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই তাহলো যদিও শয়তান রমযান মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে কিন্তু বাকি আরো ১১ মাস সে কিন্তু মুক্তই থাকে। ওই ১১ মাসে শয়তান মানুষের ওপর যে সব কুমন্ত্রণা এবং পাপে জড়াতে পেরেছে তার প্রভাব মানুষকে পবিত্র রমযান মাসেও প্রভাবিত করে। আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি- একজন মাদক বিক্রেতা যে বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করে কলেজ, ভার্সিটির তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরকে মাদকাসক্ত করে ফেলে। এটিতে সফল হওয়ার জন্য প্রথমে তারা কি করে? প্রথমে তারা ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে মাদক দেয়। তাদেরকে মাদক গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে।

পরবর্তীতে তারা ছাত্রদের উপর মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে মূল্য আদায় করতে শুরু করে এবং দিনে দিনে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।'কিন্তু ততদিনে ওই ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যদি ওই দমাদক বিক্রেতারা ওই ছাত্রছাত্রীদের কাছে না যায় তাহলে ওই ছাত্রছাত্রীরাই নিজেরা ওই মাদক বিক্রেতাকে খুঁজে বের করে। ওই মাদক বিক্রেতারা তাদের কৌশল অনুযায়ী অন্য কোনো লোকের কাছে গিয়ে একই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে। সুতরাং যে লোকেরা মাদকের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা নিজেরাই মাদকের দোকানে গিয়ে সেটি গ্রহণ করে। একইভাবে যারা শয়তানের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা শয়তান অনুপস্থিত থাকলেও তাদের মাঝে শয়তানকে খোঁজা বা শয়তানের আসক্তি তাদের ভেতর প্রবলভাবে কাজ করে। কিন্তু মুমিন মুসলিম যারা শয়তানের প্রতি আসক্ত হয় নি তাদের পক্ষে শয়তানের কাছে থেকে দূরে থাকা বা কুমন্ত্রণা থেকে বিরত খুবই সহজ।

এ প্রসঙ্গে তৃতীয় কারণদ হিসাবে বলবো, অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ আছেন যারা বলেন যে, পবিত্র রমযান মাসে বড় বড় শয়তানরা অনুপস্থিত থাকে কিন্তু ছোট এবং শয়তানের দোসররা মুক্ত থাকে এবং তারাই মানুষের ভিতরে কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দেয়। এই শ্রেণীতে আরেকটি যুক্তি আছে তাহলো, যদিও আল্লাহ রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেন তথাপি তারা মানুষের

অন্তরে তাদের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে এবং এরই মাধ্যমে তারা মানুষকে তাদের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

অর্থ: "তারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তারা আসে হয়তো মানুষ কিংবা জ্বিনের ভেতর থেকে।" (সূরা নাস, আয়াত ৫, ৬)

এখানে শয়তানের কথা বলা হয়েছে। শয়তান এমনই সত্তা যে মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে এবং পলায়ন করে এবং সে হতে পারে মানুষ কিংবা জ্বিন জাতি হতে। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা যে শয়তানকে বন্দি করেন সে হয়ত জ্বিন জাতির সদস্য কিন্তু মানবজাতির ভেতরের শয়তান তখনো মুক্ত থাকে। সুতরাং এক শ্রেণীর শয়তান যারা জ্বিন জাতি হতে আসে তারা অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু মানবজাতীয় শয়তান উপস্থিত থাকে। তাই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে। এই কুমন্ত্রণাই হলো আসল জিনিস যেটি মানুষকে শয়তানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারটি হাদীসে পরিষ্কার করা হয়েছে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য রমযানকে উপস্থিত করেছেন। তোমাদের উচিত রোযা রাখা এবং এই রোযার উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর অন্তর জয় করা।

শয়তান কি শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে? আল্লাহ আমাদেরকে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, রোযার মাসে শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে। সুতরাং যদি তুমি রোযা রাখ তাহলে তোমার পেছনে যে শয়তান লেগে আছে আল্লাহ তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেবেন। এখানে শয়তান হতে বাঁচার জন্য শর্ত হলো আমাদেরকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। যদি তুমি যথাযথ নিয়তের সাথে রোযা রাখো তাহলে নিশ্চিতভাবে শয়তান তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

এটা প্রমাণ করার সবচেয়ে যৌক্তিক উপায় হলো, যদি আমরা রমযান মাসে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অপরাধ প্রতিবেদন দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, অন্য মাসের তুলনায় এটি অনেক কম। কিন্তু যদি রমযান মাসে একটি অমুসলিম দেশের অপরাধ প্রতিবেদন দেখি তাহলে দেখা যাবে এটি অন্যান্য মাসের মতই রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো তারা রোযা পালন করে না, তারা মুসলিম নয় এবং শয়তান তাদের উপর তখনও প্রভাবশীল থাকে। যদিও সব মুসলমান রোযা থাকে না কিন্তু বেশির ভাগই রোযা থাকে এবং এই কারণে পবিত্র রমযান মাসে অন্যান্য অমুসলিম দেশের তুলনায় মুসলিম দেশগুলোতে অপরাধের পরিমাণ কম থাকে।

প্রশ্ন: হাদীসে বলা হয়েছে যে, পবিত্র রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাহলে এটা কি এই অর্থ বহন করে যে, যারা রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করবে তারা সকলেই বেহেশতবাসী হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আপনার এই প্রশ্নটি জাগ্রত হয়েছে মূলত দুটি হাদীসে ভিত্তিতে, (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড - ২, হাদীস নং ৭১৪৮ এবং সুনানে নাসাঈ, ধ্যায় - রোযা, হাদীস নং ২০১৬) যেখানে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন-

"ওহে লোকেরা তোমাদের মাঝে অসীম রহমতময় রমযান মাস সমাগত এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এই মাসে রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং এই মাসেই কদরের রাত রয়েছে যেটি হাজার রাতের চেয়ে উত্তম।"

আর যে ব্যক্তি এই মাসের অসীম রহমত গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত ব্যক্তি।

তাহলে এটা খুবই সাধারণ একটা জিজ্ঞাসা যে, যেহেতু এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খোলা এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া থাকে, সুতরাং এই মাসে যে কেউ মৃত্যুবরণ করলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ দোজখের দরজা বন্ধ আর বেহেশতের দরজা খোলা। এবং এটা কি এই অর্থ প্রকাশ করে না যে, এই মাসে একজন অমুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সেও জান্নাতে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, পবিত্র রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খোলা থাকে- এর অর্থ হলো জান্নাত মানুষকে এর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আহবান করতে থাকে। অর্থাৎ আপনি যদি কোন ছোট আকারের ছওয়াবও করে থাকেন তাহলে রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালা সেটি যতখুশি তত গুণে প্রতিদান বাড়িয়ে দেন।

একটি হাদীসে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, **"প্রত্যেকটি পুণ্য কাজের জন্য রমযানে আল্লাহ এর প্রতিদান দশগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে থাকেন।"** যে কারণে রমযান মাসে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব সহজ। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, এই মাসে দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই কথাটি এটা নির্দেশ করে যে, এই মাসে জাহান্নামে প্রবেশ করা খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন কেন? কারণ এই মাসে রোযাদারের তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি বেড়ে যায়, যেটি অন্যায় কাজ, পাপ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এবং আপনি যদি রমযানের পুরোটাই রোযা রাখেন এবং আপনার নিয়ত যদি আল্লাহর পুরস্কার পাওয়ার জন্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা আপনার জীবনের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন। সুতরাং রমযান মাসে আল্লাহর অনুগ্রহ

পাওয়ার জন্য সবগুলো রোযাই আপনাকে পালন করতে হবে। তাহলেই আপনার সব গোনাহ মাফ হবে।

সুতরাং একটি লোক যদি পুরোপুরিভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার পেছনে যে শর্তটি রয়েছে সেটি অবশ্যই আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। আর সেই শর্তটি হলো, অবশ্যই রোযা রাখতে হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই আমাদের একটি টিকিটের প্রয়োজন হবে। এই জান্নাতের টিকিটের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সূরা **"আল আছরে"** উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, **"সময়ের শপথ নিশ্চয় মানুষ ধ্বংসের ভিতরে রয়েছে কিন্তু তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে ধৈর্য এবং সত্যের দিকে আহবান করে।"**

ইমাম শাফেয়ীর মতে, আল কুরআনের এই সূরাটি এমন একটি প্রতিষেধক যেটি সমগ্র মানবজাতির চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকে মানব জাতির চিকিৎসক বলা হয়ে থাকে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষের চারটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ঈমান থাকা,
২. সৎ কাজ করা,
৩. মানুষকে সৎ পথে আহবান করা এবং
৪. ধৈর্য ধারণ করা।

সুতরাং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জান্নাতের দরজাগুলো যদিও খোলা থাকে কিন্তু যে কেউ এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, কারণ সেখানে ঢুকতে হলে আপনাকে অবশ্যই টিকিট দেখাতে হবে। আর সেই টিকিট হলো ঈমান। সেই টিকিট হলো সূরা আছর এবং পবিত্র রমযান মাসে এই টিকিট অর্জন করা খুবই সহজ, কারণ এই মাসে মুসলমানদের ঈমানের উচ্চতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং আমরা রমযানে যে ভালো কাজগুলো করি আল্লাহ তার প্রতিদান কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। তাই জান্নাতের টিকিট অর্জন খুবিই সহজ। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে যেটি পালন করলে আপনি জান্নাতে যাবেন এবং জাহান্নামে যাবেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ১০০ ভাগ লোকই জান্নাতে যাবে। যাদের ঈমান নাই তারা যাবে না। আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান তাহলে আপনার টিকিট লাগবে আর সেই টিকিট হলো সূরা আল আছর।

হাদীসে বলা হয়েছে, "যদি তুমি রমযান মাসে রোযা রাখ, রোযার সকল আইন- কানুন পালন করো এবং রোযার মাসে যে সব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে সব থেকে বিরত থাকো তাহলে তোমার জন্য দোজখের দরজা বন্ধ এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে।" আরেক

জায়গায় বলা হয়েছে, "এই মাসের রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশির সমতুল্য।" এটি নির্দেশ করে যে, যদি কেউ রমযান মাসের একটি রাতে আল্লাহর ইবাদত করে তাহলে সে হাজার মাসেরও বেশি সময় ধরে ইবাদত করার মর্যাদা পাবে এবং এটা প্রায় ৮০ বছরের বেশি। এটা আসলেই চিন্তার ব্যাপার। সুতরাং আল্লাহর প্রতিদান পাওয়ার জন্য সারা জীবনের সময়ের চেয়ে ওই রমযানের একটি রাতই যথেষ্ট। বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছর কিন্তু একটি কদরের রাতই ৮০ বছরের চেয়ে বেশি।

এটি মানুষের গড় আয়ুর চেয়েও বেশি। সুতরাং এই সময়ে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং সহজ। হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই মাসের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত ব্যক্তি। অর্থাৎ তাদেরকে মিসকিন বলা হচ্ছে। যার মানে বঞ্চিত। যদি আপনি রমযান মাসের এই বাড়তি সুবিধা গ্রহণ করতে না পারেন এবং জান্নাতে না যেতে পারেন তাহলে আপনি আসলেই বঞ্চিত। যেটি অমুসলিমদেরকেও এই বঞ্চিতদের দলে যুক্ত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া সঠিক পথ গ্রহণ করেনি সত্যিকার অর্থেই সে বঞ্চিত।

রমযানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শিক্ষা

ঐচ্ছিক রোযা এবং নিষিদ্ধ রোযা

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ইসলামে রমযানের ফরজ রোযার পাশাপাশি অন্য কোনো রোযা আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলামে যে সব আচার- আচরণ পালন করা হয় সেগুলো দুই ধরনের। যেমন- ১. ফরজ, ২. ঐচ্ছিক।

একইভাবে রোযার ক্ষেত্রেও এই দুইটি বিষয় রয়েছে। এক্ষেত্রে ফরজ রোযার পাশাপাশি ঐচ্ছিক রোযাও রয়েছে। আল্লাহ সকল মুসলিমের জন্য কিছু কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেগুলোকে বলা হয় ফরজ ইবাদত এবং এই ফরজগুলো সকল মুসলিমের জন্য আদায় করা বাধ্যতামূলক এবং ফরজগুলো পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের সর্বনিম্ন দায়িত্ব। এই ফরজ ইবাদত গুলোর পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা আরো কিছু ইবাদতের কথা বলেছেন যেগুলো পালন করা ঐচ্ছিক, যাতে করে আরো বেশি সওয়াব অর্জন করা যায়। মুসলমানেরা যে সব ভুল বা যে ফরজগুলো পালন করতে পারে না সেগুলোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে এসব ঐচ্ছিক ইবাদতগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এটা একটা বড় মাপের রহমত যে, আল্লাহ আমাদেরকে ফরজ ইবাদতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু ঐচ্ছিক ইবাদতের সুযোগ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে একজন

মুসলিম বেশি বেশি সওয়াব পেতে পারে এবং এর মাধ্যমে তার জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। একইভাবে রোযার ক্ষেত্রেও ফরজ এবং ঐচ্ছিক দুই ধরনের ইবাদত রয়েছে।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) ফরজ রোযার বাইরে আর কোন কোন রোযার ব্যাপারে তাগিদ করেছেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাসের রোযা এবং নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া একজন মুসলিম সারা বছর রোযা রাখতে পারে, তবে এক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) বছরের কয়েকটি দিনকে অধিক পছন্দ করেছেন যে দিনগুলোতে মুসলমানরা রোযা রাখতে পারে এবং অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। সে দিনগুলো হলো:

১. মুহাররম মাসের আশুরার রোযা।
২. আরাফার দিনের রোযা।
৩. জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা।
৪. শাওয়াল মাসের রোযা।
৫. শাবান মাসের রোযা।
৬. নিষিদ্ধ মাসের রোযা।
৭. প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের রোযা।
৮. সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা এবং
৯. বছরের অন্যান্য দিনের রোযা।
এই মোট নয় প্রকারের রোযা যেগুলো মুহাম্মদ (ﷺ) পালন করার জন্য তাগিদ করেছেন।

প্রশ্ন: এই নয় প্রকারের ঐচ্ছিক রোযার মধ্যে কোন রোযাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক রোযা হলো মুহাররমের রোযা, বিশেষ করে মুহাররমের দশ তারিখের আশুরার দিনের রোযা। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৬১২)

অর্থাৎ, “এক ব্যক্তি তার কাছে জিজ্ঞেস করল যে, প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নামাজ কোনটি এবং রমযানের রোযার পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোযা কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, নামাজ হলো কিয়ামুল লাইল এবং রোযা হলো আশুরার দিনের রোযা।”

আরকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (তিরমিযী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ৭৫২)

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, আশুরার দিনে রোযা রাখলে পূর্বের বছরের সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে যায়।"

আরোও বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২০০৪)

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) মদীনায় পৌঁছে একজন ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে ১০ই মহররমের রোযা রাখে কিনা তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, এই দিনে আল্লাহ বনী ইসরাইল জাতিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাদের নবী এই দিনে রোযা রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে এই দিনে রোযা রাখতে নির্দেশ দেন।"

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪৩৯)

"ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন যে মুসলমানদের উচিত মুহাররমের দশ তারিখে আশুরার রোযা রাখা, তখন কিছু সাহাবি বললেন যে, কিছু কিছু দিন রয়েছে যেগুলোতে ইহুদীরা আনন্দ উৎসব করে থাকে তবে আমাদের কি সেসব দিনে উৎসব করা উচিত? তিনি জবাবে বললেন আমরা আগামী বছর থেকে মহররমের ৯ তারিখেও রোযা রাখব ইনশা- আল্লাহ। তবে পরের বছর আর তিনি বেঁচে ছিলেন না।"

অন্যত্র বলা হয়েছে, (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪১৬)

হাফসা (রা.) বলেন, "মুহাম্মদ (ﷺ) কখনও চারটি জিনিস বাদ দিতেন না। সেগুলো হলো:

১. আশুরার দিনের রোযা।
২. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা।
৩. প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা এবং
৪. ফজরের নামাজের আগে দু'রাকআত সুন্নাত নামাজ।

সুতরাং এই হাদীসগুলো হতে অনুধাবন করা যায় যে, আশুরার রোযা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইহুদীরাও এই দিনে রোযা রাখে সে কারণে মুসলমানদের উচিত আশুরার দিনসহ তার আগের দিন কিংবা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখা। এতে করে আমরা ইহুদীদের সাথে পার্থক্য গড়ে তুলতে পারি।

প্রশ্ন: আরাফার দিনের রোযার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন কি? হজ্বকারীদেরও কি এই রোযা রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আরাফার দিন হলো যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ। এই দিনে হজ্বকারীরা সকলে আরাফার ময়দানে সমবেত হয় এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং এই কারণে সারা বিশ্বের মুসলমানরা ঐ হজ্বকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য রোযা রাখে।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, ২৬০৩)

অর্থাৎ, "একজন ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলো যে আরাফার দিনের রোযার তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, আরাফার রোযা দুইটি বছরের সকল গুনাহ মুছে দেয়। তাহলো পূর্বের বছর এবং চলতি বছরের।"

সুতরাং আরাফার রোযার মূল কারণ হলো এটা দুই বছরের গুনাহ মুছে দেয়। তবে কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন আরাফার দিনে রোযা রাখা উচিত নয়, কারণ তারা একটি হাদীসে উদ্ধৃতি দেন। সেটি হলো, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৮৮)

অর্থাৎ, "কোনো এক সময় মুহাম্মদ (ﷺ) হজ্ব পালন করছিলেন এবং সাহাবিরা একটি ব্যাপারে অনিশ্চয়তার ভিতরে ভুগছিলো সেটা হলো নবী করীম (ﷺ) রোযা রেখেছেন নাকি রাখেন নি। সুতরাং একজন নারী মুহাম্মদ (ﷺ) কে এক গ্লাস দুধ দিলো এবং তিনি তা পান করলেন এবং এটা নির্দেশ করে যে তিনি রোযা ছিলেন না।"

কিন্তু এই হাদীসটাতে শুধু হজ্বকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং তাদের রোযা রাখার দরকার নেই, কারণ এটা তাদের জন্য বাড়তি বোঝা হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৮৬)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যতীত কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা যে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।"

তাছাড়া হজ্বকারীরা হজ্বের সময় অনেক দৌড়াদৌড়ি, হাঁটাহাঁটি এবং বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রম করে, সে কারণে তাদেরকে আরাফার দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য মুসলমান যারা হজ্ব করছে না তাদের উচিত আরাফার দিনে রোযা রাখা।

প্রশ্ন: যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার গুরুত্ব কতখানি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে বলা হয়েছে, **(সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪৩২)**

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অধিক ভালোবাসেন যে ব্যক্তি যিলহজ্বের প্রথম দশ দিন রোযা রাখে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ এটা জিহাদের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি জীবন এবং সম্পদ নিয়ে জিহাদে গেল এবং সে তার কোনোটিই নিয়ে ফিরতে পারলো না এবং এটা ব্যতীত আল্লাহর কাছে এই রোযা অধিক পছন্দনীয়।"

সুতরাং এই হাদীস থেকেই আমরা যিলহজ্বের দশটি রোযার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হই।

প্রশ্ন: শাওয়াল মাসের রোযার জন্য মুহাম্মদ (ﷺ) কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কি? এবং শাওয়ালের রোযা নিয়মিতভাবে এলোমেলোভাবে রাখা যাবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৬১৪)**

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে এবং তারপর শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখে সে যেন সারা বছরের জন্য রোযা রাখল।"

সুতরাং রমযান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। এখন, শাওয়ালের রোযা রমযান শেষ হওয়ার ঠিক পর মুহূর্তেই রাখতে হবে নাকি পরে রাখা যাবে, নিয়মিতভাবে রাখতে হবে নাকি এলোমেলো ভাবে রাখা যাবে। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। তবে আমার জ্ঞানানুযায়ী এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো কোনো হাদীসে এরকম বলা হয় নি যে, রমযানের রোযার ঠিক পর মুহূর্তেই শাওয়ালের রোযা রাখতে হবে। অর্থাৎ শাওয়াল মাসের যেকোনো ছয় দিন রোযা রাখা যাবে। তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমরা ভালো কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। অতএব হাদীসের এই

যুক্তিটি গ্রহণ করলে শাওয়ালের রোযা দ্রুত করা যায় তত ভালো। আর এই রোযা ক্রমানুসারে নাকি এলোমেলোভাবে রাখা যাবে, এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই, যদিও কেউ কেউ বলেন যে, এই রোযা ক্রমানুসারে রাখতে হবে।

তবে এ ব্যাপারে হাদীসে কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ শাওয়ালের রোযা ক্রমানুসারে, এলোমেলো বা আলাদা আলাদা ভাবে রাখা যাবে। এছাড়া ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আরেকটি ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়, সেটা হলো- এই রোযা রাখার জন্য কি আগের রাতে নিয়ত করতে হবে নাকি সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়ত করা যাবে? কিছু আলেম বলেন, যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রোযা সেহেতু আগের রাতে নিয়ত করতে হবে। তবে হাদীসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐচ্ছিক রোযার জন্য পূর্ব থেকে নিয়ত করার দরকার নেই। এই তিনটি হলো শাওয়ালের রোযা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তবে আমি মনে করি সঠিক সিদ্ধান্ত হলো শাওয়াল মাসের যেকোনো সময় যেকোনো দিনে রোযা রাখা যাবে। ধরা যাক, কোনো একজন শাওয়াল মাসের রোযা এখনও রাখে নি তবে আরো দুই দিনের রোযার ছওয়াব পাবে। অতএব হাদীসে বলা হয়েছে যে রমযান মাসে রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলে সেটি এক বছরের সমান রোযা বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) শুধু ছয়টি রোযা রাখতে বললেন কেন, এটাতো ৫, ৮ কিংবা ৯ দিনেরও হতে পারতো? (শাওয়াল মাসের ক্ষেত্রে)

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৬১৪)**

যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে এবং তারপর শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখে সে যেন সারা বছরের জন্য রোযা রাখল।” অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, **রোযাদারের একটি ভালো কাজের ছওয়াব অন্যান্যের তুলনায় দশগুণ বেশি লেখা হয়।** সুতরাং কেউ যদি এক মস রমযানের রোযা রাখে তাহলে সেটা দশ মাসের সমান এবং যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, তবে সেটা দুই মাসের সমান সুতরাং দশ মাস আর দুই মাস সমান বারো মাস। অতএব এই কারণে তিনি শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখতে বলেছেন এবং বলেছেন রমযানের পর শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখলে সেটি এক বছরের সমান হবে।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) শা’বান মাসে রোযা রাখার জন্য বলেছেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৬৯)**

"আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) রমযান মাস ব্যতীত বছরের আর কোনো সময় পুরো মাস রোযা রাখতেন না এবং তিনি শাবান মাসের তুলনায় অন্য কোনো মাসে (রমযান মাস ব্যতীত) এত বেশি রোযা রাখতেন না।"

সুতরাং এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের পরে শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন এবং হয়তোবা তিনি রহমতময় রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতির জন্য বেশি করে রোযা রাখতেন। তবে কিছু লোকের মধ্যে এমন ভুল ধারণা রয়েছে যে, শাবান মাসের ১৫দিন রোযা রাখা উচিত। কিন্তু হাদীসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, শাবান মাসের ১৫ দিন রোযা রাখতে হবে। তবে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৩৩০)

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, শাবান মাসের প্রথম পনের দিনের পর তোমাদের রোযা রাখার উচিত নয়।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯১৪)

"মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, রমযানের ২/১ দিন আগে তোমাদের রোযা রাখা উচিৎ নয় কারণ এই দিনগুলো সন্দেহময়।"

সুতরাং এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, শাবান মাসের ১৫ তারিখের পর আর রোযা রাখা উচিত নয় এবং শাবান মাসে যে কেউ তার সাধ্যমতো রোযা রাখতে পারবে।

প্রশ্ন: নিষিদ্ধ মাস বলতে কী বোঝায় এবং সেই মাসগুলো কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিষিদ্ধ মাস বলতে চারটি বিশেষ মাসকে বোঝায়। সেগুলো হলো:

১. যিলকদ মাস, ২. যিলহজ্ব মাস, ৩. মুহাররম মাস ও ৪. রজব মাস।

যদি কেউ এই মাসগুলোতে রোযা রাখে তবে তা ঐচ্ছিক রোযা বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখার কথা বলেছেন কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কারণ মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং - ২:৮৩৬১)

"কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল যে আপনি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন কেন? তিনি বললেন, দুইটি দিন আছে যে দিনে আল্লাহকে মানুষের আমলনামা দেখানো হয়, তাই আমি এই দিন দুইটি অধিক পছন্দ করেছি।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২০০৬)

অর্থাৎ, "এক ব্যক্তি নবী করীম (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করল যে আপনি সোমবার রোযা রাখেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, সোমবারে আমি রোযা রাখি, কারণ আমি এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং এই দিনে আমার নিকট কুরআন নাযিল হয়েছিলো।"

অতএব এগুলোই হলো সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোযা রাখতে তাগিদ দেওয়ার মূল কারণ।

প্রশ্ন: প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই তিনটি দিন হলো মাসের পূর্ণ চন্দ্রের দিন। তাহলো- ১৩ এবং ১৪ তারিখ। হাদীসে বলা হয়েছে, (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪২৪)

"তোমাদের উচিত প্রত্যেক মাসের তিন দিন (১৩, ১৪ ও ১৫) রোযা রাখা। এটা সারা বছর রোযা রাখার সমান।"

অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৭৫) যখন কোনো ব্যক্তি বছরের সবগুলো মাসে তিনটি করে রোযা রাখে তবে সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো। কারণ প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ করে দেওয়া হয়।"

সুতরাং কেউ যদি মাসে তিনটি করে রোযা রাখে তবে তা সারা মাসের সমান এবং কেউ যদি প্রতিটি মাসে এভাবে রোযা রাখে তবে তা এক বছরের সমান। এই কারণে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা একবছর রোযা রাখার সমান অর্থাৎ কেউ যদি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বছরের প্রতিটি মাসে তিনটি করে রোযা রাখে তাহলে সে সারা জীবন রোযা রেখেছে

বলে বিবেচিত হবে এবং এ কারণেই মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন: দাউদ (আ.)- এর রোযার গুরুত্ব কতখানি এবং তিনি কীভাবে রোযা রাখতেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিকট অধিক পছন্দনীয় রোযাগুলোর অন্যতম হলো দাউদ (আ.)- এর রোযা। এ ব্যাপারে হাদীস পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৭৫)

অর্থাৎ, "সাহাবী আব্দুল্লাহ (রা.) এলে নবী করীম (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছি তুমি নাকি প্রতিদিন রোযা রাখো এবং রাতে নামাজ আদায় করো? সে বলল- হ্যাঁ, মহানবী (ﷺ) বললেন, তোমার উচিত কিছুদিন রোযা রাখা এবং কিছু দিনের জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া এবং তোমার উচিৎ রাতের কিছু অংশে নামাজ পড়া আর কিছু অংশে ঘুমিয়ে থাকা, কারণ তোমার কাছে তোমার শরীরের, স্ত্রীর, পরিবারের এবং তোমার আত্মীয়- স্বজনের অধিকার রয়েছে এবং বললেন যে, তুমি মাসের তিন দিন রোযা রাখতে পারো এটা এক বছরের সমতুল্য হবে। তখন সাহাবি বললো, হুজুর আমি এর থেকে আরো বেশি করতে পারি। নবী করিম (ﷺ) বললেন, দাউদ (আ.) এর রোযার ন্যায় রোযা রাখো। তখন সাহাবি জিজ্ঞেস করল দাউদ (আ.) কোন ধরনের রোযা রাখতেন? নবী বললেন, তিনি বছরের অর্ধেক দিনে রোযা রাখতেন অর্থাৎ সারা বছরে একদিন বাদে একদিন এভাবে রোযা রাখতেন।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৭৬) **"রোযা রাখো সেভাবে যেভাবে দাউদ (আ.) রাখতেন, তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং পরের দিন রোযা রাখতেন না- এভাবে রোযা রাখতেন।"**

প্রশ্ন: ফরজ রোযার সাথে ঐচ্ছিক রোযার পার্থক্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দুইটি বিষয় ব্যতীত আর সবকিছু একই। সেই দুইটি হলো:

প্রথমত, নিয়ত। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঐচ্ছিক রোযা রাখে সে ইচ্ছা করলে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। হাদীস উল্লেখ আছে যে, (সুনান নাসাঈ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৩২৩)

অর্থাৎ, "একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়েশা (রা.)- কে জিজ্ঞেস করলেন- কোনো খাবার আছে কিনা। তিনি বললেন- না। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তাহলে আমি আজ রোযা রাখছি।"

মুহাম্মদ (ﷺ) এই ক্ষেত্রে রোযা রাখার আগের দিন রাতে নিয়ত করেন নি যেটা ফরজ রোযার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঐচ্ছিক রোযার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠেই রোযা রাখতে পারে, যদি সে কোনো কিছু না খেয়ে থাকে। সুতরাং এখানে পার্থক্য হলো, ফরজ রোযার ক্ষেত্রে আগের রাতে নিয়ত করতে হয় কিন্তু ঐচ্ছিক রোযার ক্ষেত্রে এ ধরনের নিয়তের দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি ঐচ্ছিক রোযা রাখে সে তার নিজের ইচ্ছা- অনিচ্ছা মালিক। সে ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে আবার ভেঙ্গেও ফেলতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (তিরমিযী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ৭৩২)

অর্থাৎ, "উম্মে হানি (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে মুহাম্মদ (ﷺ) আমাকে পানির পাত্র দিলেন এবং পান করতে বললেন। আমি বললাম, আমি রোযা পালন করছি। তখন নবী করীম (ﷺ) বললেন, তোমার রোযা কি কোনো কিছু অর্জনের জন্য নাকি ঐচ্ছিক? তিনি বললেন- ঐচ্ছিক। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি ঐচ্ছিক রোযা রেখেছে সে তার ইচ্ছার মালিক এবং সে ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় তার রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, (বায়হাকি, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ৮৩৬২) **"কোনো একজন সাহাবী মুহাম্মদ (ﷺ)- কে তার বাড়িতে দাওয়াত করলো এবং মুহাম্মদ (ﷺ) অন্যান্য সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়াত খেতে গেলেন। যখন খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছিলো তখন কেউ একজন বলে উঠল যে সে রোযা রেখেছে। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, মেজবান তোমার জন্য খাবার রান্না করেছে এবং ব্যয় করেছে। সুতরাং তোমার রোযা ভেঙ্গে ফেলো এবং তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে পরে এটা পূরণ করে নিও।"**

সুতরাং আমরা যে বিষয়টি বুঝতে পারলাম তা হলো:

১. ফরজ এবং ঐচ্ছিক রোযার নিয়ত এক রকম নয় অর্থাৎ ফরজ রোযার ক্ষেত্রে আগের রাতে নিয়ত করতে হয় কিন্তু ঐচ্ছিক রোযার জন্য এ রকম নিয়তের দরকার নেই।

২. ঐচ্ছিক রোযা ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় ভেঙ্গে ফেলা যায় কিন্তু ফরজ রোযা ইচ্ছা করলেই ভেঙ্গে ফেলা যায় না।

এগুলোই হলো ফরজ রোযার সাথে ঐচ্ছিক রোযার পার্থক্য।

প্রশ্ন: কোন কোন দিনে বা মাসের রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিম্নোক্ত দিনগুলোর রোযা গ্রহণযোগ্য হবে না।
১. দুই ঈদের দিন,
২. ঈদুল আযহার পর তিন দিন,
৩. রমযান মাসের আগের ২/১ দিন,
৪. শুধু শুক্রবারের দিনের রোযা,
৫. শুধু শনিবারের দিনের রোযা,
৬. সারা জীবন রোযা রাখলে,
৭. দিন রাত উভয় সময় রোযা রাখা,
৮. বিবাহিত নারী স্বামীর অনুমতি না নিয়ে ঐচ্ছিক রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন: দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষেধ কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দুই ঈদের দিন হলো উৎসবের দিন। মুসলমানরা এই দিন ছুটিতে নামাজের জন্য ঈদগাহে যায় এবং ফিরে এসে বন্ধু- বান্ধব, আত্মীয়- স্বজন ইত্যাদি লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। সুতরাং রোযা এবং উৎসব এক সাথে চলে না। তাছাড়া রমযান মাসে দীর্ঘদিন রোযা রাখার পরে রোযার সমাপ্তি হিসাবে মুসলমানদের মাঝে মহা আনন্দের ঈদুল পিতর এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং এমন দীর্ঘ রোযার সমাপ্তির পর আবার রোযা রাখা যেতে পারে কীভাবে? এবং ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে, এটা হলো- কুরবানীর দিন। সুতরাং এই দিনে সকলের উচিত কুরবানীর গোশত খাওয়া। এইসব কারণেই দুই ঈদের দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪১০)

"মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কারণ ঈদুল আজহার দিনে কুরবানী করতে হয় এবং ঈদুল ফিতর আসে রমযান মাসের সমাপ্তি হিসাবে।"

অতএব এগুলোই হলো দুই ঈদের দিন রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদুল আযহার পরের তিন দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কারণ ঈদুল আযহার পরের তিন দিন হলো আনন্দ উৎসবের দিন। এ সময়ে মুসলমানরা তাদের পরিবার, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তারা এই সময় কুরবানীর খাদ্য খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো- ঈদুল আযহার দিনের পাশাপাশি তার পরের তিন দিনও প্রাণী কুরবানী করার জন্য অনুমোদিত। সুতরাং এই দিনগুলোতে রোযা রাখা উচিত নয়।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (মুসনাদে আহমদ, অনুচ্ছেদ- ২, হাদীস নং- ১০৬৬৪)

"আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা (রা.)- কে পাঠালেন এবং তিনি মিনার লোকদেরকে বললেন যে, যারা হজ্ব পালন করছেন তারা ঈদুল আযহার পরের তিন দিন রোযা রাখবেন না। কারণ এই দিনগুলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য।"

সুতরাং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন: সন্দেহজনক দিন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সন্দেহজনক দিন হলো ঐ দিন যে দিনে মনে হয় আজ রমযানের দিন নাকি শাবানের দিন? হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (তিরমিযী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ৬৮৬)

"যখন চাঁদ দেখা যায় না এবং লোকেরা সন্দিহান হয়ে পড়ে যে আজ কি রমযানের দিন নাকি শাবানের দিন এবং এমতাবস্থায় রোযা রাখা নিষিদ্ধ।"

আরেকটি হাদীসে আছে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯১৪) **"সন্দেহ হওয়ার কারণে রমযান মাসের ২/১ দিন আগে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। অন্যত্র বলা হয়েছে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৩২৭) "কোনো একদিন আমরা চাঁদ দেখছিলাম এবং লোকদের ভিতরে সন্দেহ হলো যে চাঁদ দেখা গিয়েছে নাকি যায় নি, এমতাবস্থায় লোকের ভিতরে বিভক্তি দেখা দিল এবং ওই সময় একটি ছাগল জবেহ হলে লোকদেরকে গোশত দেওয়া হলো কিন্তু কিছু লোক ছিলো যারা সেই গোশত নিল না; কারণ তারা রোযা ছিলো না এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহাবি বললেন, যারা আজকের দিনে রোযা রখেছে তারা আবুল কাশেমকে { মুহাম্মদ (ﷺ)} অসম্মান করেছে।"** সুতরাং সন্দেহ নিয়ে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কারণ নিয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেউ যদি সন্দেহ নিয়ে রোযা রাখে তাহলে সে শাবান মাসের ঐচ্ছিক রোযা নিয়ত করবে নাকি রমযানের ফরজ রোযার নিয়ত করবে? সুতরাং সন্দেহ নিয়ে কোনো মহৎ কাজ করতে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন: শুধু শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শুধুমাত্র শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ কারণ, শুক্রবার হলো, সপ্তাহের প্রধান দিন এবং এই দিনকে মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদ বলা হয়। এটা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এ দিনে মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ আদায় করে। সুতরাং এই দিনটি রোযা রাখার জন্য পছন্দনীয় নয়। তাছাড়া ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা তাদের সপ্তাহের প্রধান দিনটিতে রোযা রাখে। ইহুদীরা রোযা রাখে শনিবারে আর খ্রিস্টানরা রাখে রবিবারে এবং এই দুইটি দিন তাদের সপ্তাহের প্রধান দিন এবং তারা ওই প্রধান দিন দুটিতে রোযা রাখে এবং মুসলমানদের সপ্তাহের প্রধান দিন হলো শুক্রবার। যেহেতু ইহুদী, খ্রিস্টানরা তাদের সপ্তাহের প্রধান দিনে রোযা রাখে, তাই মুসলমানদের উচিত নয় তাদের রীতে অনুসরণ করা। কারণ মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, অমুসলিমরা যা করে তোমরা তার বিপরীতটা করো। অতএব এই সব কারণে নবী করীম (ﷺ) শুক্রবারে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন, তবে এই নিষেধাজ্ঞা হলো সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। এটা মাকরূহ এবং এটা বলা হয়েছে যে, যদি কেউ শুক্রবারে রোযা রাখতে চায় তবে সে যেন শুক্রবারের আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখে। তবে একাধিক রোযা রাখার নিয়ত করলে তার মধ্যে যদি শুক্রবার আসে তবে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৮৬)**

অর্থাৎ, "একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) কোনোও এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন যে, শুক্রবারের দিন রোযা ছিলো। মুহাম্মদ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা ছিলে? সে বলল, না। তবে কি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করেছো? সে বলল- না। নবী করিম (ﷺ) বললেন, তাহলে তোমার রোযা ভেঙ্গে ফেলো।"

আরও বলা হয়েছে যে, **(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৫৪৬)**

"মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, শুধু শুক্রবারের পূর্ব রাতকে নামাজের জন্য নির্ধারণ করো না এবং শুধু শুক্রবারকে ঐচ্ছিক রোযার জন্য নির্ধারণ করো না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ শুক্রবারের আগে কোনো রোযা না রাখা হয়।"

সুতরাং শুধুমাত্র শুক্রবারের দিনকে ঐচ্ছিক রোযা রাখার জন্য নির্ধারণ করা যাবে না, তবে অন্যান্য সাধারণ রোযার ভিতরে যদি শুক্রবার আসে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: শুধুমাত্র শনিবারকে ঐচ্ছিক রোযা রাখার জন্য বেছে নেওয়া যাবে না কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীসে আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ২৪১৫)

"শুধু শনিবারকে রোযা রাখার জন্য বেছে নিও না। সেদিন যদি শুধু কোনোকিছু চুষেও ক্ষুধা নিবারণ করতে হয় তবুও সেদিন রোযা রেখো না।"

এর কারণ হলো শুক্রবারের রোযা না রাখার কারণের মত অর্থাৎ শনিবারের ইহুদীরা রোযা রাখে এবং উৎসব করে, সুতরাং আমরা মুসলমানরা তাদের উৎসবের দিনে আমরাও উৎসব করতে পারি না, তবে ওই ক্ষেত্রে শনিবারে রোযা রাখা যাবে যদি কেউ শনিবারের আগে রোযা রাখা আরম্ভ করে কিংবা শনিবারের পরের দিনেও রোযা রাখার নিয়ত রাখে।

প্রশ্ন: আমরা সারা বছর রোযা রাখতে পারবো না কেন এবং শুধু এক মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখা যায় কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সারা বছর রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) সারা বছর এবং সারা জীবন রোযা রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। সারা বছর রোযা রাখা মানুষকে শারীরিক ক্ষতি, নৈতিক অবক্ষয় এবং ধর্মীয় একঘেয়েমির দিকে ঠেলে দেয়, যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ। তাছাড়া এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি এবং অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ১৭১)

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

অর্থ: "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত ছাড়া কোনো কথা বলো না।"

হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৭৭)

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি দিনে রোযা রাখে সে যেন কোনো রোযাই রাখলো না।" আরো বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯৭৫) "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, প্রতিদিন রোযা রেখো না কারণ তোমার কাছে তোমার স্ত্রী, পরিবার, আত্মীয়- স্বজনদের অধিকার রয়েছে।"

সুতরাং সারা বছর রোযা মানুষকে অসামাজিক করে ফেলে। অতএব এইসব কারণে নবী করীম (ﷺ) সারা বছর রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন: স্ত্রী ঐচ্ছিক রোযা পালন করতে চাইলে তার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- বিবাহ, হাদীস নং ৪১৯২)

অর্থাৎ, "কোনো নারীর উচিত নয় স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঐচ্ছিক রোযা রাখা, যদি তার স্বামী বাড়িতে থাকে।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (মুসনাদ আহমদ, খণ্ড- ২, হাদীস নং ৭৩৪৩) মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, রমযানের রোযা ব্যতীত নারীদের তাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া একটি দিনও রোযা রাখা উচিত নয়, যদি তার স্বামী বাড়িতে থাকে।" অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি নিতে বলা হচ্ছে এ জন্য যে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি না নিয়ে রোযা রাখলে স্বামীর ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। যেমন স্বামী হয়ত চেয়েছিলো যে সে তার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাবে কিংবা অন্য কোনো কর্মসূচি থাকতে পারে। অতএব স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি না নিয়ে রোযা রাখে, তবে সে তার স্বামীকে তার ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে বিরত রাখতে বাধ্য হয় ইত্যাদি। সুতরাং স্ত্রীদের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: যদি কোনো নারী রমযান মাসের কিছু রোযা কাযা করে এবং সে ওই কাযা রোযাগুলো পূরণ করার আগেই যিলহজ্ব মাস এসে গেছে এবং সে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন রোযা রাখতে চায়। তবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনুমতির কথা বলতে গেলে ঐ নারী যিলহজ্ব মাসের রোযা রাখতে পারবে এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখতে পারবে তবে ঐচ্ছিক রোযার চেয়ে ফরজ রোযা আগে আদায় করা অধিক উত্তম। সুতরাং আগে কাযা রোযা তারপর যিলহজ্বের রোযা রাখা

উচিত। তবে সে যদি যিলহজ্বের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

রমযানের ৮ম ও ৯ম শিক্ষা

রোযার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির নায়েক, রোযার প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। আপনি কি 'তাকওয়া' বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আলহামদুলিল্লাহ! তাকওয়া'র ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি এমন একটি সরু পথ দিয়ে হেঁটে যাবেন যার দু'ধার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এপথ দিয়ে আপনি যখন চলবেন তখন আপনার পোশাক চাদর কাঁটায় আটকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এ কণ্টকময় পথে হাঁটার সময় আপনার পোশাক বা চাদরকে কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে আপনার চলার যে প্রচেষ্টা তাকওয়া বিষয়টি সে রকম। অর্থাৎ নানা প্রকার বাধা ডিঙিয়ে সঠিক এবং সুন্দরভাবে চলার প্রচেষ্টা। ভাষাগত দিক দিয়ে 'তাকওয়া' শব্দটি আরবি ভাষার ওয়াকিউন থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো- বেঁচে থাকা ও বিরত থাকা। এর অন্য অর্থ ভয় করাও হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো ভয় করার বিষয়। কোন কিছু হতে বিরত থাকা, রক্ষা করা অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো- আল্লাহভীতি। ইসলামী বিধান মতে তাকওয়া হলো অনুভূতির একটি অবস্থা, আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তির আত্মিক অনুভূতি। প্রভু সম্পর্কে সতর্কতা, আল্লাহকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করা। সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি এবং তাঁর জ্ঞানের পরিধি সে সবসময় সম্পর্কে সতর্কতা। এসব বোধ, অনুভূতি ব্যক্তিকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সৎকাজে ব্রতী করে তুলবে, তাকে ধার্মিক করে তুলবে, এটাই হলো তাকওয়া। তাই মানুষ 'তাকওয়া' কে সংক্ষেপে আল্লাহভীতি হিসেবে অনুবাদ করে থাকে, একে 'আধ্যাত্মিকতা' ও বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে 'তাকওয়া' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা 'আলে ইমরান' এর ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

অর্থাৎ বিশ্বাসীদের অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং তারা ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করবে। তাকওয়ার কতগুলো স্তর রয়েছে; তারমধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' (আল্লাহভীরু) বলা যায় যদিও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বুঝানোর জন্যেও কুরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর হলো যা আসলে কাম্য তা এমন সব বিষয় থেকে বিরত থাকা, যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআনেও হাদীসে তাকওয়ার সে সব ফযিলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে তা এ স্তরের 'তাকওয়া' উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি হলো 'তাকওয়ার' সর্বোচ্চ স্তর, আম্বিয়া আলাইহস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরধিকারী ওলীগণ এস্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তার সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখাই হচ্ছে এ স্তরের বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাকওয়ার হক আদায় করতে বলেছেন, এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, কাতাদাহ ও হাসাব বসরী (র.) বলেন: রাসূল (ﷺ) থেকেও এমন বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করা, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাপকাঠি হলো এই তাকওয়া, তাকওয়ার গুণাবলীতে তার গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়। আল্লাহর নিকট সেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, প্রিয় যার তাকওয়া আছে। অর্থাৎ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হলো তাকওয়া। এ সম্পর্কে "সূরা হুজরাত' এর ১৩ নং আয়াতে বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ: হে মানব, আমি তোমাদেরকে একপুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাকওয়া অর্জনের পথ নির্দেশ করছেন। উদাহরণস্বরূপ- আল্লাহ তাকওয়াকে আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাকওয়া হলো এমন গুণ যার জন্য আমল কবুল হয়। এ সম্পর্কে সূরা 'আহযাব' এর ৭০ এবং ৭১ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ: "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল, তিনি তোমাদের আচরণ সংশোধন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"

সূরা মায়েদার ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করেছিলেন। তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না। সে বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করবো।' অপরজন বলল, 'অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন'।

এখানে বলা হয়েছে- **"আল্লাহ তাদের কর্মই কবুল করবেন যাদের তাকওয়া আছে।"**

অর্থাৎ তাকওয়ার পথ অনুসরণকারীদের কর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

তাকওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়: তাকওয়া হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। যেমন- আল্লাহ বলেন, "তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে যারা তাকওয়াবান, খোদাভীরু।"

সূরা আলে ইমরানের ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: হ্যাঁ কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদিগকে ভালোবাসেন।

'তাকওয়া ক্ষমা লাভের মাধ্যম: তাকওয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে বান্দা ক্ষমা লাভ করে থাকে। তাকওয়াবান বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা 'তালাকের' ৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

অর্থ: "এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাকওয়ার কারণে বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং প্রতিদান দিবেন।

তাকওয়া সরল পথের দিশারী: তাকওয়ার ৪র্থ বৈশিষ্ট হলো- তাকওয়াবানদের আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। তাকওয়াবানদেরকে আল্লাহ সরল পথ দেখান এবং গোমরাহীর পথ থেকে রক্ষা করেন। সূরা আনফালের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, বস্তুত! আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।"

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে ফুরকান দান করবেন। ফুরকান হলো ভালমন্দ বোঝার শক্তি, ভালমন্দ বিবেচনার ক্ষমতা। অনেক আলেমের মতে ফুরকান অর্থ হলো- সিরাতুম মুস্তাকিম তথা আল্লাহর পথ, আবার অন্য আলেমরা মনে করেন ফুরকান হলো- সরল পথ, জান্নাতের পথ। সূরা 'হাদীদ' এর ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদের দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।"

আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদানও তাকওয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ সূরা হজ্বের ৩২ নং আয়াতে বলেন-

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থ: "ইহা আল্লাহর বিধান, কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ ভীতি প্রসূত।"

'সূরা ইউনুস' এর ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

অর্থ: "মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।"

প্রশ্ন: রোযা কিভাবে একজন বান্দাকে জান্নাতে পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তোলে? এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযা যেভাবে একজন বান্দাকে জান্নাতবাসী হওয়ার যোগ্য করে তোলে সে বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরা বাকারা'র ১৮৩ নং আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারো।"

অর্থাৎ এর অর্থ হলো তোমরা রোযার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পার এবং তাকওয়া হলো জান্নাত লাভের মাধ্যম। তিনি সূরা আহযাব এর ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ: "অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী অনুগত ধৈর্যশীল নার, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকার পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অংশ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"

এই আয়াতে আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা বর্ণনা করেছেন।

সহীহ হাদীসে জান্নাত লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসগ্রন্থ 'মুসনাদে আহমদ' এর ১ম খণ্ডের ১৬৬১ নং হাদীসে বলা হয়েছে নামাজ আদায় করবে, রোযা রাখবে, নিজের সম্ভম হেফাজত করবে এবং নিজের স্বামীকে মান্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' তিরমিযী শরীফের দু'আ অধ্যায়ের ৩৫নং হাদীসের বর্ণনা, "একদা মহানবী (ﷺ) মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং তিনবার 'আমীন' বললেন। তখন সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিন তিনবার 'আমীন' বললেন। তখন সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিন তিনবার 'আমীম' বললেন? তখন তিনি জবাবে বললেন, "জিব্রাঈল (আ.) আগমন করে আমাকে বললেন, যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েও তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে

পারলো না সে দু’র্ভাগা, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; তিনি (জিব্রাঈল) আমীন বললেন, সাথে আমিও তিনবার ‘আমীন’ বললাম।”

সহীহ ইবনে হিকাম গ্রন্থের ‘কিতাবুস সিয়াম’ এর ৩৪৩ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (ﷺ) এর নিকট আগমন করলো এবং তাকে বললো আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং মূসা (আ.) এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করি, নামাজ আদায় করি, যাকাত দেই, এবং রমযান মাসের রোযা রাখি, তাহলে আমি কার সঙ্গী হবে? আমার প্রতিদান কী হবে? মহানবী (ﷺ) বললেন, তুমি নবী ও শহীদদের সঙ্গী হবে। অর্থাৎ তুমি জান্নাতে যাবে।

সুনানে তিরমিযী শরীফের ‘কিতাবুল ঈমান’ এর ২৬১৬ নং হাদীসে এসেছে- ‘এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর নিকট এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আমি কী কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবো? রাসূল (ﷺ) জবাবে বললেন, এটা কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ চাইলে তার বান্দার জন্য সহজ করে দিতে পারেন। তাহলো, আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মাসের রোজ পালন করা, যে এগুলো পালন করবে সে অবশ্যই জান্নাতের প্রবেশ করবে। মুসনাদে আহমদ এর ৫ম খণ্ডের ২২২৪৯ নং হাদীস সেটি সুনানে নাসায়ীতেও উল্লেখ আছে সহীহ জামে হাদীস নং ৪০৪৪ ২য় খণ্ড, “হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ) এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কী কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবো? তখন রাসূল (ﷺ) বললেন তুমি রোযা রাখ, এর মতো অন্য কিছু নেই।”

সুতরাং বুঝাতেই পারছেন, রাসূল (ﷺ) রোযাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম আমল হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং আরোও বলেছেন এর মতো অন্য কিছু নেই। সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামর ১৮৯৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, রমযান মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়।” একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ের ১৮৯৬ হাদীসে রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, “জান্নাতের একটি দরজা আছে যার নাম ‘রাইয়ান’, যারা রোযাদার তারাই কেবল এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে, যারা রোযা রাখে না তারা এ দরজা অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ সেদিন বলবেন, কারা রোযাদার ছিলে, তারা দাঁড়াও। তখন রোযাদারগণ দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যারা রোযা রাখে নি তাদেরকে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।”

সুতরাং আপনি যদি জান্নাতবাসী হতে চান তাহলে রোযা পালন করুন, তাহলে আপনিও এই ‘রাইয়ান’ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রশ্ন: রোযার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আলহামদুলিল্লাহ, রোযার অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, আমি কেবল প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য উল্লেখ করবো। সিয়াম সাধনার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন; তাকওয়া হলো আল্লাহভীতি, আল্লাহর উপস্থিতির বিষয়ে সচেতনতা; আল্লাহ যে সর্বদা সর্বজায়গায় সর্বাবস্থায় বিরাজমান সে বিষয়ে ব্যক্তির সজ্ঞান অনুভূতি। আপনি যদি তাকওয়া অর্জন করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন। তাকওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সমান্তরাল; তাই বলা যায় রোযার প্রথম উদ্দেশ্য আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সরাসরি জড়িত, একটি অর্জন করলে অন্যটি অর্জন হয়ে যায়। তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো- জান্নাত লাভ। চতুর্থ উদ্দেশ্য পাপ থেকে বিরত থাকা। পঞ্চম উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। ষষ্ঠ, গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভ, আপনি যদি রোযা পালন করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। ৭ম উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন, হুসনুল খুলুক তথা বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা। আপনি যদি রোযা রাখেন তাহলে আপনি সংযমী হবেন, বিনয়ী হবেন, অনুশোচনা করবেন, সংযমী হওয়া আপনার জন্য ফরজ। ৮ম উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর বিধিনিষেধ সম্পর্কে অবগত হওয়া। নবম হলো- আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি ইচ্ছার উপরে আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া, আধ্যাত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করা। ১০ম উদ্দেশ্য সৎকাজে ব্রতী হওয়া, নিজেকে সৎ কাজে অভ্যস্থ করা। একাদশ উদ্দেশ্য- সততা অর্জন। ১২তম উদ্দেশ্য- আকাঙ্ক্ষা, লোভ- লালসা কমানো। ১৩তম উদ্দেশ্য- রোযা যেহেতু মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ তাই রোযাদার ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। ১৪তম উদ্দেশ্য অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড ও কথা থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্ন: যদি কেউ রোযা পালন করে, তাহলে তার পক্ষে রোযার সবগুলো উদ্দেশ্য কি পূরণ করা সম্ভব?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, যদি কেউ রোযার হুকুমগুলো সঠিকভাবে পালন করে এবং সঠিকভাবে খাছ নিয়তে রোযা পালন করে তাহলে ইনশাআল্লাহ সে রোযার সবগুলো লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে। শুধু রোযা রাখলেই রোযার সবগুলো উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। অর্থাৎ যারা রোযা রাখেন তাদের সবাই রোযার সকল লক্ষ্য অর্জন করতে সামর্থ হন না। কেন? ব্যক্তি যখন কোন কাজ করে তখন তাতে দুটি বিষয় জড়িত থাকে। প্রথমটি হলো- কাজের পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হলো- কাজের উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের খাদ্য গ্রহণ, রোযার সাথে খাদ্য গ্রহণের মিল আছে যেমন- আমরা কেন খাই, এবং কিভাবে খাই, খাওয়ার উদ্দেশ্য কী?

খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা। খাওয়ার পদ্ধতি কী? খাওয়ার পদ্ধতিতে চারটি পর্যায় রয়েছে- ১ম পর্যায়- খাদ্য তৈরি, ২য় পর্যায়- খাদ্য মুখে দেওয়া, ৩য় পর্যায়- তা চিবান অর্থাৎ চিবিয়ে গলর্ধকরণ উপযোগী করা, ৪র্থ পর্যায়ে খাদ্য গলধরণ তথা তা পাকস্থলীতে পৌঁছানো, যেখানে খাবার প্রক্রিয়াজাত হয়ে জীবনীশক্তি সরবরাহ করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় পুষ্টি যোগায়। এগুলো হলো খাওয়ার কর্মপদ্ধতি; কিন্তু খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো জীবন ধারণ, স্বাস্থ্য রক্ষা। কার্যপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে যদি মিল না থাকে, সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে কাজের উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ- কোনো একজন ‘পুষ্টিহীন খাবার নিলো, খাওয়ার জন্য তৈরি করলো, মুখে দিলো, চিবিয়ে পিষলো, অতঃপর গলধরণ করলো, আপনার কি মনে হয় তার খাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তার জীবনী শক্তির জন্য পুষ্টি যোগান হবে? না, কেবল একাজ গুলো দিয়েই তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা খাবার অবশ্যই স্বাস্থ্যকর হতে হবে।

এভাবে আপনি যদি স্বাস্থ্যকর খাবার খান এবং খাওয়ার পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করলেন তাহলে আপনার খাওয়ার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। কিন্তু আমি যদি আবার বলি, কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই খেল কিন্তু খাওয়ার পর সে গলায় আঙ্গুল দিয়ে সব খাবার বমি করে ফেলে দিলো তাহলে কি তার খাওয়ার লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব নয়। একইভাবে রোযা পালন ও তার উদ্দেশ্যের সাথে মিল না থাকলে রোযার সকল উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। রোযা পালন করতে হলে যা করতে হয় তা হলো- সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার এবং যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে হয়, এসব কাজের সাথে আরো কিছু কাজ যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যার মধ্যে অন্যতম হলো অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, খাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন খাওয়ার পর বমি করলে খাওয়ার উদ্দেশ্য অর্জন হয় না, রোযার ক্ষেত্রেও তেমনই। বিষয়টি আরও সহজে বুঝার জন্য অন্য একটি উদাহরণ দেই, একজন লোক গ্রাম থেকে শহরে এলো তার ইচ্ছা আমেরিকা যাওয়া। আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রধান কাজ হলো প্লেনের টিকিট নিয়ে প্লেনে চড়া, টিকিট কাটা যেহেতু সহজ তাই লোকটি টিকিট কিনে এয়ারপোর্ট গেল, তখন ইমগ্রেশণ তাকে বললো- পাসপোর্ট কোথায়? উত্তরে সে বললো পাসপোর্ট আবার কী? তখন সে ফিরে গিয়ে ইমিগ্রেশন জানতে চাইলো তার ইমিগ্রেশন আছি কিনা? সে আবারও বললো এটা আবার কী? তার প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করলো কিন্তু ভিসা পেল না, তাহলে সে আমেরিকা যেতে পারবে না।

অবশেষ ভিসাসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় সবই সংগ্রহ করলো, আমেরিকা যাওয়ার মূল কাজ হলো টিকিট কেটে প্লেনে চড়া, কিন্তু এর সাথে আরো কিছু পূর্বশর্ত হলো- পাসপোর্ট, ভিসা, ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি। পাসপোর্ট ভিসা, ছাড়া অন্য দেশে যাতায়াত করা যায় না।

সুতরাং এসব পাওয়ার জন্য এ বিষয়ে অবশ্যই স্থান থাকতে হবে। আমেরিকা ভ্রমণের আসল কাজ হলো মুম্বাই টু আমেরিকা (USA) টিকিট কেনা, একই ভাবে কাজের সাথে ব্যক্তি উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকতে পারে।

এখন বললো, ঐ ব্যক্তি আমেরিকা গেল কিন্তু কি উদ্দেশ্যে গেল? সে USA বিভিন্ন কারণে যেতে পারে। যেহেতু আমেরিকা পড়াশুনার জন্য খুবই উন্নত তাই সে পড়ালেখার জন্য যেতে পারে। আবার সে ভ্রমণের উদ্দেশ্য তথা দেশ দেখার জন্য যেতে পারে, সে মাদক চোরাচালানের জন্যও যেতে পারে। আসল বিষয় হলো তার উদ্দেশ্য। একজন লোক আমেরিকাতে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য বা চোরাচালানের জন্য বা মদ্য পানের জন্য বা পড়ালেখার জন্য যেতে পারে। সুতরাং তার উদ্দেশ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে মুসলমানে রোযা রাখার উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোযা পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন, জান্নাত লাভ, পাপ থেকে বিরত থাকা। কিন্তু অনেকে আছেন যারা রোযা রাখে দেখাদেখি, ইচ্ছা মাফিক, তারা রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন, পাপ থেকে বিরত থাকা, ক্ষমা লাভ এসব অর্জন করতে পারে না। আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্তির ভিন্ন হতে পারে ঠিক রোযা রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির ভিন্ন হতে পারে বুঝতেই পারছেন, রোযা বা কাজে উদ্দেশ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোযার সকল উদ্দেশ্য অর্জন করতে গেলে রোযার সাথে জড়িত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আর যদি তা না করা হয় তাহলে তার কোনো উদ্দেশ্যই সফল হবে না। এ বিষয়ে মহানবী (ﷺ) এ বলেছেন-

"অনেক লোক আছে যারা রোযা রাখে, কিন্তু ক্ষুধা পিপাসা কষ্ট ছাড়া তাদের কোনো প্রতিদান নেই। অনেকে নামাজে দাঁড়ায় তাদের জন্য নির্ঘুম জেগে থাকা ছাড়া কোনা প্রতিদান নেই।"

প্রশ্ন: সিয়াম সাধনায় খাদ্য, পানীয় ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, রোযার আসল উদ্দেশ্য কী তা বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি এক বাক্যে বলতে হয় তাহলে বলবো রোযার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালন। আপনি যদি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ও তার রাসূলের এ নির্দেশ পালন করেন তাহলে অন্যান্য সকল নির্দেশ পালন করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশা- আল্লাহ। বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি, তাতে রোযা পালনে সে কাজগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে তা ৩২টি এবং যা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তা ২৯টি যা পূর্বে আলোচনা করেছি। এই ৬১টি পয়েন্ট- এর মধ্যে কিছু পয়েন্ট কে হাইলাইট করার জন্য পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করেছি। রোযার উদ্দেশ্য বিষয়ে সহীহ বুখারীর কিতাবুস সিয়ামের ১৯০১ নং হাদীস এর বর্ণনা, রাসূল

(ﷺ) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কেবল আল্লাহর জন্যই রোযা পালন করে এবং সন্তুষ্টি, প্রতিদান পাওয়ার জন্য তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তাই রোযা আল্লাহর জন্য এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন, প্রতিদান লাভ হলো রোযা পালনের আসল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে একই গ্রন্থের ১৮৯৪ নং হাদীসে আরো এসেছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, "রোযা হলো ঢাল স্বরূপ।" একই গ্রন্থের ১৯০৪ নং হাদীসে আরো হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, রোযা হলো ঢালস্বরূপ, তুমি যদি রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাকে পাপ থেকে রক্ষা করবে এবং পাপ থেকে বিরত রাখবে।"

১৯০৩ নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) আরো বলেন- "যে ব্যক্তি রোযা রেখে পাপ কাজ এবং অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকতে পারলো না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার থেকে বিরত থাকা কোন দরকার নেই।"

এই হাদীসে দু প্রধান অপছন্দনীয় তথা রোযাকে অর্থহীন, মূল্যহীন করার মত দুটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত- অপ্রয়োজনীয় অশ্লীল কথা,
দ্বিতীয়- অপ্রয়োজনীয় অশালীন কার্যকলাপ।
১ম- টি তথা অপ্রয়োজনীয় অশ্লীল কথা সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন: এবারের প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, "রোযা হলো আমার জন্য, আর এর প্রতিদান হলো আমি নিজেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: উল্লিখিত হাদীসে কুদসীর ব্যাখ্যার অনেকগুলো সহীহ হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। যেগুলোতে রাসূল (ﷺ) এর ব্যাখ্যা করেছেন, তাহলো সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ১৮৯৪, ১৯০৪ নং হাদীস উল্লেখযোগ্য- রাসূল (ﷺ) বলেন- "বনী আদমের সব কাজই তার জন্য, কেবল রোযা ব্যতীত।"

এর অর্থ হলো অন্যসব কাজ যেমন তা নামাজ যাকাত হজ্জ ইত্যাদি সব লোক দেখানো তথা রিয়ার জন্য করা হতে পারে। কিন্তু রোযা হলো এমন কাজ যা পালন করতে গিয়ে গোপনে বা আড়ালে গিয়ে খাওয়া দাওয়া বা পানাহার করে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে কিন্তু যে প্রকৃতই রোযা পালন করে তা কেবল আল্লাহর জন্যই করে থাকে। তাই আল্লাহ বলেছেন আদম সন্তানের সব কাজেই তার নিজের জন্য কেবল রোযা আমার জন্য। এ বিষয়ে অন্য একটি হাদীস যা "সুনানে নাসাঈ" এর কিতাবুস সিয়ামের ২২২৩নং হাদীসে এসেছে, "রাসূল (ﷺ) এর একজন সাহাবী

হযরত আবু উমামা (রা.) মহানবী (ﷺ) এর নিকট এলেন এবং তার নিকট আরজ করলেন, আমাকে এমন কোনো আমলের বিষয়ে বলবেন, যা করলে আল্লাহ কবুল করবেন। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি রোযা রাখো।"

সহীহ মুসলিম- এর কিতাবুস সিয়াম এর ২৫৬৭ নং হাদীসে এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন- বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য রোযা ব্যতীত। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান। বনী আদমের প্রতিটি আমলের সওয়াব বাড়ানো হয়, এক নেকীর সওয়াব দশগুণ থেকে সাতাশোগুণ পর্যন্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: রোযা ব্যতীত (রোযার সওয়াবের কোন সীমা নেই)। কারণ রোযা হচ্ছে আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দিব।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, হাদীসে রোযাকে 'ঢাল' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আপনি এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করবেন যে কেন তা ঢাল হিসেবে বর্ণনা করা হলো?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নবী করীম (ﷺ) এর একটি হাদীস যা সহীহ বুখারী এর কিতাবুস সিয়াম এর ১৮৯৪ নং হাদীসে এসেছে যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেন- "রোযা হচ্ছে (গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার) ঢালস্বরূপ।" একই কথা তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন - "রোযা হলো তোমাদের জন্য ঢালস্বরূপ, কেননা রোযা তোমাদেরকে পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।" যে কারণে প্রিয় নবী (ﷺ) রোযাকে ঢাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

যখন কোনো ব্যক্তি খায় এবং তার পেট ভর্তি থাকে তখন সে অন্য কোন কাজ করার চিন্তা করতে পারে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তখন সে অন্য কোনো হারাম কাজের বিষয়ে চিন্তা সহজে করতে পারে না, আপনিই বলুন, আপনি কি প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে সিনেমা দেখতে পারবেন? গান শুনতে পারবেন? তাই ক্ষুধা পাপ থেকে বিরত রাখে, এ কারণে নবী করীম (ﷺ) রোযাকে ঢাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। নবী করীম (ﷺ) সহীহ বুখারী এর কিতাবুল জিহাদের ২৮৪০ নং হাদীসে বলেন- "কোনো ব্যক্তি যদি এক দিনের জন্য রোযা রাখে তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ দিনের দূরত্বে রাখবেন। তিরমিযী এর কিতাবুল জিহাদ- এর ১৬২৪ নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) আরও বলেন- কোনো ব্যক্তি যদি একদিনের জন্য রোযা রাখে তার এবং জাহান্নামের মধ্যে ব্যবধান হবে ৭০ বছর।

কারণ রোযা খারাপ কাজ, খারাপ চিন্তা, বাজে কথা থেকে বিরত রাখে। মনকে কুচিন্তা থেকে বিরত রাখে এজন্য রোযাকে ঢাল হিসেবে বলা হয়েছে। আমি একটি উদাহরণ দিই। সহীহ

বুখারী, কিতাবুস সিয়াম এর ১৯০৫ নং হাদীসের বর্ণনা, নবী করীম (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদের বিবাহ করা উচিৎ, আর যদি বিবাহ করার সামর্থ না থাকে তাহলে সে যেন রোযা রাখে।

প্রকৃতপক্ষে রোযা মানুষকে বাজে চিন্তা থেকে, কু প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, আপনি যখন প্রকৃতই ক্ষুধার্ত থাকবেন তখন অন্যায় কাজ করার চিন্তা করতে পারবেন না। এজন্য মহানবী (ﷺ) রোযাকে ঢাল বলেছেন।

প্রশ্ন: সাহরি এবং ইফতার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাহরি শব্দটি আরবি সাহরুন থেকে এসেছে। যার অর্থ- রাতের শেষ ভাগ, এবং এর বিপরীত শব্দ হলো ইশার। সুহুর শব্দের পারিভাষিক অর্থ- সুবহে সাদেকের পূর্বে খাবার গ্রহণ। আরবি শব্দ সুহর আরো যে অর্থ প্রকাশ করে তা হলো রোযার রাখার জন্য সুবহে সাদেকের পূর্বে খাবার গ্রহণ, অর্থাৎ সাহরি খাওয়া ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি।

একই ভাবেই ইফতার আরবি শব্দ ফাতর থেকে এসেছে, শাব্দিক অর্থ ভঙ্গ করা, ছিঁড়ে ফেলা, ছিন্ন করা, আর ফিতর হলো- এমন খাবার যা দ্বারা রোযা ছাড়া হয়। পারিভাষিক অর্থে ইফতার অর্থ হলো- রোযা ছাড়ার জন্য খাদ্য খাওয়া।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, সুবহে সাদেকের পূর্বে সাহরি খাওয়ার ফযিলত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: "নবী (ﷺ) বলেন, সাহরি খাও, কারণ সাহরির মধ্যে বরকত রয়েছে। (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং ১৯২৩)

অত্র হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সাহরি হলো রাতের শেষ ভাগের সুবহে সাদিকের পূর্বের খাবার গ্রহণ এবং তা রহমত স্বরূপ। সহীহ মুসলিম এর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ২৪১৩ নং হাদীসে এসেছে, "রাসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সুবহে সাদেকের পূর্বে সাহরি গ্রহণ।" অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পূর্ব মুহূর্তে সাহরি খাওয়া হলো আহলে কিতাব (অমুসলিম) ও মুসলমানদের মধ্যে রোযার পার্থক্যের নির্দশন। সিলসিলা আল সহিহাহ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০৪৫ নং হাদীসে আরো উল্লেখ আছে মহানবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহর বরকত তিনটি জিনিসের উপর পতিত হতে থাকে। প্রথমটি

হলো, যাকাত, দ্বিতীয়টি হলো আত্ততারিদ, তৃতীয়টি হলো সাহরি তথা সুবহে সাদেকের পূর্বে আহার গ্রহণ।”

একই গ্রন্থের অন্য হাদীস, হাদীস নং ১২৯১, আরো উল্লেখ আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, রহমত বরকত শুধু দুটি বিষয়ের জন্য, প্রথম হলো সাহরি ২য়টি হলো- ওজনে সঠিক পরিমাপ। আরো অনেকগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোতে নবী করীম (ﷺ) খাওয়ার ফযিলত সম্পর্কে বলেছেন এবং সাহরি খাওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। সহীহ “আল জামে” এর ১ম খণ্ডের ৩৬৮৩ নং হাদীসে এসেছে, একজন সাহাবী রাসূল (ﷺ)- কে সাহরির ফযিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন প্রিয় নবী (রা.) তাকে বললেন, সাহরিতে অনেক বরকত রয়েছে, সুতরাং তোমরা তা বাদ দিও না। মুসনাদে আহমদ এর ১৭তম খণ্ডের ১১০৮৬ নং হাদীসে আরো বলা হয়েছে। “রাসূল (ﷺ) বলেন, সাহরি হলো রহমতস্বরূপ, তাই তোমরা তা বাদ দিও না। অন্তত এক গ্লাস পানি দিয়ে হলেও সাহরি করো। কেননা যে ব্যক্তি সেহরি খায় আল্লাহ তাকে নিজ, হাতে রহমত দান করেন। একই কথা সুনানে আবূ দাউদ, এক ২য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ২৩৩৭ নং হাদীসে এসেছে, “একজন লোক সাহরির সময় মহানবী (ﷺ)- এর নিকট আসলে তখন নবী (ﷺ) তাকে বললেন, সাহরি খাও, কেননা সাহরি হলো আল্লাহর রহমতস্বরূপ, সাহরির সময়টা হলো বরকতময়।

পূর্বের অনেকগুলো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সাহরি হলো উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, বিশেষ নিয়ামত, প্রিয়নবী (ﷺ) কখনো সাহরি ত্যাগ করেন নি। তাই মুসলমানদের উচিৎ রোযা রাখলে অবশ্যই সাহরি খাওয়া এবং এ বিশেষ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হওয়া।

রমযানের ১০ম শিক্ষা

সুন্নাত ও সুন্নাতের গুরুত্ব

প্রশ্ন: সুন্নাত বলতে কি বোঝায় এবং সুন্নাত কত প্রকার?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সুন্নাত শব্দের অর্থ- পথ, রীতি। মহানবী (ﷺ)- এর সুন্নাত বলতে বোঝায় মুহাম্মদ (ﷺ)- এর রীতি। সুন্নাত বলতে তাঁর কাজ, কথা এবং মৌন সম্মতিকে

বোঝায় এবং এগুলো তার জীবনের শেষ ২৩ বছরের। মহানবীর সুন্নাত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সুন্নাতে কাওলি (মহানবীর কথা),
২. সুন্নাতে ফেলি (কাজ) ও
৩. সুন্নাতে তাকরিরি (অনুমোদন)।

প্রশ্ন: আপনি বিভিন্ন প্রকার সুন্নাতের উদাহরণ দেবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, অবশ্যই। কাওলি সুন্নাতের উদাহরণ হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১) **"নামাজ পড় সেভাবে, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।"** এটা তার নির্দেশ এবং এটা তার মুখনিঃসৃত নির্দেশ যেটা প্রত্যেক মুসলমানকে অনুসরণ করতে হবে। ফে'লি সুন্নাতের উদাহরণ হলো- হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৬) **"যখন আমি মুহাম্মদ (ﷺ)- কে নামাজ পড়তে দেখতান, তিনি কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঁচু করতেন তারপর তাকবীর বলতেন এবং আবারও এমনটি করতেন, তারপর রুকুতে যেতেন তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন- "সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা।"** সুতরাং এটা হলো মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কাজ। তাকরিরি সুন্নাতের উদাহরণ, যেমন- (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ১২৬২) **"একদা মুহাম্মদ (ﷺ) জামাআতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন; নামাজ শেষ হওয়ার পরে এক লোককে তিনি দুই রাকাআত নামাজ পড়তে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি ফজরের পরে দু'রাকাআত নামাজ আদায় করলে কেন? লোকটি বললো, ফজরের পূর্বে আমি দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করতে পারি নি সেই কারণে ফজরের পরে আদায় করলাম, এ কথা শুনে মুহাম্মদ (ﷺ) নীরব থাকলেন।"**

যেহেতু তিনি নীরব থাকলেন তাই এটা নির্দেশ করে যে, এটাকে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন।

এই তিন প্রকার সুন্নাতের মধ্যে কাওলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো তাঁর নির্দেশ এবং তারপরে দ্বিতীয় তৃতীয় যথাক্রমে- ফে'লি, তাকরিরি সুন্নাত।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সুন্নাতের গুরুত্ব কতখানি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সুন্নাত ইসলামের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। প্রথমটি কুরআন আর দ্বিতীয়টি সুন্নাত। সুন্নাতের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৫৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের..............।" আয়াতে "আতিয়ু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ মান্য করা। আতিয়ুল্লাহ অর্থ আল্লাহকে মান্য করা এবং আতিয়ুর রাসূল অর্থ রাসূলকে মান্য করা। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করতে বলা হয়েছে। যখন আলেমদের ভেতর মতানৈক্য তৈরি হয় তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মানতে বলা হয়েছে। আল্লাহকে মান্য করা অর্থ কুরআন মান্য করা আর রাসূলকে মান্য করা অর্থ তার সুন্নাতগুলো মান্য করা। আবার এই দুটি উৎসিই ভিন্ন ভিন্ন। কুরআন ভিন্ন এবং হাদীসও ভিন্ন উৎস। তাই দুটি উৎসকেই সমান ভাবে অনুসরণ করতে হবে। কুরআনে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করা সকল বিশ্বাসীদের জন্য ফরজ, এটা শুধু সাহাবিদের জন্য নয়। কুরআনের উল্লেখ আছে যে, (সূরা- জ্বিন, আয়াত- ২৩)

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- (সূরা- মুহাম্মদ, আয়াত- ৩৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রাসূল (ﷺ)- এর আনুগত্য করো।"

আসলে আল্লাহর রাসূলকে বিশ্বাস করাই হলো আল্লাহকে মান্য করা।

কুরআনে বলা হয়েছে (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৮০)

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অর্থ: "যে রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো।"

হাদীসে বলা হয়েছে (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫১৮)

"যদি তুমি আমাকে মান্য করো { রাসূল (ﷺ)} তবে আল্লাহকে মান্য করলে আর যদি আমাকে অমান্য করো তবে আল্লাহকে অমান্য করলে।"

আল্লাহ বলেন, (সূরা- নাজম, আয়াত- ৩, ৪)

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থ: "এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না। কুরআন ওহী যা প্রত্যাদেশ হয়।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০) **"মুমিনদের ভিতরে কিছুলোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছুলোক বঞ্চিত হবে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা আমাকে মান্য করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমাকে মান্য করেনি তারা জান্নাতে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে।"**

কুরআনে বলা হয়েছে, যদি তোমরা রাসূলকে মান্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ৩১, ৩২)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

অর্থ: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে করো যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন।" "বলুন আল্লাহ ও তার রাসূলে আনুগত্য প্রকাশ করো।"

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত পালনে অনিহা প্রকাশ করে তার মৃত্যুর পর শাস্তি হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আপনাকে কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হতে হবে। তাহলো, মুসলমানদের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কিত বিষয় যেগুলো দুইভাগে বিভক্ত: **১. হালাল ও ২. হারাম।**

হালাল হলো অনুমোদিত কার্যাবলি আর হারাম হলো নিষিদ্ধ কার্যাবলি। আবার হালাল কার্যাবলি চার ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হলো:

১. ফরজ, ২. মুস্তাহাব (উৎসাহিত করা হয়েছে), ৩. মুবাহ (ঐচ্ছিক) ও ৪. মাকরূহ (নিরুৎসাহিত করা হয়েছে)।

এই হলো মোট পাঁচ প্রকারের কার্যাবলি। যদি কেউ ফরজ কাজগুলো করে তবে সে সওয়াব পাবে আর না করলে শাস্তি পাবে। মুস্তাহাব কাজ করলে সওয়াব পাবে তবে না করলে শাস্তি পাবে না। মুবাহ কাজগুলো করলে কোন সওয়াব বা শাস্তি নেই। এটা শর্ত নিরপেক্ষ। মাকরূহ কাজের ক্ষেত্রে যদি কেউ এই কাজ হতে বিরত থাকে তবে সে সওয়াব পাবে। কিন্তু করলে শাস্তি নেই। হারামের ক্ষেত্রে, কেউ যদি হারাম থেকে বিরত থাকে তবে সে সওয়াব পাবে আর হারাম গ্রহণ করলে শাস্তি পাবে। এগুলো হলো পাঁচটি শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। প্রশ্ন অনুযায়ী সুন্নাত দুই প্রকার-

প্রথমত, সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হলো কথা, কাজ এবং মৌনসম্মতি। এই সুন্নাতগুলো চার প্রকার কাজের যেকোনো একটি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ফরজ কাজের আওতায় পড়ে এমন সুন্নাত হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) ফজরের নামাজ জোহরের নামাজ এমনকি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতেন। সুতরাং এটি তার কাজ ছিলো। তার এই কাজটি ফরজের অন্তর্ভুক্ত এবং একই মানে সুন্নাত, মুস্তাহাব সুন্নাতের উদাহরণ হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) ফজরের নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু এটা মুস্তাহাব। মুবাহ সুন্নাতের উদাহরণ হলো- মুহাম্মদ (ﷺ) লম্বা পরিচ্ছদ পরিধান করতেন এবং এরকম পরিধান করা ঐচ্ছিক ছিলো। সুতরাং কেউ এরকম পোশাক পরতেও পারে, নাও পারে। মাকরূহ সুন্নাতের উদাহরণ হলো- মহানবী (ﷺ) বলেছেন, দাড়ানো অবস্থায় পান করো না। সুতরাং দাড়ানো অবস্থায় পান করা মাকরূহ কিন্তু সঠিক পন্থা হলো বসে পানি পান করা এবং এরূপ করা মুস্তাহাব। কিন্তু একটি হাদীস বলে যে, মহানবী (ﷺ) দাড়িয়ে পান করেছেন। হয়ত বা কোনো কারণ বা অসুবিধা ছিলো, সুতরাং দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। বসে পান করা মুস্তাহাব। তবে প্রয়োজনে মুহাম্মদ (ﷺ) ও মাঝে মাঝে মাকরূহ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি বসে পান করেছেন। তবে এরূপ মাকরূহের জন্য কোন শাস্তি নেই। এ ধরনের সুন্নাতকে লুগুয়ি সুন্নাত বলে।

দ্বিতীয়ত, ফিকহী সুন্নাত, এটা মূলত মুস্তাহাবের দ্বিতীয় পর্যায়। ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত নামাজ, বসে পানি পান করা ইত্যাদি হলো ফিকহী সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। যখন লোকজন বলে যে মুহাম্মদ (ﷺ) ফজর, আছর ইত্যাদি নামাজের আগে দুরাকাআত নামাজ আদায় করতেন এবং

মূলত তারাও তাই করে, তবে সেটা মুস্তাহাবের আওতায় পতিত হয়। সুতরাং ফিকহী সুন্নাত হলো মুস্তাহাব। মুস্তাহাব দুই প্রকার: **১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও ২. গাইরে মুয়াক্কাদাহ।**

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফজরের নামাজের আগের দু'রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কেউ যদি ফিকহী সুন্নাত পালন করে তবে সে সওয়াব পাবে আর সে যদি মুয়াক্কাদাহ পালন করে তবে আরো বেশি পুরস্কার পাবে। কিন্তু কেউ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা করে এগুলো পালন না করে তবে এর জন্য কোনো শাস্তি হবে না। তবে তার মানে এই নয় যে এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ মানুষ হিসাবে আমাদের বিভিন্ন ভুল হয়। তাই আমরা যদি সুন্নাত পালন করি তাহল সওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং এই বাড়তি সওয়াব আমাদের দ্বারা কৃত পাপের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সহযোগিতা করতে পারে। তাই যত বেশি সম্ভব সুন্নাত পালন করা উচিত।

প্রশ্ন: দাঁড়ি রাখা সুন্নাত না কি ফরজ? যে শেভ করে তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দাঁড়ি রাখা সুন্নাত না কি ফরজ? এ ব্যাপারে আমার ধারণা হলো এটি ফিকহী সুন্নাহ। অধিকাংশ আলেম বলেন যে, দাঁড়ি রাখা ফরজ। কুরআনে এ রকম কোনো আয়াত নেই যেখানে বলা আছে যে, দাঁড়ি রাখা ফরজ নাকি ফরজ নয়। তবে **সূরা ত্বাহা'র ৯৪ নম্বর আয়াতে** বর্ণিত আছে যে,

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

অর্থ: "তিনি বললেন, হে আমার জননী তনয় আমার দাঁড়ি ও মাথার চুল ধরে আর্কষণ করো না ......।"

এই আয়াত এটা নির্দেশ করে যে, হারুন (আ.)- এর নিকট থেকে আমরা জেনেছি যে সকল নবী রাসূলেরই দাঁড়ি ছিলো, সাহাবিদের দাঁড়ি ছিলো। দাঁড়ি রাখা ফরজ কিনা সে ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২) ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, মুশরিকরা যা করে তোমরা তার উল্টাটা করো। তিনি দাঁড়ি রাখতেন এবং মোচ খাট রাখতেন।"** এই হাদীস এবং আরো অন্যান্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে আলেমরা বলেন যে, দাঁড়ি রাখা ফরজ এবং তা মুণ্ডন করা হারাম। তবে অত্যন্ত অল্প কয়েকজন আলেম আছেন যারা বলেন, দাঁড়ি রাখা মুস্তাহাব এবং শেভ করা মাকরূহ, কিন্তু বর্তমানে শেখ আবু জহরা, শেখ হক, কারযাবিদের মত আলেম এবং আমেরিকার মুসলিম কাউন্সিল বলে যে, দাঁড়ি

রাখা ফরজ নয় বরং মুস্তাহাব। সুতরাং অধিকাংশ আলেমদের মতে দাঁড়ি রাখা ফরজ এবং শেভ করা হারাম।

প্রশ্ন: দাঁড়ির দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী? এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) কি করতেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদ তথা আলেমদের ভিতরে মতানৈক্য দেখা যায়। একদল আলেম বলেন, যেহেতু হাদীসে বলা হয়েছে যে **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২)** মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **"মুশরিকরা যা করে তোমরা তার উল্টাটা করো এবং তিনি দাঁড়ি রাখতেন আর মোচ খাটো করতেন।"** এবং **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯৩)" "মোচ খাটো রাখ আর দাঁড়ি রাখ।"** সুতরাং মোচ খাটো রাখা আর দাঁড়িকে তার ইচ্ছেমত বড় হতে দিতে হবে। স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু এরকম কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে না, যেখানে মুহাম্মদ (ﷺ)- এর দাঁড়ির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শেখ হুতাইমির মতে, তিনি বলেন, আমরা হাদীস থেকে বুঝতে পারি যে দাঁড়ি রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং এটা স্পর্শও করা যাবে না, শেভ করা হারাম এবং সাইজ করা মাকরূহ। অন্যরা বলেন, দাঁড়ির দৈর্ঘ্য এক মুঠ পরিমাণ হওয়া উচিত। তবে এটা আগেই বলা হয়েছে যে, দাঁড়ির দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সহীহ হাদীস নেই। কি একটা হাদীসে বলা হয়েছে যেটি **যঈফ হাদীস**, সেখানে উল্লেখ আছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ)- এর দাঁড়ি তাঁর বক্ষ মোবারক স্পর্শ করত।"**

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭৮৯) "যাবির বিন সামুরা বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ)- এর ঘন নিবিড় দাঁড়ি ছিলো"** অনেক হাদীস আছে যেখানে এরকম বলা হয়েছে কিন্তু দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি। একদল আলেম বলেন, যেহেতু দৈর্ঘ্যের ব্যাপার উল্লেখ নেই তাহলে কি করা উচিত? সাহাবিদের দাঁড়িকে অনুসরণ করা যেতে পারে। যখন আমরা সাহাবিদের দিকে লক্ষ্য করি তখন দশটির বেশি এমন হাদীস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, সাহাবিরা এক মুঠো পরিমাণ দাঁড়ি রাখতেন এবং যখন তা এক মুঠোর নিচে নেমে যেতো তখন তারা তা কেটে ফেলতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা আরো অনেকেই যারা মহানবী (ﷺ)- এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়জন ছিলেন।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯২) "ইবনে ওমর (রা.) বলেন তিনি যখন হজ্ব এবং ওমরা পালন করার প্রস্তুতি নিতেন তখন একমুঠোর নিচের দাঁড়ি কেটে ফেলতেন।"** শেখ নাসিরউদ্দীন আলবানি (রহ.) বলেন, দাঁড়ির দৈর্ঘ্য এক মুঠো পরিমাণ হওয়া উচিত; কারণ যখন আমরা কোনো সমস্যার সমাধান মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কর্মকাণ্ড তথা তার হাদীসে খুঁজে না পাই তখন আমরা সাহাবিদের কর্মকাণ্ড দেখতে পারি এবং দশটিরও বেশি

হাদীসে সাহাবীদের দাঁড়ির দৈর্ঘ্য এক মুঠোর কথা বলা হয়েছে, যদি এমন একটিও হাদীস থাকতো যেটি বলতো যে দাঁড়ি কেটো না তাহলে ব্যাপারটি অন্য রকম হতো কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ নেই। এ কারণে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি এক মুঠোর নিচের দাঁড়ি কেটে ফেলতে বলেছেন অন্যথায় অতিরিক্ত লম্বা দাঁড়ি রাখা মাকরূহ হবে। এটা অনেক শক্তিশালী ফতোয়া এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এই মতের সাথে একমত। কারণ তিনি সাহাবি, ইমাম মালিক, হাম্বলি এবং অন্যান্যদেরকে উদাহরণ দিয়েছেন।

প্রশ্ন: টুপি পরিধান করা কি সুন্নাত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: টুপি পরিধান করা সুন্নাত, মুস্তাহাব। অনেক হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) সব সময় টুপি পরতেন এবং তাঁর সাহাবিরাও। বর্ণিত আছে যে, **(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৪৮) "মক্কা বিজয়ের দিনে মুহাম্মদ (ﷺ) কালোচাদর পরিধান করেছিলেন।"** ইবনে ওমর (রা.) বলেন, মহানবী (ﷺ) সাদা টুপি পরতেন; তাবারানি অনুযায়ী ইমাম সুয়ুতি বলেন, **(সিরাজ আল মুনির, ১১২) "মুহাম্মদ (ﷺ) সাদা টুপি পরতেন।"** আরেক হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮০২) "আনাস বিন মালিক (রা.) সাদা টুপি দিয়ে তরা মাথা ঢেকে রাখতেন।"** যখন মুজতাহিদ এবং আলেমগণ একমত যে টুপি পরা মুস্তাহাব এবং চার ইমামের সকলেই বলেন যে, নামাজ পড়ার সময় টুপি পরিধান করা মুস্তাহাব এবং পরিধান না করা মাকরূহ; সুতরাং টুপি পরিধান করা মুস্তাহাব। কারণ এটা মুহাম্মদ (ﷺ) এর দ্বারা কৃত।

প্রশ্ন: দাড়ি রাখা এবং টুপি পরার পেছনে যৌক্তিক কারণ বলতে পারবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রধান কারণ হলো এটা মুহাম্মদ (ﷺ) করতে বলেছেন। কিন্তু এটা করার যৌক্তিকতা কী? যখন আমরা কোনো কনফারেন্সে যাই তখন দেখা যায় যে সেখানে মেহমানদের বিভিন্ন লেবেল থাকে যেটি তার অনানুষ্ঠানিক পরিচয়। যদি কেউ স্পেশালিস্ট ডাক্তাদের কনফারেন্সে যায় তবে দেখা যাবে তাদের লেবেলে লেখা থাকে যে কার্ডিওলোজিস্ট, নিউরোলজিস্ট ইত্যাদি। একইভাবে টুপি পরিধান হলো এক ধরনের পরিচয় যেটা দেখে মুসলমান বলে চেনা যায়। কুরআনে বলা হয়েছে যে, **(সূরা- আনআম, আয়াত নং ৫৪)**

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

অর্থ: "আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।"

সুতরাং এটা মুসলমানকে চেনার একটি ভাল উপায়, উদাহরণ দেওয়া যায় যে মুম্বাই শহরের সুলতান নামের একজন ফল বিক্রেতার নিকট একজন ভদ্র ধার্মিক মুসলিম ব্যক্তি কেনাকাটা করতে গেলেন এবং তিনি হকারক জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমাকে সালাম করলে না কেনো? সে বললো, চাচা আমি মনে করেছি আপনি হিন্দু। এটা কি ভাবা যায়, যে ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক তাকে কিনা হিন্দু ভেবে বসে আছে। এর কারণ হলো ঐ ভদ্র ব্যক্তির মুখে দাড়ি ছিলো না। মুম্বাই শহরে লোকেরা সাধারনত ঐ ড্রাইভারের টাক্সিতে উঠে যার মুখে দাড়ি থাকে এবং ঐ ব্যক্তির দোকানে কেনাকাটা করে যার দাড়ি আছে। সুতরাং আমাদের দাড়ি রাখা উচিত।

প্রশ্ন: খাওয়া, অভ্যর্থনা এবং মহৎ কাজের ক্ষেত্রে কেনো শুধু ডান হাত ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাম হাত পছন্দ করা হয় না ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এটা মুস্তাহাব, মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া, পান করা, মুসাফাহ ইত্যাদি ডান হাত দিয়ে করতে হবে। পায়জামা পরিধান, হাটাচলা করতে প্রথমে ডান পা ব্যবহার করতে হবে। একইভাবে অযু করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে প্রবেশ করাতে হবে। নখ কাটা এমন কি টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিতে হবে এবং চোখে সুরমা মাখা ও মিসওয়াক করার সময়ও ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। এগুলো সুন্নাত। আর যে সব কাজ অসম্মানজনক সেক্ষেত্রে বাম দিক ব্যবহার করতে হবে। যেমন- জামা খোলা, মসজিদ ত্যাগ করা, টয়লেটে প্রবেশ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাম হাত এবং বাম পা ব্যবহার করতে হবে। শরীর পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও বাম হাত ব্যবহার করতে হবে। নাক পরিষ্কার করতেও তাই করতে হবে। এসব ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, যেমন- (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬) **"রাসূল (ﷺ) তরুন বালকদের বলেছেন যে, খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাত দিয়ে খাও এবং প্রথমে সেটি খাও যেটি তোমার ডান পাশে রয়েছে।"** অপর হাদীসে আছে, (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০১০) **"বাম হাত দিয়ে খাওয়া এবং পান করো না। কারণ শয়তান এরূপ করে থাকে।"** এ কারণে ধার্মিক ব্যক্তিরা ডান হাত দিয়ে খাওয়া এবং পান করে থাকে। কিন্তু যখন আমরা খাবার খাই তখন ডান হাত ব্যবহার করি এবং অনেক লোক আছে যারা বলে ডান হাত নোংরা তাই বাম হাত দিয়ে গ্লাস ধরে পানি পান করে কিন্তু সুন্নাহ অনুসরণ করার জন্য গ্লাসের নীচে ডান হাতের পীঠ স্পর্শ করায়; কিন্তু শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন যে, নিজের অন্তরকে নোংরা করার চেয়ে গ্লাস নোংরা করা ভালো। হাদীসে আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪১২৯) **"ওযু এবং পোশাক পরিধান করার সময় ডান হাত ব্যবহার করো।"** আরো বলা আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩) **"খাওয়া এবং ওযু করতে ডান হাত ব্যবহার করা উচিত তারপর বাম দিক এবং যদি ধৌত করতে হয় তবে বাম দিক থেকে করতে হবে।"** আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৪) **"ধৌতকরণের জন্য তোমার ডান হাত ব্যবহার করো না।"**

এবং এগুলোর পেছনে যুক্তি হলো মেডিকেল সাইন্স বলে যে ব্রেনের বাম পাশ শরীরের ডান দিক নিয়ন্ত্রণ করে আর ব্রেনের ডান দিক নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম দিক এবং ৯০% এরও বেশি লোকের ব্রেনের বাম পাশ বেশি কার্যকর যে কারণে অধিকাংশ লোক ডানহাতি এবং এজন্য বেশির ভাগ লোক ডানহাতে বেশির কাজ করে থাকে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে ডান হাত দিয়ে শুধু ভাল কাজগুলেঅ করতে বলে এবং এমনটি বলা হয়, যেন মানুষের বাম হাতটিও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং মুহাম্মদ (ﷺ) যা বলেছেন সেটা বৈজ্ঞানিকভাবেও উত্তম।

প্রশ্ন: দাড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ইসলামে কী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শুধু মুসলিম শরীফেই ছয়টির বেশি সহীহ হাদীস আছে যেখানে মুসলমানদেরকে দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলো

"রসূল (সঃ) দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০১৭)

"মহানবী (সঃ) কোনো ব্যক্তিকে দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০১৮)

"নবী করীম (সঃ) দাড়িয়ে পান করা সতর্ক করে দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫০২০)

"কেউ দাড়িয়ে পান করবে না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০২২)

সুতরাং এ সকল হাদীসগুলো দাড়িয়ে পান করাকে অনুমোদন দিচ্ছে না। আরো হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) জমজম কূপের পানি পান করার সময় দাড়িয়ে পান করতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০২৩ ও ৫০২৭)

"তিনি দাড়িয়ে জমজমের পানি পান করতেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৩৭)

সুতরাং উল্লিখিত হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে সকল আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, জমজমের পানি পান ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বসে পান করতে হবে। কিন্তু এমন হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) জমজমের পানি দাড়িয়ে পান করা ছাড়া অন্য সময়ও দাড়িয়ে পান করতেন।

হাদীস উল্লেখ আছে যে, "আলী (রাঃ) মসজিদের দিকে হাটছিলেন এবং দাড়িয়ে পানি পান করেছিলেন এবং তিনি বলেন, আমি জানি যে অনেক মানুষ এটাকে অনুমোদনহীন কাজ বলে ভাবে কিন্তু আমি মহানবী (ﷺ) কে দাড়িয়ে পান করতে দেখেছি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬১৫)

একদা আলী (রা.) দাড়িয়ে পান করছিলেন এবং লোকেরা তার দিকে তাকাতে লাগলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এভাবে তাকিয়ে আছো কেনো, আমি তাই করছি যা মুহাম্মদ (ﷺ) করেছেন, আমি দাড়িয়ে পান করি, কারণ মুহাম্মদ (ﷺ)- কে এভাবে দেখেছি এবং আমি বসেও পান করি কারণ আমি মহানবী (ﷺ)- কে বসে পান করতে দেখেছি।" (মুসনাদ আহমদ, ৭৯৭)

"ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, তিনি মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে ছিলেন এবং মুহাম্মদ (ﷺ) অনেক সময় হাটতে হাটতে খেতেন এবং দাড়িয়ে পান করতেন।" (তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮১)

সুতরাং এই সকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে আলেমরা মতৈক্যে পৌছেন যে, বসে পান করা মুস্তাহাব। কারণ এটা নবী (ﷺ) নির্দেশ, যখন নির্দেশ এবং কাজকর্মের ভিতরে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন নির্দেশটাই বেশি গুরুত্ব বহন করে, কারণ নির্দেশ হলো সাধারণ সিদ্ধান্ত। তবে দাড়িয়ে পান করা মাকরূহ কিন্তু এর জন্য কোনো শাস্তি নেই। কেউ কেউ বলেন দাড়িয়ে পান করা হারাম। কিন্তু না এটা হারাম নয় বরং মাকরূহ। বসে পান করা অধিক অধিক উত্তম।

প্রশ্ন: পান করার নিয়মগুলো সংক্ষেপে বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিয়মগুলো হলো:

১. পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হবে।
২. ডান হাত দ্বারা পান করতে হবে।
৩. বসে পান করতে হবে।
৪. তিন ঢোক কিংবা তার চেয়ে বেশি ঢোকে পান করতে হবে কিন্তু এক ঢোকে নয়।
৫. পান করার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে।
৬. যে ব্যক্তি পানীয় সরবরাহ করে তার উচিৎ সকলকে সরবরাহ করে সবার শেষে নিজে পান করা।
৭. পানি সরবরাহ করার সময় ডানদিক থেকে সরবরাহ করতে হবে।

৮. কলসি হতে পানি পান করা উচিত নয় বরং গ্লাসে ঢেলে পান করতে হবে।
৯. স্বর্ণ এবং রূপার পাত্রে পানি পান করা উচিত নয়।
সুতরাং এগুলোই হলো পান করার নিয়ম এবং রসূল (সঃ) এর সুন্নত।

প্রশ্ন: অনেক মুসলমান খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম উচ্চারণ করে, এটা কি সুন্নাত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আমার জ্ঞানানুযায়ী এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উচ্চারণ করেছেন। তবে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে- তিনি শুধু **'বিসমিল্লাহ'** বলতেন। যেমন হাদীসে এসেছে যে, **(বুখারী, ৫৩৭৬) "মুহাম্মদ (সঃ) বালকদেরকে বলেছেন যে তোমরা খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলো।"** অপর হাদীসে আছে যে, **(আবু দাউদ, ৩৭৫৮) "আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন খাও তখন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো আর ভুলে গেলে খাওয়ার পর যখন মনে আসে তখন বল- "বিসমিল্লাহি ওয়া আওয়ালুহু ওয়া আখেরুহু।"** অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু এবং শেষ করছি। সুতরাং এগুলোই রসূল (সঃ) এর শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু লোক সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে। যখন এ রকম কাউকে মনে করে দেওয়া হয় যে, শুধু বিসমিল্লাহ বলতে হবে তখন সে বলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বললে অসুবিধা কোথায়? বরং এটা শুধু বিসমিল্লাহ বলার চেয়ে উত্তম। এ ক্ষেত্রে তার বিপক্ষে আপনি যুক্তি দেখাতে পারেন এভাবে যে, যখন কুরবানি করা হয় তখন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম কেনো বলা হয় না? অতএব যেখানে যেটা নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবেই তাকে পালন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করি না বরং নিজের মত অনুযায়ী চলাফেলা করি। এগুলো পরিহার করতে হবে।

প্রশ্ন: পুরুষ- নারীর পোশাকের ব্যাপারে ইসলামি শরীয়তের বিধান কীরূপ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রথমে পুরুষ ও নারীর জন্য হিযাবের কথা বলেছেন। কুরআনে বর্ণিত আছে, **(সূরা- নূর, অধ্যায়- ২৪, আয়াত- ৩০) "মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।"** অর্থাৎ প্রথম নজরেই দৃষ্টি অবনত করে ফেলতে হবে। একদিন এক মুসলমান একটি তরুণীর দিকে লম্বা সময় ধরে তাকিয়ে ছিলো এমতাবস্থায় আরেক লোক বললো ভাই এটা আপনি কি করছেন। এটা করা হারাম তখন প্রথম ব্যক্তি বললো যে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ।" অতএব আমি কিন্তু এখনও আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেক পরিমাণও শেষ করিনি! কিন্তু প্রথম দৃষ্টির মানে এই নয় যে, আপনি আধা ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে থাকবেন। বরং মহানবী

(ﷺ) বলেছেন যে, প্রথমবার নারীর দিকে চোখ পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে অবনত করো। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- আন নূর, অধ্যায়- ২৪, আয়াত- ৩১)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

অর্থ: ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্তবাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।

মূলত, পুরুষ- নারীর জন্য ছয় ধরনের হিযাব তথা পর্দার কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হলো:

১. পুরুষের জন্য হিযাব হলো কোমর হতে হাটুর নিচ পর্যন্ত আর নারীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীর আবৃত রাখতে হবে শুধু হাত আর মুখ বের করে রাখা যাবে, তবে এ ব্যাপারে কিন্তু আলেমগুণ দ্বিমত পোষণ করেন। এই প্রথম প্রকার ছাড়া বাকি পাঁচটি পুরুষ এবং নারীর জন্য একই।

২. পোশঅক এমন টাইট হওয়া উচিত নয় যেটা পরিধান করলে শরীরের গড়ন প্রকাশ পায়।

৩. এতটা স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে করে শরীর দেখা যায়।

৪. এমন জমকাল পোশাক পরিধান করা যাবে না যেটা অপরকে আকর্ষণ করে।

৫. বিধর্মীদের পোশাক পরা যাবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১৭৩) "একদিন কোনো এক লোক জাঁকজমক রঙের পোশাক পরে মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কাছে আসলো। এটা দেখে তিনি বললেন, তোমার এই পোশাক খুলে ফেল কারণ তোমার এই পোশাক বিধর্মীদের চিহ্ন বহন করছে।" যেমন খ্রিস্টানরা ক্রুস আর হিন্দুরা টিকলি ব্যবহার করে।

৬. বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মত পোশাক পরা উচিত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, ৫৮৮৫) "পুরুষ লোকের নারীদের ন্যায় আচরণ করা উচিত নয়।" এগুলো হলো পর্দার আসল প্রকরণ। এছাড়াও কথা বলা হাঁটচলা, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পর্দার ব্যবহার রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- আহযাব, আয়াত- ৫৯)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

অর্থ: "হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।"

উদাহরণ দেয়া যাক যে, দুই বোন এবং তারা দু'জনেই সমানভাবে অধিক সুন্দরী। তারা দু'জনেই ধরা যাক লন্ডনের কোনো একটা রাস্তায় হাঁটছে। এদের মধ্যে একজন হিযাব পরিহিত এবং অপরজন শর্টসুট পরিহিত এবং ঐ রাস্তার একটি কোণায় এক লম্পট কুকর্ম করার জন্য অপেক্ষা করছে। এখন তাহলে ঐ দুইবোনের মধ্যে কার লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? নিশ্চয়ই যে মেয়েটি শর্টসুট পরে আছে। এই কারণে আল্লাহ কুরআনে নারীদেরকে হিযাবের কথা বলেছেন যেন তারা শ্লীলতাহানি হতে বাঁচতে পারে। সুতরাং এই ছয়টি হিযাবের মূল শ্রেণী। এছাড়া আরো কিছু পরিচ্ছদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন- স্বর্ণালংকার পরিধান করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৫১৮৭) "দুটি জিনিস স্বর্ণ এবং রেশম পরিধান করা আমর উম্মতের পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ তবে নারীদের জন্য অনুমোদিত।" অপর হাদীসে পায়ের গোড়ালির নিচে পায়জামা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭) "পায়ের গোড়ালীর নীচে পোশাক পরলে ওই অংশ জাহান্নামের আগুনে পোড়ান হবে।" জাঁকজমক পোশাক পরে অহংকার প্রকাশ বা অনুভব করা নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে যে, (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০১৯) "যে ব্যক্তি যশ- খ্যাতি এবং সৌন্দর্যের জন্য পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ঐ পোশাক পরিয়ে দেবেন।" অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে- বিচারের দিন আল্লাহ তাকে অপমানজনক পোশাক পরাবেন। পোশাকের ব্যাপারে আরো নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে বলা

হয়েছে, (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪০৫০) "সাদা পোশাক পরিধান করো কারণ এটা সর্বোত্তম এবং মৃতকে সাদা পোশাকে জড়াও।" অপর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪১২৯) "যখন তুমি পোশাক পরো অথবা ওযু করো তখন ডান হাত দিয়ে শুরু করো।" সুতরাং এইগুলো পোশাকের ব্যাপারে নির্দেশনা যেগুলো কুরআন এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ইসলামের সুন্নাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? কুরআন কি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কিছু আধুনিক চিন্তাবিদ এই রকম কথাবার্তা বলে থাকেন, তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, সুন্নাত হলো ইসলামের অপরিহার্য উৎস। মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কথা কাজ এবং অনুমোদগুলো কুরআন বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। সহীহ হাদীসগুলো হলো কুরআনের ধারাভাষ্য। কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যার কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই; সোজা সাপ্টা। যেমন- 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' বল আল্লাহ এক। এটা সহজ ব্যাপার কিন্তু অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো হাদীসের সাহায্য ছাড়া অনুধাবন করা অসম্ভব। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য যাকাত ফরজ। কিন্তু এটা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি যে, কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে। অংশ দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ)- এর হাদীস পড়ে আমরা জানতে পারি যে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ওপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। সেচ ছাড়া ফসলের উপর ১০% সেচ দেওয়া ফসলে ৫% ইত্যাদি, হাদীস ছাড়া আমরা কি এগুলো জানতে পারতাম? কুরআনে বলা হয়েছে, নামাজ পড়। কিন্তু কীভাবে পড়তে হবে, কয় রাকাআত। কত রুকু ইত্যাদি এগুলো বর্ণনা করা হয় নি; কিন্তু সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং সুন্নাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সূরা- আহযাব, আয়াত- ২১)

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।" এবং (সূরা- নিসা, আয়াত- ৫৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো ..... তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিপদে প্রবৃত্ত হয়ে পড় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো।"

উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় যে, কুরআন উল্লেখ আছে, (সূরা- মায়েদাহ, অধ্যায়- ৫, আয়াত- ৩৮)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

অর্থ: "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে।

কিন্তু যখন আমরা আল্লাহর এই নির্দেশের বিভিন্ন দিক খুঁজতে চাই তখন সেটা আমরা হাদীস থেকে পাই। যেমন- হাদীসে বলা হয়েছে যে (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮৯) "যে ব্যক্তি এক দিনারের চার ভাগের এক অংশ বা তার বেশি চুরি বা ডাকাতি করে তার হাত কেটে দাও আর এর চেয়ে কম হলে হাত কাটার দরকার নেই।" এটা কি ভাবা যায়? যে ব্যক্তি খাদ্যের অভাবে চুরি করেছে এবং তার হাত কেটে ফেলতে বলা হচ্ছে। না, কারণ আমাদের উচিৎ এমন ব্যবস্থা করা যেন তাদের চুরি করার প্রয়োজন না হয়। তবে আনন্দ কিংবা সুখের জন্য কেউ চুরি করলে তার হাত কর্তন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, হাতের ঠিক কোন জায়গা হতে কাটতে হবে? এর উত্তরও আমরা হাদীস থেকে পাই। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "আঙ্গুলের গোড়া হতে কেটে দাও।" অন্যত্র বলা হয়েছে, আঙ্গুল থেকে কেটে ফেলতে হবে। কিংবা কব্জি থেকে ইত্যাদি। সুতরাং কুরআনে যেগুলো অস্পষ্ট সেগুলো হাদীসে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- কুরআনে আছে, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, হাদীস নং ১০১)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

অর্থ: "যখন তোমরা কোনো দেশ সফর করো, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাসকরণে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে।"

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬১) "একজন সাহাবা ওমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলো যে কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, শত্রুর ভয়ে তোমরা তোমাদের নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে পারো। কিন্তু বর্তমানে এই রকম কোনো শত্রুর ভয় নেই, তাহলে নামাজ

সংক্ষিপ্ত করতে হবে কেনো? ওমর (রা.) বললেন, একই প্রশ্ন আমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে করলে তিনি আমাকে বললেন, এটা আল্লাহর বিশেষ দান। অর্থাৎ ভ্রমণ করার সময় কোনো শত্রু থাক আর না থাক নামাজ সংক্ষিপ্ত করা যাবে। কিন্তু নামাজ সংক্ষিপ্ত করার জন্য কতটুকু দূরত্বে গেলে প্রযোজ্য হবে? হ্যাঁ, এটা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটা হলো ৫০ কিলোমিটারের বেশি প্রায়। সুতরাং ৫০ কিলোমিটার বেশি ভ্রমন করলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করা উচিৎ এবং এটা আল্লাহর পক্ষ হতে উপহার। কুরআনে আছে যে, **(সূরা- আনআম, অধ্যায়- ৬, আয়াত- ১৪৫)**

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: আপনি বলে দিন যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তার মধ্যে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাই না ভক্ষণকারীদের জন্য যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে উৎসর্গ করা হয় .... ।”

কিন্তু আয়াতে উল্লিখিত খাদ্যের চেয়ে আরো অনেক খাদ্য আছে যেগুলো হারাম, সেগুলো হাদীস থেকে জানতে পারি। যেমন হাদীসে আছে যে, **(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫২) “তোমাদের জন্য হিংস্র নখরযুক্ত পাখি খাওয়া নিষিদ্ধ।”** এবং অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, শিকারি প্রাণী যেমন মাংসাসী, বাঘ, লিওপার্ড, চিতা, সিংহ ইত্যাদির গোশত খাওয়া হারাম।” সুতরাং এই জিনিসগুলো কুরআনে উল্লেখ নেই কিন্তু হাদীসে বলা হয়েছে। আরো উল্লেখ আছে, **(মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদীস নং ৩১৯ এবং তিরমিযী)** মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন- আমি কুরআন, আমার উদাহরণ এবং সুন্নাতের সাথে বসবাস করি। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর পথে চলবে, সে সবসময় সঠিক পথে থাকবে; কখনও বিপথগামি হবে না। কারণ, সুন্নাত হলো ইসলামের অপরিহার্য উৎস। সুন্নাত ছাড়া ইসলামকে ভালভাবে বুঝা অসম্ভব।

প্রশ্ন: একজন মুসলিম আরেক মুসলিমকে সংশোধন করার সময় যদি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তবে সেটা ঠিক হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলাহ এবং দাওয়াহর ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, **(সূরা- নাহল, আয়াত- ১২৫)**

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ দিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।"

সুতরাং দাওয়াতের সময় কেউ রেগে গেলে তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। বরং তাদেরকে ভালোবাসতে হবে সেইভাবে যেভাবে মুহাম্মদ (ﷺ) ভালোবেসেছেন। আমরা এরকম অনেক দৃষ্টান্ত জানি যেখানে বলা হয়েছে যে, এমন অনেক সময় ছিলো যখন অমুসলিমরা মুহাম্মদ (ﷺ)- কে অকথ্য নির্যাতন করতো। একটি ঘটনার কথা আমরা জানি যে, একটি বুড়ি সব সময় মুহাম্মদ (ﷺ) কে গালিপালাজ করতো এবং ময়লা নিক্ষেপ করতো যখন তিনি বুড়ির বাড়ির পাশের রাস্তা অতিক্রম করতেন। কিন্তু একদিন ওই বুড়ির বাড়ী অতিক্রম করার সময় কোনো গালিগালাজ বা ময়লা নিক্ষেপ করা হলো না। এতে তিনি অবাক হলেন কারণ আজকে কেনো তার উপর ওগুলো নিক্ষেপ করা হলো না? সুতরাং তিনি তার খোঁজ নেওয়ার জন্য গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে বুড়ি অসুস্থ। অতঃপর তিনি বুড়ির জন্য দু'আ করলেন সে কারণে বুড়ি খুব খুশি হলো এবং ইসলাম কবুল করলো। অতএব এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ (ﷺ) প্রতিশোধ নিতেন না বরং সুন্দর আচরণ দ্বারা সবার মন জয় করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩০)** **"একদিন এক ইহুদি মুহাম্মদ (ﷺ)- এর নিকট এসে তাকে বললো- আসসামু আলাইকুম এবং তিনি উত্তরে বললেন- তোমার উপরও। আয়েশা (রা.) একথা শুনে রেগে গেলেন এবং ঐ ইহুদিকে বকাঝকা করতে লাগলেন এবং বললেন যে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হোক। মুহাম্মদ (ﷺ) তাকে বললেন না রেগে শান্ত হও। আয়েশা (রা.) বললেন আপনি কি তার কতা শুনতে পান নি? মহানবী (ﷺ) বললেন তুমি কি তার প্রতি আমার জবাব শোন নি? আমার দু'আ কবুল হয়েছে, তারটা হয় নি।"** সুতরাং এভাবেই তিনি লোকর সাথে আচরণ করতেন। হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬২৮০)** **"মুমিন ব্যক্তির উচিৎ নয় কারো জন্য অভিশাপ কামনা করা।"** আরো বলা হয়েছে, **(তিরমিযী, হাদীস নং ২০১১)** **"ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কারো উপর অভিশাপ কামনা করা উচিত নয়।"** বরং মুহাম্মদ (ﷺ) দয়া দেখাতে বলেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, **(সূরা- আহযাব, আয়াত- ২১)**

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

সুতরাং কাউকে সংশোধনের সময় বা দাওয়াতী কাজ করার সময় অন্যের বাজে আচরণের জবাবে নিজে বাজে আচরণ করা যাবে না বরং নিজের ভালো আচরণ দ্বারা তাকে খুশি করতে হবে।

প্রশ্ন: আত্মহত্যার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে? আর যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে তার শাস্তি কমানোর জন্য পিতামাতা কি করতে পারবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আত্মহত্যা করা মহাপাপ তথা কবিরা গুনাহ। ইমাম আযযাহাবী, ইমাম কাযায়েরদের মতে আত্মহত্যা ৭০টি কবিরা গুনাহের মধ্যে ২৯ তম। কুরআনে বলা হয়েছে **(সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৯৫)**

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ: "আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখিন করে নয়।"

এখান থেকে বোঝা যায় যে আত্মহত্যা করা নিষেধ। অনেক হাদীস আছে যেখানে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যেমন- **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৮) "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করলো সে যেন নিজেকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করলো যেখানে সি চিরকাল অবস্থান করবে এবং যে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামে বোতল ভরা বিষপান করতে থাকবে এবং বারে বারে মরতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ছুরি মেরে আত্মহত্যা করবে সে চিরকাল জাহান্নামের নিজেকে ছুরি মারতে থাকবে।** মুহাম্মদ (ﷺ) আরো বলেছেন, **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪৭) "যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা ঘটায় তবে জাহান্নামে সে একইভাবে তা করতে থাকবে।"** আরেকটি হাদীস আছে যে **(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৩৩) "এমন ব্যক্তিকে মুহাম্মদ (ﷺ)- এর নিকট আনা হলো যে আত্মহত্যা করেছিলো কিন্তু তিনি তার জানাজা পড়লেন না।**

সুতরাং আত্মহত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আত্মহত্যা করলে সে কাফির হয়ে গেলো, তবে এটা কবিরা গুনাহ এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কুরআনে বলা হয়েছে **(সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ১১৬, ৪৮)**

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ - وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করে এবং নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।" এবং "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

সুতরাং আত্মহত্যা কবিরা গুনাহ এবং তা ক্ষমা করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যদি কেউ আত্মহত্যা করে তবে তার আত্মীয় স্বজনদের উচিত তার জন্য মাগফেরাত কামনা করা এবং পিতামাতাও তাই করতে পারে। আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন: কিছু লোক মনে করে যে ভালো জিনিস উপভোগ করা এবং মন্দ জিনিস নিষেধ করা ফরজ নয়। এই দাবির ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করা খুবই জরুরি এবং সঠিক নির্দেশনা কী? সঠিক নির্দেশনা হলো ভালো জিনিস উপভোগ করা এবং মন্দ জিনিস নিষেধ করা। কুরআনে বলা হয়েছে যে, **(সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ১১০)**

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ: "তোমরাই সর্বোত্তম যদি সৎকাজে উপদেশ দেবে আর মন্দ কাজে বাধা দেবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

সুতরাং নিজেকে সঠিকপথে রাখতে অবশ্যই ভাল কাজ করতে হবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিতে হবে। যদি কেউ তা না করে তবে সে ভাল উম্মত হতে পারবে না। আর জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মানদণ্ড যেটা কুরআনে বলা হয়েছে, সেটা হলো- **(সূরা- আসর, আয়াত- ১ থেকে ৩)**

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: “কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।”

সুতরাং যে জান্নাতে যেতে চায় তাকে অবশ্যই চারটি ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। তা হলো:

১. ঈমান আনতে হবে।
২. ভালো কাজ করতে হবে।
৩. মানুষকে সত্যের দিকে ডাকতে হবে।
৪. মানুষকে ধৈর্যধারণের আহবান করতে হবে।

যদি এই চারটির কোন একটি বাদ পড়ে যায় তাহলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কে ভালো মুসলিম হতে পারে? হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি করেছে কিন্তু সে যদি অন্যকে সত্যের দিকে না ডাকে এবং ভালো মন্দ পালন না করে তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সুতরাং দাওয়াহ এবং ইসলাম তথা সংশোধন হলো জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

রমযানের ১১তম শিক্ষা

সাহরি ও ইফতার

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির, সাহরি ও ইফতার সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাহরি শব্দটি আরবি সাহর سحر থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো, “রাতের শেষ ভাগ এবং এর বিপরীত শব্দকে বলা ইশা عشاء সাহর শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো সুবহে সাদেকের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা। আরবিতে এই সাহর শব্দ যেসব অর্থ প্রকাশ করে তা হলো সাহরি খাওয়া। অর্থাৎ সাহরি খাওয়া দাওয়ার কার্যক্রম হলো সাহর, রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে খাবার গ্রহণ করাই হলো সাহরি।

একইভাবে ইফতার শব্দটি আরবি فطر থেকে এসেছে, অর্থ: ভঙ্গ করা, ছিঁড়ে ফেলা। ফিতর আরো যে অর্থ দেয় তাহলো এমন খাদ্য যা দ্বারা ভঙ্গ করা হয়। আরবি শব্দ 'ইফতার' অর্থ হলো- রোযা ত্যাগ করা। অর্থাৎ ইফতার অর্থ রোযা ত্যাগ করার বা ছাড়ার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরি খাওয়ার ফযিলত বর্ণনা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রাসূল (ﷺ) এর হাদীস অনুযায়ী সাহরি খাওয়া রহমতস্বরূপ, **সহীহ বুখারীর কিতাবুস সিয়াম এর ১৯২৩ নং হাদীসে** রাসূল (ﷺ) বলেন, **"তোমরা সাহরি খাও। কারণ সাহরির মধ্যে রয়েছে বরকত। সাহরি হলো রাতের শেষ ভাগের সুবহে সাদিকের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ।"** রাসূল (ﷺ) সাহরি খাওয়াকে মুসলিম ও আহলে কিতাবদের রোযা পালনের পার্থক্যের নিদর্শনস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। **সহীহ মুসলিম এর কিতাবুস সিয়ামের (খণ্ড নং - ৩) ২৪১৩ নং হাদীসে** এসেছে **"হযরত আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহরি খাওয়া।**

সিলসিলা আস সহীহাহ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০৪৫ নং হাদীসে আরো উল্লেখ আছে **মহানবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহর রহমত তিনটি জিনিসের ওপর পতিত হতে থাকে, প্রথম হলো ইসলামী জনসভা, দ্বিতীয় হলো- খাবার, তৃতীয় হলো- সাহরি।** একই গ্রন্থের অন্য একটি হাদীসে **(হাদীস নং ১২৯১)** বলা হয়েছে- **রাসূল (ﷺ) বলেন রহমত বরকত কেবল দুটি বিষয়ের জন্যে, প্রথমটি হলো- সাহরি, দ্বিতীয়টি হলো- ওজনে সঠিক পরিমাপ।** আরো অনেকগুলো হাদীসে রাসূল (ﷺ) সাহরির ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন এবং সাহরি খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। **সহীহ আল জামে" এর ১ম খণ্ডের ৩৬৮৩ নং হাদীসে** এসেছে **একজন সাহাবি মহানবী (ﷺ) কে সাহরির ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন, সাহরিতে অনেক রহমত আছে সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ করো না।**

মুসনাদে আহমাদ- এর ১৭তম খণ্ডের ১১০৮৬ নং হাদীসে এসেছে, **মহানবী (ﷺ) বলেন, সাহরি হলো রহমতস্বরূপ তাই তোমরা এটাকে ত্যাগ করো না, অন্তত এক গ্লাস পানি দিয়ে হলেও সাহরি কর। কেননা যে ব্যক্তি সাহরি খায় আল্লাহ তাকে নিজ হাতে রহমত দান করেন।"** একই বর্ণনা **সুনানে আবূ দাউদ এর ২য় খণ্ডের ২৩৩৭ নং হাদীসে** এসেছে। **"একজন লোক নবী করীম (ﷺ)- এর নিকট সাহরির সময় এলেন। তখন নবী করীম (ﷺ) তাকে বললেন, সাহরি খাও, কেননা এটা হলো রহমতস্বরূপ।**

সাহরির সময়টা হলো বরকতময়, সাহরির ফজিলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীসে বর্ণনা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সাহরি হলো উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। এটা একটি নিয়ামত। তাই নবী করীম (ﷺ) এটা ত্যাগ করেন নি। বরং সর্বদাই সাহরি খেয়েছেন। অতএব মুসলিদের উচিত রোযা রাখলে অবশ্যই সাহরি খাওয়া এবং এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হওয়া।

প্রশ্ন: সাহরি খাওয়ার ব্যাপারে সুবহে সাদেকের পূর্বেই খাওয়ার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে কখন নির্দেশ আসে? এই নির্দেশ আসার পূর্বে সাহাবিগণ কীভাবে রোযা রাখতেন? সাহরি খাওয়া কখন শুরু হলো?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাহরি সম্পর্কে কুরআনে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ আসার পূর্বে সাহাবিগণ তাদের পূর্বের অভ্যাস মত রোযা রাখতেন, তারা আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যেভাবে রোযা রাখতো সেভাবে রোযা রাখতেন। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবিগণ এভাবেই রোযা পালন করতেন। কীভাবে সাহরির প্রচলন হলো তা একটি হাদীস থেকে জানা যায়। তাছাড়া সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হওয়ার আগে সাহাবিগণ কীভাবে রোযা পালন করতেন সে বিষয়েও বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। সাহাবিগণ তখন ইফতারের পরপরই খাবার খেতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। পরবর্তী দিন ইফতারের আগে কিছুই খেতেন না। সূর্যাস্তের পর ইফতার করতেন।

সাহাবিগণের প্রথম দিককার রোযা পালন সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামে এর ১৯১৫ নং হাদীসে এসেছে। এখানে একজন সাহাবি যার নাম কায়েস ইবনে সালমান আনসারী, তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একদা ইফতারের সময় ঘরে ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে বললেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে ইফতারের জন্য খাবার দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন ঘরে কোনো খাবার নেই, বাইরে থেকে কোনো খাবার সংগ্রহ করে আনো। তখন তিনি বের হয়ে গেলেন অতঃপর সাহাবি (রা.) ফিরে এলেন এবং খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তার স্ত্রী ফিরে এসে দেখলেন তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর তিনি স্ত্রী বলতে লাগলেন, এখন আমি কি করবো, আমাদের তো কোনো খাবার নেই। এমতাবস্থায় সাহাবি (রা.) পরের দিনেও না খেয়েই রোযা রাখলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ খবর রাসূল (ﷺ) এর নিকট পৌঁছলো তখন তিনি কী হয়েছে তা জানতে চাইলেন। এমন সময় সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রোযা পালনের কিছু পার্থক্য তো ছিলোই। তারা সাহরি খেতেন না। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্তমান পদ্ধতি চালু হয়।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, রোযা ছাড়ার তথা ইফতার করার সর্বোত্তম সময় কোনটি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইফতার করার সর্বোত্তম সময় হলো যখন রাত শুরু হয়। এ বিষয়ে যেমন পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: "রোযা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত।"

যখন সূর্য অস্ত যাবে তখনই ইফতারের উপযুক্ত সময়। সহীহ বুখারী এর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ১৯৫৪ নং হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, যখন রাতে ঐ (পূর্ব) দিক থেকে আসে, দিন ঐ (পশ্চিম) দিকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখনই রোযাদার ইফতার করবে।

বুখারী এর একই খণ্ডের অন্য একটি হাদীসে এসেছে "আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সূর্য অস্ত যেতে দেখতাম তখন রোযা ছাড়তাম, রাসূল (ﷺ) ও তাই করতেন।"

সহীহ জামে এর ১ম খণ্ডের ২৮৩৫ নং হাদীসে এসেছে, "রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা তাড়াতাড়ি রোযা ছাড়ো এবং দেরি করে সাহরি খাও।"

বায়হাকি এর ৪র্থ খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ৮১২৭ নং হাদীসে বর্ণনা- "রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবিগণ আগে ভাগে ইফতার করতেন এবং শেষ মুহূর্তে সাহরি খেতেন।" একই গ্রন্থের কিতাবুস সিয়ামের ৮১২৫ নং হাদীসে আরো এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমাকে তাড়াতাড়ি

ইফতার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দেরি করে সাহরি খেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নামাজে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতে বলা হয়েছে।”

আরো অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- সহীহ বুখারী ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ১৯৫৭ নং হাদীসে এসেছে-

রাসূল (ﷺ) বলেন, “আমার উম্মতগণ ততদিন সঠিক পথে থাকবে, যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে।” সহীহ ইবনে হিব্বান এর কিতাবুস সিয়াম, খণ্ড নং ৮ হাদীস নং ৩৫১০ এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেন, “আমার উম্মতগণ সেই সময় পর্যন্ত সুন্নাতের ওপর থাকবে যতক্ষণ তারা রোযা ছাড়তে দেরি করবে না।”

একই গ্রন্থের অন্য একটি হাদীসে আরো এসেছে হাদীস নং ৩৫০৯ রাসূল (ﷺ) বলেন “আমার এ দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতগণ রোযা ছাড়তে ব্যস্ততা করবে এবং ইহুদীদের মত রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না এবং ইফতার করতে দেরি করবে না।”

এসব হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইফতার করতে হবে। এটা অবশ্যই সূর্যাস্তের পরপরেই করতে হবে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, এবার অন্য একটি প্রশ্ন করবো। অনেকে আছেন যারা বিলম্ব করে ইফতার করেন এবং বিলম্বে মাগরিবের নামাজ পড়েন, এরা সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেলে ইফতার করে এবং একইভাবে মাগরিবের নামাজ পড়ে। তারা তাদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলবে যে তারা রোযার হেফাজত অর্থাৎ সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য এমন করে। এটা কি আসলে সঠিক? এর কি কোনো যৌক্তিক ভিত্তি আছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক মুসলমান আছেন যারা চায় যে তাদের রোযা হেফাজত করার জন্য অর্থাৎ সন্দেহ মুক্ত থাকার জন্য অন্যদের চেয়ে চার- পাঁচ মিনিট দেরি করে রোযা ছাড়তে। তারা সূর্যাস্তের পরও আরো কয়েক মিনিট দেরি করেন, শুধু সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য। কেননা একটি হাদীসে তাড়াতাড়ি রোযা ছাড়া তথা ইফতার করার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। এরূপ (সহীহ আত তারগীব, কিতাবুস সিয়াম, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৯১) মহানবী (ﷺ) স্বপ্নে দেখে স্বপ্ন সম্পর্কে বলেন, তিনি জনগণকে চিৎকার আর্তনাদ করতে দেখলেন, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের কি হয়েছে? এই লোক কারা? তখন জবাব দিলেন এরা জাহান্নামী মানুষ। তিনি অন্য পাশে দেখলেন এবং জানতে চাইলেন এরা কারা? তখন জবাব দিলেন এরা তাড়াতাড়ি রোযা ছাড়তো।

সুতরাং এই হাদীস অনুযায়ী মানুষ যে ৫/৬ মিনিট দেরি করে রোযা ছাড়ে তা সুন্নাত নয়। দেরি করে ইফতার করা যেমন ভুল তাড়াতাড়ি করে ইফতার করাও ভুল। কেননা সূরা বাকারা ১৮৭ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: "রোযা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত।"

সহীহ বুখারী এর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ১৯৫৪ নং হাদীসে এসেছে রাসূল (ﷺ) বলেন, **"যখন তোমরা রাতের শুরু দেখতে পাবে, সূর্যাস্ত যাবে তথা দিন শেষ হবে, তখন তোমরা ইফতার করো।"**

এ প্রসঙ্গে একই গ্রন্থের ১৯৫৭ নং হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে রাসূল (ﷺ) বলেন, **"আমার উম্মতগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যের পথে থাকবে যতক্ষণ তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।"**

সহীহ ইবনে হিব্বান এর ৮ম খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ৩৫১০ নং হাদীসের বর্ণনা **রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মতগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতের উপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতার করতে দেরি করবে না।"** একই গ্রন্থের ৩৫০৯ নং হাদীসে এসেছে **মহানবী (ﷺ) বলেন, আমার দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত সমুন্নত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতগণ রোযা ছাড়তে ব্যস্ত থাকবে এবং তারা আহলে কিতাব, ইহুদী নাসারাদের মত দেরি করবে না।"**

কিন্তু এটা স্বাভাবিক বলা যায় যে, এটা কোনোভাবেই সূর্যাস্তের আগে নয়। এটা অবশ্যই সূর্যাস্তের পর, আপনি সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করতে পারবেন না। আপনি যে মুহূর্তে নিজের চোখে দেখবেন সূর্য অস্ত গেল তখন ইফতার করবেন। বর্তমানে তো অনেক ঘড়িসহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে যার সাহায্যে সূর্যাস্তের সঠিক সময় নির্ধারণ করা অতি সহজ। সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইফতার করবেন। সুতরাং ৪/৫ মিনিট দেরি করার কোন দরকার নেই। আর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ৪/৫ মিনিট দেরি করারও দরকার নেই। আপনি যদি এমন দেরি করেন, তাহলে তো রাসূল (ﷺ) বলেই দিয়েছেন, যে দেরি করবে সে আমার সুন্নাতের ওপর থাকবে না। তাই সুন্নাতের ওপর থাকতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই সঠিক সময়ে ইফতার করতে হবে। সুন্নাত অনুযায়ী ইফতারের নিয়ম হলো সূর্যাস্তের পরপরই ইফতার করা, দেরি করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: রসূল (ﷺ) ইফতারীতে কী খেতেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সুনানে আবু দাউদের ২য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াত এর ২৩৪৯ নং হাদীস থেকে জানা **যায়, রসূল (ﷺ) ইফতারীতে উত্তম খেজুর খেতেন।** তিনি ভালো মানের খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তিনি টাটকা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর খেতেন। টাটকা খেজুর খাওয়া সর্বোত্তম, আপনি যদি টাটকা খেজুর না পান তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করুন, আর যদি তাও না পান তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করুন, এটাই সুন্নাত। আপনি যদি পানিও না পান তাহলে হালাল যেকোনো খাবার দিয়ে ইফতার করতে পারেন। আবার কোনোকিছুই পেলেন না। যেমন সফরে বা যানবাহনে ইফতারের সময় হলো, তাহলে আপনি মানসিকভাব রোযা ছাড়ার নিয়ত করুন এবং তাড়াতাড়ি যে হালাল খাবার পান তা খেয়ে নিন।

প্রশ্ন: ইফতারীতে নির্দিষ্ট কোনো দু'আ পড়তে হয় কি? দু'আ পড়তে হলে দু'আটি কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুসলমানগণ ইফতারীতে যে সকল দু'আ পড়তে থাকে তা অধিকাংশই সহীহ হাদীস থেকে নেয়া। তারা ইফতারের সময় যে দু'আ পড়ে থাকে তার মধ্যে একটি **সুনানে আবু দাউদ এর ২য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়ামের ২৩৫০ নং হাদীসে** পাওয়া যায়। এ হাদীসের বর্ণনায় এসেছে। রসূল (ﷺ) ইফতারীতে পড়তেন।

ذَهَـــبَ الظَّمَـــأُ، وَابْتَلَّـــتِ العُـــروق، وَثَبَـــتَ الأَجْـــرُ إِنْ شـــاءَ اللهُ

উচ্চারণ: যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু, ওয়া সাবাতাল আজরু, ইন শা- আল্লাহ।

অর্থ: পিপাসা দূর হয়েছে, শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে পুরস্কার নিশ্চিত, যদি আল্লাহ চান।

মুসলমানদের অনেকে এই দু'আ পড়ে থাকেন। আবার অনেকে এই দু'আ ইফতারের পর পড়ে থাকেন। আসল কথা হলো আপনি খাবার মুখে দেওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়বেন। রসূল (ﷺ) এমস করতেন। তারপর আপনি খেজুর, পানি বা অন্যান্য খাবার খাওয়ার পর উপরউক্ত দু'আ পড়বেন। অর্থাৎ আমার পিপাসা দূর হয়েছে। কেবল পানি পান করার পরই পিপাসা দূর হয়। খেজুর বা অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরই তো ক্ষুধা দূর হয়। সুতরাং দু'আ ইফতারের পরে পড়তে হবে।

আরো অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **রসূল (ﷺ) বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করতেন** এবং এরপর অন্যান্য দু'আ পড়তেন, সেসব দু'আ বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। **ইবনে মাজার ৩য় খণ্ডের "কিতাবুস সিয়াম" অধ্যায়ের ১৭৫২নং হাদীসের** বর্ণনা, **রসূল (ﷺ) বলেন, তিন প্রকার ব্যক্তির দু'আ নিশ্চিতভাবে কুবল হয়, তারা হলো- ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, রোযাদারের ইফতারের সময়ে দু'আ এবং মজলুমের দু'আ। ইবনে মাজার একই অধ্যায়ে অপর হাদীসে এসেছে (হাদীস নং ১৭৫৩) রসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখে এবং ইফতারের সময় দু'আ করে তার দু'আ কবুল হয়।** তাই আপনি ইফতারের আগে যেকোনো দু'আ করতে পারেন। আপনি নিজের ভাষায় আল্লাহর নিকট আপনার যা চাওয়ার চাইতে পারেন।

আপনি আল্লাহর নিকট নিজের জন্য ক্ষমা চাইতে পারেন। আপনার জন্য রহমত বরকত প্রার্থনা করতে পারেন, আপনার যা চাওয়ার তা আল্লাহর নিকট চান। আল্লাহর নিকট আপনার যা চাওয়ার আছে তা চাইতে পারেন। ইফতারের আগমুহূর্তের সময় দু'আ করার জন্য সর্বোত্তম সময়।

প্রশ্ন : আমাদের একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছেন যে, সাহীরর সমেয়র জন্য নির্দিষ্ট কোনো দু'আ আছে কিনা?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক: আমার জানা মতে রাসূল (ﷺ) সাহরির সময় নির্দিষ্ট কোনো দোয়া পড়তেন, এমন কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না, এ সম্পর্কে হাদীসে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় নি। কোনো সাহাবিও এমন কোনো নির্দিষ্ট দোয়া উল্লেখ করেন নি। বস্তুত রাসূল (ﷺ) যা করেছেন তা হলো সুন্নাত। **(তিরমিযী শরীফের কিতাবুস সিয়াম এর ৭৩০ নং হাদীসে)** এসেছে **"রাসূল (ﷺ) বলেন, যদি কেউ সুবহে সাদিকের পূর্বে রোযার নিয়ত না করো তবে তার রোযা নেই।"**

অর্থাৎ এর অর্থ হলো রোযার জন্য নিয়ত অত্যাবশ্যক। এটা অবশ্যই সুবহে সাদিকের পূর্বে করতে হবে। এটা রাত শুরু হওয়ার পর সুবহে সাদিকের পূর্বে যে কোনো সময় করলেই হবে। কিন্তু নিয়তের ক্ষেত্রে আপনার জন্য এটা অত্যাবশ্যক না যে, নিয়ত আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে করতে হবে। নিয়ত মনে মনে অন্তরে ইচ্ছে পোষণ করলেই যথেষ্ট হবে। আপনি যেমন নামাজের ক্ষেত্রে নামাজের নিয়ত মনে মনে করলেই হয়, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করার দরকার হয় না। তেমনি রোযার ক্ষেত্রে নিয়ত মনে মনে করলেই হবে। "আমি আগামীকাল রোযা রাখবো।" এটা উচ্চৈঃস্বরে বলার দরকার নেই। অনেক মুসলমান আছেন যারা আরবিতে বা অন্যান্য

ভাষায়- ''আমি আগমীকাল রোযা রাখবো'' এমন বলে থাকেন। এধরনের কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না। নিয়ত করার এমন ধরনের কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণনা নেই। সুতরাং অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। সাহরির জন্য নির্দিষ্ট কোনো দ'আও নেই।

প্রশ্ন: ধরুন কোনো ব্যক্তি রোযা রাখার নিয়ত করে ঘুমালো কিন্তু যেকোনো কারণে যেমন ঘুম থেকে না জাগার কারণে সাহরি খেতে পারলো না, এমন অবস্থায় সে কি রোযা রাখবে না?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি কোনো ব্যক্তি পরবর্তী দিনের রোযা রাখার নিয়ত করে ঘুমায় এবং সাহরি খাওয়ার নিয়ত করে ঘুমায় এবং সে যদি ঘুম থেকে জাগতে না পারার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সাহরি খেতে না পারে তাহলে সে রোযা রাখবে, সাহরি খাওয়া সুন্নাত এবং বরকতময়। যেমন হাদিসে এসেছে- **"রসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা সাহরি খাও এটা বাদ দিও না, কেননা সাহরিতে বরকত রয়েছে।" (সহীহ বুখারী ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সিয়াম হাদীস নং ১৯২৩)**

কিন্তু কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং তার যদি রোযা রাখার এবং সাহরি খাওয়ার নিয়ত থাকে এবং কোনো কারণে হোক তা ঘুম না ভাঙ্গার কারণে সাহরি খেতে না পারে তাহলে তার নিয়ত কবুল হবে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রাসূল (ﷺ) কি সাহরির জন্য নির্দিষ্ট কোন খাবারের কথা উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ বিষয়ে সুনানে আবু দাউদ এর ২য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ২৩৩৮ নং হাদীসে বর্ণনা এসেছে, যেখানে রসূল (ﷺ) বলেন বিশ্বাসীদের সাহরীর সর্বোত্তম খাদ্য হলো খেজুর। সুতরাং সাহরির জন্য সর্বোত্তম খাবার হলো খেজুর।

মুসনাদে আহমাদ এর ১৭তম খণ্ডের ১১০৮৬ নং হাদীসে রসূল আরো বলেছেন- **"তোমরা সাহরি খাও যদিও তা কেবল একপাত্র পানি হয়।"** তাই বলা যায় সাহরির জন্য উত্তম খাদ্য হলো খেজুর, সাথে অন্যান্য খাবার ও পানি।

রমযানের ১২তম শিক্ষা

রোযার সময় মাকরূহ কার্যাবলি

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: ডা. জাকির, রোযা পালনের সময় যেসব কাজ মাকরূহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী তা উল্লেখ করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযার সময় যেসব কার্যাবলি মাকরূহ এবং সুন্নাত পরিপন্থী তা হলো-

প্রথমত, কেউ কেউ আছেন যারা মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করে থাকেন। রোযার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে বলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, হলো অতিরিক্ত খাওয়া তা সাহরীতে হোক বা রাতের খাবারে কিংবা ইফতারিতে।

তৃতীয়ত, হলো রেগে যাওয়া, চতুর্থ হলো তাড়াতাড়ি অর্থাৎ দ্রুততার সাথে তারাবীহ নামাজ পড়া, পঞ্চম হলো ইতিকাফের সময় মসজিদ থেকে বের হয়ে সামাজিক কার্যাবলিতে যোগ দেওয়া, নিজে সামাজিক কাজ করা।

প্রশ্ন: রোযার সময় কোন কোন কাজ নাজায়েয?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যে সমস্ত কাজ সাধারণত হারাম সে সমস্ত কার্যাবলি রোযার সময়ও নাজায়েজ- হারাম। হারাম সেসব কার্যাবলি মধ্যে কয়েকটি হলো-

১. পরনিন্দা বা গীবত, এটা নিকৃষ্ট পাপ,
২. মিথ্যা বলা, অপ্রয়োজনীয় কথা এবং অশ্লীল কথা বলা,
৩. ঝগড়া বিবাদ এবং গালি দেওয়া,
৪. অশ্লীল কথা বলা,
৫. অপবাদ পরনিন্দা, খোশ গল্প করা,
৬. প্রতারণা করা,
৭. অশ্লীল অনুষ্ঠান ও সিনেমা দেখা,
৮. অশ্লীল ম্যাগাজিন ও বই পড়া,
৯. অশ্লীল ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা,
১০. অপচয় করা,
১১. খাবার নষ্ট করা।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, কেউ যদি তার জিহবায় হেফাজত না করে, তাহলে কি তার রোযা পালন অনর্থক হবে না?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিজের জবান হেফাজত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চাইতে জবান বা জিহবা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার সবচাইতে বেশি উপকারে আসতে পারে। একজন ব্যক্তির ভাল- মন্দ হওয়ার বিষয়ে জিহবার প্রভাব অপরিসীম। নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে জিহবা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বিভিন্ন হাদীসে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন **"মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৪৯০ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।** তাছাড়া পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ে অনেকগুলো আয়াতে এসেছে-

সূরা "কাফ" এর ১৮ নং আয়াত আল্লাহ বলেন-

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ: "সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে (ফেরেস্তা)।"

'সূরা ইসরা'র ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন,

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।"

এভাবে মহান আল্লাহ জিহবা তথা জবানের হিফাজতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। **সহীহ বুখারী এর ৮ম খণ্ডের ৬৪৮৪ নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,** **"একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে তার জিহবা ও হাত দ্বারা অবশ্যই ক্ষতি করবে না।"**

অর্থাৎ "একজন মুসলমান তার কথা ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কোনকিছু করবে না, যাতে অন্য মুসলমানের কোন প্রকার ক্ষতি হয়।" সহীহ বুখারী'র ৮ম খণ্ডের ৬৪৭৪নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার জিহবা ও তার দুই উরুস্থিত তা (লজ্জাস্থান) স্থানের জিম্মাদার হলো আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হবো।"

সহীহ বুখারীর ৮ম খণ্ডের ৬৪৭৫নং হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে আর চুপ থাকে।”

অর্থাৎ আপনি কথা বললে ভালো ভালো কথা বলবেন, তা না হলে চুপ থাকবেন। রাসূল (ﷺ) আরো বলেন- ‘রোযা হলো ঢালস্বরূপ।’ সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৮৯৪ ও ১৯০৪।

প্রশ্ন: রোযা রেখে যদি কেউ তার জিহবার হেফাযত না করে তাহলে কি তার পাপ হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কোন ব্যক্তি যদি রোযা রেখে মিথ্যা বলা, অশ্লীল এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত না রাখতে পারে তাহলে তার পরিণাম সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখার পরও মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ বর্জন করেনি, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৯০৩)

অর্থাৎ রোযা রেখে যদি কেউ মিথ্যা বলা, খারাপ কাজ, গীবত, গালি দেওয়া এসব থেকে বিরত হতে না পারে তাহলে আল্লাহর নিকট তার এ না খেয়ে থাকার কষ্ট, ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট ভোগ করার মূল্য নেই। এসব আল্লাহর নিকট অর্থহীন।

এর অর্থ এই নির্দেশ করে যে, এসব কাজে তার রোযা ভঙ্গ হবে না ঠিকই কিন্তু রোযা যে প্রতিদান পাওয়ার কথা তা থেকে সে বঞ্চিত হবে। সে রোযার কোন প্রতিদান সাওয়াব পাবে না। তা হবে প্রতিদানহীন রোযা। যেমন- রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, “অনেক লোক আছে যারা রোযা রাখে কিন্তু তারা ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট ছাড়া কিছুই প্রতিদান পায় না।” (সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড নং ৩ হাদীস নং ১৬৯০ এর বর্ণনা)

রোযা রেখে খারাপ কাজ, মিথ্যা বলা অশ্লীল কথা, কাজ অব্যাহত রাখলে রোযার কারণে ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট ছাড়া তার জন্যে কোন উপকার হওয়ার নেই। রোযার আসল উদ্দেশ্য, রোযার শিক্ষা কিছুই অর্জন হবে না।

প্রশ্ন: রোযার মাসে গীবত ও পরনিন্দার পরিণাম কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলামী বিধান মতে অন্যতম পাপ বা নিকৃষ্টতম পাপ হলো গীবত, পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করা। এ সম্পর্কে যেমন মহান আল্লাহ কুরআনে “সূরা হুমাজার” ১নং আয়াতে বলেন-

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ: "প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।"

অর্থাৎ অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ গীবত পরনিন্দাকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সূরা হুজরাত এর ১২ নং আয়াতের আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: "মুমিনগণ, তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কত ধারণা পাপ, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না, তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তোমরা স্বভাবই এটা অপছন্দ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও করুণাময়।"

আল্লাহ পরনিন্দাকে চরম ঘৃণিত, নিকৃষ্ট হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এর জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করতে অসাধারণ উদাহরণের অবতারণা করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন- তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে রাজি হবে? প্রথমত, ভাইয়ের মাংস অর্থাৎ মানুষের মাংস খাওয়া হারাম, তাছাড়া মৃত ভাইয়ের মাংস তা আরো অনেক বড় পাপ। সুতরাং পরনিন্দা বা গীবত দ্বিগুণ পাপ। এটা অনেক বড় গুণাহ।

হাদীসে এসেছে- "একদিন রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, গীবত কী? তারা জবাবে বললো এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, যদি কোনো লোক অন্য কারো অনুপস্থিতিতে কিছু বলে যা তার সামনে বললে সে অসন্তুষ্ট হতো, তাহলে এমন কিছু বলা গীবত। (সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৬২৬৫)

অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে কোন সত্য নিন্দার বিষয় বলাটাও গীবত। তাই বলা হয়েছে গীবত একটি নিকৃষ্টতম পাপ। সুনানে আবূ দাউদ এর অন্য একটি সহীহ হাদীসে এসেছে "হযরত

আয়েশা (রা.), হযরত সাফিয়া (রা.) সম্পর্কে রাসূর (ﷺ) কে কিছু বলছিলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কী বলছো, যদি- একটি শব্দ হলেও তা গীবত। (সুনানে আবূ দাউদ, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৮৫৭)

একই গ্রন্থের ৪৮৬০ নং হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি দেখলাম কিছু লোকের জিহবা তাদের পিঠের সাথে আটকানো রয়েছে। তখন অনেক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, "তারা ওইসব লোক যারা পরনিন্দা করতো।"

এসব হাদীস থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি, গীবত কত বড় পাপ, এ পাপ থেকে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন: ডা. জাকির রোযার মাসে আরো কী কী কাজ আছে, যা করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযার মাসে আরো যে সব কাজ করা মাকরূহ, যা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তা হলো-

১. অনেকে আছেন যারা রাতে জেগে থাকার কারণে বা রাতে নামাজ ইবাদত করার কারণে দিনে ঘুমিয়ে কাটায়। এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. অলসতার কারণেও অনেকে দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটায়। এমন করা মাকরূহ।

৩. অনেকে আছেন যারা দিনের সময় আনন্দ ফুর্তি হইহুল্লোড়, খেলাধুলা, গল্প করে পার করে, তারা রসূল (ﷺ) সুন্নাতবিরোধী আরো অনেক কাজ করে থাকে।

৪. লোক দেখানোর জন্য বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয় এমন ইফতার পার্টির আয়োজন করা।

৫. অনেকে আছেন যারা বাড়ির মহিলাদেরকে সাহরি ও ইফতারিতে অনেক বেশি বেশি খাবার আয়োজন করতে বলেন, সে কারণে ইবাদত বাদ দিয়ে তাদেরকে অধিকাংশ সময় রান্না ঘরে ব্যস্ত থাকতে হয়। এমন করা মাকরূহ।

৬. অনেকে আছেন যারা আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে ঈদের জন্য ঘর সাজাতে ব্যস্ত থাকে।

৭. অনেকে আছেন যারা নিজেরকে আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন, এমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৮. বাজে বাজে সময় নষ্ট করা।

৯. অনেকে আছেন যারা রাতের অধিকাংশ সময় গল্প গুজব করে কাটায়। এমন করাটা মাকরূহ।

১০. রাতের অধিকাংশ সময় খাওয়া দাওয়াতে অতিবাহিত করা। আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত যেকোনো অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করা।

১১. অনেকে আছেন যারা রোযার শেষ দশদিনে আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে ঈদের কেনাকাটায় বেশি ব্যস্ত থাকে। এমন করা মাকরূহ।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রমযান মাসে ইসলামী তথা দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি কেন এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আপনি তো জানেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশ হলো **'পড়'** অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশ অবশ্যই নামাজের নয়, রোযা বা হজ্বেরও নয়। বরং এই নির্দেশ হলো ইকরা বা পড়। যেমন আল্লাহ কুরআনের **সূরা আলাক এর প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে** বলেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

অর্থ: "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

কুরআনে মানুষকে প্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাহলো **'পড়'**। এখানে কেবল পড়তে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে- তোমার প্রভুর নামে পড়। পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পড়া যা প্রভুর নামে হওয়াটা আবশ্যক। জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রভুর জন্য। **মহান আল্লাহ সূরা মুজাদালা'র ১১ নং আয়াতে বলেন,**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দিবেন। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।”

সূরা বাকারায় আল্লাহ আরো বলেন, “তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর নিয়ামত প্রাপ্ত হয়, উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান।”

এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের “কিতাবুল ইলম, এর ৭১নং হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।”

মহান আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাকে কল্যাণ করতে চান, নিয়ামত দিতে চান তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। সহীহ মুসলিম এর ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০০৬ এ রাসূল করিম (ﷺ) আরো বলেন- “যখন কোনো লোক মারা যায়, মৃত্যুর পর তার সকল কাজ স্থগিত হয়ে যায় কেবল তিনটি জিনিস জারি করে থাকে, তাহলো- সে যদি জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং যে ব্যক্তি সৎ সন্তান রেখে যায়; যারা তার জন্য দু’আ করতে থাকে।”

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করার পর তার সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কোনো কিছুই আর তার কাজে আসে না। তবে তিনটি বিষয় তার জন্য কল্যাণকর হয় তার প্রথমটি হলো- সদকায়ে জারিয়া। সদকায়ে জারিয়া হলো এমন সৎ কাজ যা প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে এবং মানুষের কল্যাণ অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় হলো- অপরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেওয়া। এই দ্বীনি জ্ঞান অন্যজন শিখে আমল করালে করলে তা জ্ঞান দানকারীর জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে যায়। শেষটি হলো- এমন সন্তান রেখে যাওয়া; যারা তাদের পিতামাতার জন্য দু’আ করতে থাকে। তাই দ্বীনি ইলম অর্জন এত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনে আরো বলেন (সূরা নাহল, আয়াত- ৪৩)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম, অতেএব যদি তোমরা না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সেই বেশি গ্রহণযোগ্য যে জ্ঞানী এবং জ্ঞানী লোকের জন্য এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ অবশ্যই বেশি। আখিরাতে বেশি মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানীরাই অগ্রগামী। এজন্য রমযান মাসে দ্বীনি ইলম অর্জন করার জন্য এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে সে বেশি মর্যাদা ও বেশি সাওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে।

রমযানের ১৩তম শিক্ষা

রোযার সময় অনুমোদিত কার্যাবলি

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি মহিলারা খাবার জিহবায় চেখে দেখতে পারবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কোনো ব্যক্তি যে রান্না করে হোক সে পুরুষ কিংবা মহিলা তার সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা হলো যা আমরা সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ২৫ নং হাদীস হতে জানতে পারি। হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খাবারের কোন অংশ জিহবায় দিয়ে দেখলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।"

হাদীসটি সহীহ বুখারীতে মুতাল্লাক। বায়হাকি সহীহ ইবনে সায়বা ও অন্যান্য হাদীসে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, রোযার স্বাদ ও লবণ চেখে দেখা রোযার জন্য উত্তম। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, খাবারের স্বাদ ও লবণ চেখে দেখা জায়েয কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবার গলার মধ্যে প্রবেশ না করে এবং খাবার গিলে ফেলা না হয়। ইবনে আব্বাস আরো বলেন, এটা কেবল প্রয়োজন হলেই জায়েয। অন্যথায় করা যাবে না। যেমন ইমাম হাম্বল প্রয়োজন না হলে খাবার চেখে দেখাকে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে তাইমিয়াহও অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখাকে মাকরূহ বলেছেন। যদি কোন রাধুণী মনে করে যে, খাবারের লবণাক্ত বা মিষ্টতা চেখে দেখা দরকার তাহলে সে সামান্য পরিমাণ খাবার তার জিহবার ওপর দিয়ে টেস্ট করবে এবং তা সাথে সাথে ফেলে দিবে। এমনটা করা জায়েয। তবে তা অবশ্যই গিলবে না। এমন করার কারণে তার রোযা ভাঙ্গবে না।

এমন যদি হয় যে, কোনো মা তার সন্তানকে খাবার খাওয়ানোর সময় তার সন্তানের খাবার চিবিয়ে না দিলে সন্তান খেতে পারে না তাহলে ঐ মা খাবার চিবিয়ে দিতে পারবে, তবে অবশ্যই তাকে খাবার গিলে ফেলা চলবে না। এটাতে তার রোযা ভাঙ্গবে না। প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ চেখে দেখা জায়েয। কিন্তু ক্ষুধার কারণে বা অপ্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা মাকরূহ। এর অর্থ এতে রোযা ভাঙ্গবে না কিন্তু এমনটা করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে খাবার চেখে দেখা জায়েয, তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা গিলে ফেলা না হয়।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো সুরমা ব্যবহার সম্পর্কিত। চোখে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানি যে, চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত, রোযা অবস্থায় কি সুরমা ব্যবহার করা জায়েয?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ্যালকোহল যা আমাদের উপমহাদেশে সুরমা হিসেবে পরিচিত, এটা চোখে ব্যবহার করা সুন্নাত। রসূল (ﷺ) এটি ব্যবহার করতেন। আমরা **সুনানে আবু দাউদ এর ২য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ২৩৭২ নং হাদীসের** বর্ণনা হতে জানতে পারি-

"হযরত আনাস (রাঃ) রসূল (সঃ)- এর খাবার তৈরি করতেন। তিনি সুরমা ব্যবহার করতেন কিন্তু রসূল (ﷺ) তাকে নিষেধ করেন নি, তিনি রোযা অবস্থায় নিষেধ করেন নি।"

রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার করা জায়েয, সুরমার ব্যবহার রোযা ভঙ্গ করে না। এমন কি কেউ চোখের ড্রপ, কানের ড্রপ ব্যবহার করার পর তার স্বাদ গলায় পৌঁছার পরও তা রোযার ক্ষতি করবে না। নাক, কান গলার চিকিৎসার ডাক্তারগণ যদি আপনাকে এসব দেয়, যা ব্যবহার করার কোনো পর্যায় আপনি তার স্বাদ বুঝতে পারেন, তাহলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেক ফকীহ বলেন যে, এগুলো স্বাভাবিক খাবারের পর্যায়ে পড়ে না বা স্বাভাবিক খাবার নয়। যদিও এগুলো ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট সময় পর তা গলায় পৌঁছে এবং এর স্বাদ অনুভব হয়। তবুও তা রোযা ভঙ্গ করবে না। ফকীহদের অন্য একটি দল মনে করেন, যদি তা গলায় পৌঁছে তাহলে তা রোযা ভঙ্গ করবে। যেহেতু এসব খাবার কোন স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না। এ বিষয়ে অধিকাংশ আলেম একমত পোষণ করেন। নাকের ড্রপের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এটা ইফতারের পর ব্যবহার করা উত্তম। অতি জরুরি হলে তা ব্যবহার করার পর যদি গলায় পৌঁছে তাহলে ফেলে দিতে হবে। কান ও চোখের ড্রপের ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি আতর বা পারফিউম ব্যবহার করা জায়েয?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আতর ব্যবহার করা, বিশেষ করে কাপড়ে পারফিউম ব্যবহার করা এবং তার সুগন্ধ নেওয়া জায়েয। পারফিউম যদি ধোঁয়ার (ধুপ) না হয়, কেবল কাপড় বা

শরীরে ব্যবহার করা হয়। তাহলে তা জায়েয হবে। পারফিউম যা ধোঁয়ার (ধুপ) মাধ্যমে ছড়ায়, যা পেটের মধ্যে বা নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এমন হলে তা রোযা অবস্থায় ব্যবহার করা না জায়েয। পারফিউম, আতর ব্যবহার করলে বা তার সুগন্ধ নিলে তা রোযা ভঙ্গ করবে না।

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি ইনজেকশন নেওয়া জায়েয?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: চিকিৎসা ক্ষেত্র অনেক প্রকার ইনজেকশন রয়েছে। যেমন- ইনটারভেনিসিভ ইসজেকশন, ইন্টারমাসকুলেন ইনজেকশন, সব কাইটেন ইনজেকশন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপকভাবে বলতে গেরে ইনজেকশন হলো যা কোনো লোক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করে থাকে, যা মূলত খাবার গ্রহণ করার সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজ ইনজেকশন নেয়া। কোনো লোক অতিরিক্ত ডিহাইড্রেশনে ভুগলে কিংবা মুখ দিয়ে খাবার গ্রহণ করতে না পারলে সাধারণত তার ইনজেকশন নেওয়া খাবার গ্রহণের সমপর্যায়। তাই এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

যদি ইনজেকশন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য না হয়ে কেবল চিকিৎসার জন্য হয় যেমন ইনসুলিন ইনজেকশন বা পেনিসিলিন ইনজেকশন, তাহলে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। এ ধরনের যে সকল ইনজেকশন কেবল চিকিৎসা প্রয়োজনে এবং যা খাদ্যের পরিপূরক নয় তা রোযা অবস্থায় দিনের বেলা গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদি অধিকাংশ ফিকাহবিদ (ইমাম) একে মাকরূহ বলেছেন এবং ইফতারের পর ইনজেকশন নেওয়াকে পছন্দনীয় বলেছেন, কিন্তু এগুলো গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ এগুলো কোন স্বাভাবিক খাবারের মতো নয় এবং খাদ্যের কাজও করে না।

প্রশ্ন: মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে নাকের ড্রপ, জিহবাতে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা বা বিভিন্ন প্রকার টেস্ট করা কি রোযা অবস্থায় জায়েয হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মেডিকেল সাইন্সে অনেক প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি রয়েছে এবং অনেক প্রকার পরীক্ষা- নিরীক্ষাও রয়েছে যা তালিকা করলে বিশাল বড় হবে। কোনো কোনো ট্যাবলেট আছে যেগুলো সাধারণত ননিজায়েলার জন্য গ্রহণ করা হয়। এগুলো সাধারণত ২ প্রকার সমস্যার বা রোগের চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এমন ধরনের ট্যাবলেট যা কেবল জিহবাতে ব্যবহার করা হয় এবং যা গিলে ফেলা হয় না। কেবল শরীর শুষে নেয় এবং যা শরীরে খাদ্যের কাজ করে না এমন ধরনের ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে এ ধরনের ট্যাবলেট অবশ্যই গিলে ফেলা যাবে না। শরীর কেবল তা শুষে নিছে। নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো নাকের ড্রপ ব্যবহার করলে তা যদি গলার মধ্যে দিয়ে পেটে না যায় তাহলে তা ব্যবহার করাও জায়েয। কানের ড্রপ ও চোখের ড্রপ ও ইনজেকশন ও জায়েয যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

বিভিন্ন প্রকার মেডিকেল টেস্টের নিয়ম হলো- মেডিকেল টেস্টের জন্য শরীরে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রবেশ করানো জায়েয। যেমন জরায়ুতে চিকিৎসার জন্য আঙ্গুল প্রবেশ করানো, বা অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট যেমন আই ইউসি ক্যাসেট ও রামকোপ এসবই ব্যবহার করা জায়েয, এমনকি আপনি যদি urialral এ কোন বস্তু যেমন ক্যাসেট ইত্যাদি টেস্ট ও চিকিৎসার জন্য প্রবেশ করান, তাহলে তা রোযা ভঙ্গ করবে না। একই ভাবে যেসব ইনজেকশন যা খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে নেয়া হয় না বরং কেবল চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় তা জায়েয। যদি খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে কোন ইনজেকশন নেয়া হয় তাহলে তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। টেস্টের জন্য শরীর থেকে রক্ত নিলেও রোযা ভাঙ্গবে না।

একইভাবে রোযা অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কোনো মলম, লোশন, ক্রিম ইত্যাদি শরীরে ব্যবহার করা জায়েয। এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বা রোযা ভাঙ্গবে না। আপনি যদি অন্য চিকিৎসা যেমন ল্যাপারস কোপি যা শরীরের চিকিৎসার জন্য করা হয় তা ব্যবহার করা জায়েয। গ্যাসটোসকপি, কোলোনোসকপি, এ্যানডোসকপি যা পাকস্থলীর টেস্টের জন্য করা হয় এবং তা যদি পেটে কোনো খাদ্য প্রবেশ না করায় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয। আবার কোন যন্ত্র স্পাইনাল কড ও ব্রনের টেস্টের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাও জায়েয। আবার এক্সরে করা হলে তাও জায়েয। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো মুখ ও নাক দিয়ে কোন ইন্সট্রুমেন্ট এবং শরীর পরিচর্যা ও খাদ্যের চাহিদা পূরণ ব্যতীত শরীরের অন্য অংশ দিয়ে কোন যন্ত্র শরীরের অভ্যন্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রবেশ করালে তাতে রোযা ভাঙ্গবে না, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র মলদ্বার, যোনি, জরায়ু দিয়ে প্রবেশ করালেও তাতে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ এগুলো দিয়ে শরীরে কোন প্রকার খাদ্য সরবরাহ করা হয় না এবং এগুলো শরীরে খাবার গ্রহণের কোন স্বাভাবিক উপায় নয়।

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কারো সন্দেহ হলো যে, "এটা তার রোযা ভেঙ্গে দিতে পারে, রোযা অবস্থায় সন্দেহ হলে তার মাসআলা কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রোযা অবস্থায় কোনো কাজ করা জায়েয কি নাজায়েয কারো যদি এমন সন্দেহ হয় যা সে কাজে রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে এমন সন্দেহ হয় তাহলে উত্তম হলো সে কাজ থেকে বিরত থাকা। কোন ব্যাপার যখন কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে তখন সে কাজ থেকে বিরত থাকাটাই ভালো। আপনার যদি মনে হয়, "এটা করা আমার জন্য নাজায়েয, " তাহলে আপনি তা করবেন না। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম নিয়ম হলো যা মহান আল্লাহ কুরআনের সূরা 'নাহল' এর ৪৩ নং আয়াত এবং সূরা আম্বিয়া'র ৭নং আয়াতে বলেন-

অর্থ: "যদি তোমরা না জানো, তবে যারা জ্ঞান রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।"

যিনি জানেন তাকে জিজ্ঞেস করাটাই উত্তম। তিনিই সার্বিক সমাধান দিয়ে দিবেন। এটাই ভালো, আর যদি তা করতে পারেন তাহলে সন্দেহের বিষয় থেকে বিরত থাকাটাই উচিত।

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়লো যে, তাকে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করা হলো কিংবা নিয়ম- কানুন তথা মাসআলা মাসায়েল না জানার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেললো। এমন পরিস্থিতিতে কি এই ব্যক্তির রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে? গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি কোনো রোযাদার অজ্ঞানবশত বা ভুল করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে এক্ষেত্রে যে বিধান রয়েছে তা কুরআনের সূরা নাহল এর ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "যার ওপর জবর দস্তি করা হয় এবং যার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব। আর তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।"

অর্থাৎ যদি কেউ বাধ্য হয়ে তা করে কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহভীতি অটুট থাকে তাহলে এক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে। যদি কেউ রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য হয় বা অন্য কেউ আপনাকে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করে বা রোযা ভঙ্গ হওয়ার মত কোন কাজ করতে বাধ্য করে তাহলে এই রোযা ভঙ্গের জন্য আপনি দায়ী হবেন না। দায়ী হবে যে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য করলো সে। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ আমার উম্মতদেরকে ক্ষমা করবেন- ভুল করলে, ভুলে গেলে এবং জোরপূর্বক করতে বাধ্য হলে।" (সহীহ ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ২০৪৩, ২০৪৫)

অর্থাৎ জোর করে বাধ্য করা ছাড়াও ভুল করলে এবং মনে রাখতে না পারার কারণেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন।

এ বিষয়ে কুরআনে সূরা আহযাব এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ

অর্থ: "এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই।" তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে আরো বলেন-

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

অর্থ: "সে তাই পায় যা সে উপার্জন এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাতে আমাদেরকে অপরাধী করো না।"

সুতরাং যেসব কাজ রোযা ভঙ্গের কারণ যেমন, খাওয়া, পান করা, সঙ্গম করা ইত্যাদি যা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। যদি কেউ এগুলো বাধ্য হয়ে করে যা কাউকে করতে বাধ্য করা হয় তাহলে এজন্য সে দায়ী হবে না। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় করে তাহলে সেজন্য সেই দায়ী হবে। দ্বিতীয়ত যদি কেউ এগুলো ভুলবশত করে, উদাহরণস্বরূপ কেউ সাহরী খাওয়া শুরু করলো এবং সে ভাবলো সুবহে সাদিক এখনও হয়নি, তাই খাওয়া চালিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু তার ধারণা ভুল। যখনই সে জানতে পারলো তখনই খাওয়া বন্ধ করে দিলো। যেহেতু এটা ছিলো তার ভুল, তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তৃতীয়ত, কেউ মনে রাখতে পারার কারণে এসব কাজ করে ফেলে যেমন কেউ মনে না রাখতে পারার কারণে খেয়ে ফেলে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। চতুর্থত, যদি কেউ অজ্ঞতাবশত এবং তার অসচেতনতার কারণে, যেমন- কেউ একজন জানে না যে, ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, ফলে সে গলার ভেতরে আঙ্গুল দিয়ে বমি করে তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন ইনশা- আল্লাহ।

এরূপ পরিস্থিতিতে অজ্ঞতার কারণে ভুল করলে, অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে, মনে না থাকার কারণে ভুল করলে এবং কোনো কাজ জবরদস্তির মাধ্যমে করতে বাধ্য হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মাতের এ চার প্রকার অবস্থায় ভুলের জন্য আল্লাহর ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অধিকাংশ আলেমের মতে, টুথপেস্ট ব্যবহার করা জায়েয। শায়খ ইবনে আব্বাস বলেন, টুথব্রাশের সাথে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যেভাবে মিসওয়াকের সাথে ব্যবহার করা হয় তেমনি ব্রাশের সাথে ব্যবহার করা যাবে। রসূল (সঃ) মিসওয়াক ব্যবহার করা নাজায়েয বলেননি। মিসওয়াক ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন এর কোনো অংশ গিলে ফেলা না হয়। টুথপেস্টের কোনো অংশ গিলে ফেলা নাজায়েয। সতর্ক হয়ে টুথপেস্ট ব্যবহার করা যাবে। অনেক আলেম এর তীব্র স্বাদ ও ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে এটা ব্যবহার করা মাকরূহ বলেছেন। টুথপেস্টের কোনো অংশ গিলে না ফেললে তাতে রোযা ভাঙ্গবে না।

প্রশ্ন: অযু করার পর বা মুখ ধোয়ার পর অনেকে থুথু ফেলতে থাকে। এ বিষয়ে বিধান কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক লোক আছেন যারা মুখ ধোয়ার পর, কুলি করার পর বা অজু করার পর থুথু ফেলতে থাকে। তারা মনে করে যে, হয়তো কিছু পানি গলার মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু নিয়ম হলো কুলি করার পর, মুখ ধোয়ার পর থুথু ফেলার কোনো দরকার নেই- এ বিষয়ে অধিকাংশ ইমাম একমত পোষণ করেছেন। যদিও কোনো কোনো ইমাম থুথু ফেলার বিষয়ে সমর্থন করেছেন, তবে তা কেবল একবার ফেললেই হবে। অনেক লোক আছেন যারা বারবার থুথু ফেলেন এমনকি তারা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে মুছতে থাকেন। তারা ভাবেন যে, পানি পাকস্থলিতে চলে যাবে। কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর জীবনী থেকে বা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূল (ﷺ) ও তার সাহাবিগণ সাহরির সময় আযান পর্যন্ত পানি পান করতেন এবং আযান শোনার সাথে সাথে পানি পান করা বন্ধ করতেন। কিন্তু এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না যে তারা থুথু ফেলতেন। থুথু ফেলার বিষয়ে হাদীসে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রোযা অবস্থায় অযু করার সময় কুলি করার পর থুথু একবার ফেললেই যথেষ্ট হবে। বারবার ফেলার দরকার নেই।

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় যদি কেউ এ্যাজমাতে ভোগে তাহলে সে কি অক্সিজেন, ইনহেলার বা অন্য কোন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ্যাজমা রোগের বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা রয়েছে। যেমন, অক্সিজেন, ইনহেলার, ট্যাবলেট ক্যাপসুল ইত্যাদি। অক্সিজেন, ইনহেলার কেবল ফুসফুসের প্রবেশ করে এবং এটি নিঃশ্বাসের সাথে আবার বের হয়ে যায় তাই এতে রোযা ভাঙ্গবে না, কারণ এটা পেটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অন্য এক প্রকার চিকিৎসা আছে তাহলো ডিপ্রেসাইজার করা হয় এটি আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। পার্টিকেলে এই ওষুধগুলো ঢুকানো হয় এবং সুঁইচ চাপার কারণে এক প্রকার প্রেসার সৃষ্টি হয়। এভাবে এটি ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়, এভাবে তা ফুসফুসে প্রবেশ করানোর ফলে তা পেটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই অধিকাংশ আলেম ডিপ্রেসাইজার ব্যবহার করা রোযা ভঙ্গের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ক্যাপসুলের

ক্ষেত্রে বলবো ক্যাপসুল এক প্রকার ওষুধ যাতে পাউডার থাকে। যখন এ ক্যাপসুল পাত্রে রেখে প্রেসার দেওয়া হয় তখন তা নজেল বা মাস্কের মাধ্যমে ফুসফুসে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এর কিছু অংশ পেটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই ক্যাপসুল ব্যবহার করে চিকিৎসা করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

কোনো ব্যক্তি এ্যাজমাতে ভুগলে রোযা অবস্থায় তার জন্য দুই প্রকার চিকিৎসা জায়েয। তাহলো- অক্সিজেন ইনহেলার ও পারফাম।

প্রশ্ন: অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ, এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক লোক আছেন যারা ফজরের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করাকে মাকরূহ মনে করেন। তারা একটি হাদীসের আলোকে এ ধারণা পোষণ করেন। যে হাদীসটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি, হাদীসটি বুখারী শরীফের ৩য় খণ্ডের কিতাবুস সিয়াম এর ১৯০৪ এবং ১৮৯৪ নং হাদীসে, যে হাদীসের বর্ণনা রসূল (সঃ) বলেন, "আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন, একজন রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও বেশি প্রিয়।"

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে লোকেরা মনে করে যে যদি মিসওয়াক করা হয় তাহলে মুখে গন্ধ থাকবে না। ফলে আল্লাহ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ উপভোগ করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, রোযা রাখার ফলে একজন রোযাদারের মুখে যে গন্ধ সৃষ্টি হয় তা মিসওয়াক করলেও বন্ধ হয় না। সাধারণত আমরা যখন মিসওয়াক করি, তখন আমাদের দাঁত, মাড়ি ইত্যাদি থেকে ময়লা খাদ্য কণা দূর হয়ে যায়। খাওয়ার পর মুখে যেসব খাদ্যকনা জমে তা মিসওয়াক করার ফলে পরিষ্কার হয়। কিন্তু রোযা রাখলে মুখে যে গন্ধ হয় তা আসলে পেট, পাকস্থলী থেকে আসে। রোযা রাখার কারণে পেট খালি হয়ে যায় ফলে খালি পেট মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। সুতরাং মিসওয়াক ব্যবহার করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূল (সঃ) বলেন, "এটা যদি আমার উম্মতের জন্য অতি কঠিন না হতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাজের পূর্বে তাদের জন্য মিসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম।"

অর্থাৎ এটা একটা নির্দেশ, অবশ্য পালনীয় কাজ। এটা যদি রোযার জন্য ক্ষতিকর হতো তাহলে তা রসূল (সঃ) বলে দিতেন। যেমন অন্য ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) বলে দিয়েছেন, রসূল (সঃ) নাকে বেশি বেশি পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে বলেছেন, সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ডের ২৩৩০ নং হাদীসে রসূল (সঃ) বলেন, নাকে বেশি বেশি পানি দাও, গড়াগড়া করো, কেবল রোযার সময় ব্যতীত।"

অর্থাৎ গড়গড়া করা বা নাকে পানি বেশি দেওয়া ভালো কিন্তু রোযার সময় করো না, কেননা তা পেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মিসওয়াক করা যদি ক্ষতিকর হতো তাহলে অবশ্যই তা বলে দেওয়া হতো যেমনটি গড়গড়া ও নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হয়েছে। রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয, আপনি এটি আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ সাওয়াব পাবেন।

প্রশ্ন: রোযার সময় যেসব কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাধারণত রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও যেসব কাজ করা জায়েয রমযান মাসেও সেসব কাজ করা জায়েয। কেবল যেসব কাজে রোযা ভঙ্গ হয় সেসব কাজ ব্যতীত। কিন্তু রসূল (সঃ) রমযান মাসে বিশেষ কিছু কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু কিছু কাজ করতে বা আমল করতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন অনেকগুলো হলো-

১. সাহরি খাওয়া, সাহরি খাওয়া অবশ্যই ত্যাগ করা যাবে না।
২. পারতপক্ষে সাহরি দেরি করে খাওয়া, এটা সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে হওয়াই উত্তম।
৩. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইফতার করা, সূর্যাস্তের পরপরই ইফতার করতে হবে।
৪. ইফতারিতে খেজুর ও পানি খাওয়া অর্থাৎ খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা উত্তম।
৫. ইফতারের পর রসূল (সঃ) নির্দেশিত দু‘আ পড়া।
৬. ইফতারির সময় অন্য রোযাদারদের সাথে রাখা বিশেষকরে গরিব লোকদেরকে ইফতারিতে রাখা।

আরো অন্যান্য যেসব কাজ রসূল (সঃ) করতে বলেছেন তাহলো-

১. রোযার মাসে যথাসম্ভব নেক আমল করা।
২. রমযান মাসে আমাদেরকে যত বেশি সম্ভব উদার ও মহৎ হতে হবে।
৩. কেউ যদি আপনাকে রাগানোর চেষ্টা করে বা খারাপ আচরণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে রোযাদারের উচিত উত্তেজিত না হওয়া বরং তখন বলতে হবে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।
৪. মিসওয়াক ব্যবহার করা।
৫. যদি সম্ভব হয় তাহলে রমযান মাসে ওমরা পালন করা।
৬. যত বেশি সম্ভব ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা, কুরআনের তাফসীর পড়া, হাদীস অধ্যয়ন করা এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

৭. যত বেশি সম্ভব ইসলামী মজলিসে অংশ গ্রহণ করা, যেমন সেমিনার, আলোচনাসভা, মাহফিল, যেখান থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা যায়।
৮. বিভিন্ন প্রকার ইসলামী অনুষ্ঠান শোনা; বা দেখা তা ভিডিও হতে পারে বা অডিও, যা আপনার ইসলামী জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটাবে।
৯. রোযাদার সর্বদা হাসিখুশি থাকবে মনমরা হয়ে থাকা যাবে না।
১০. অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
১১. পরিবারকে বেশি সময় দেওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
১২. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বেশি বেশি চিন্তা করা।
১৩. অন্যের দোষ, ভুল- ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া, অন্যের দোষত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা।

এছাড়া আরো কতগুলো কাজ রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে রসূল (সঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো-

১. ফরজ নামাজগুলো মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা।
২. যত বেশি সম্ভব সুন্নত ও নফল নামাজ পড়া।
৩. যতবেশি সম্ভব আল্লাহর কাছে দু'আ করা।
৪. যতবেশি সম্ভব আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা রমযান মাস হলো ক্ষমার মাস।
৫. যতবেশি সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করা।
৬. তারাবীহ নামাজ আদায় করা।
৭. বেশি বেশি নামাজ পড়া, বিশেষ করে রাতের শেষে ভাগে (তাহাজ্জুদ) নামাজ আদায় করা।
৮. ইতিকাফ করা।
৯. যাকাত দেওয়া।
১০. আত্ম উন্নয়ন এবং সংশোধন করা।
১১. লায়লাতুল কদর তালাশ করা।
১২. অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা এবং তাদের সাথে সংশোধন করা।
১৩. অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা।

রমযানের ১৪তম শিক্ষা

রোযার উপকারিতা

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: এর আগে আমরা রোযার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় রোযার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকারিতা আলোচনা করেছিলাম। আপনি কি রোযার অন্য উপকারিতাগুলো আলোচনা করবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা ছাড়াও রোযার আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপকারিতাগুলো আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যেসব উপকারিতা ছাড়া রোযার অন্য যে উপকারিতা রয়েছে সেগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলো হলো-

১. শারীরিক উপকারিতা,
২. মানসিক উপকারিতা ও
৩. সামাজিক উপকারিতা।

১. রোযার শারীরিক উপকারিতা

যেহেতু রোযা রাখতে হলে বান্দাকে অবশ্যই সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও যৌন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং যেহেতু শরীরের অন্যতম অংশ হলো পাকস্থলী- যা শরীরের অধিকাংশ রোগ- ব্যাধি বহন করে। এ সম্পর্কে হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, **হযরত মিকদাদ ইবনে মা'আদীকারব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, মানুষ যেসব পাত্র পরিপূর্ণ করে তন্মধ্যে মানুষের পেট অপেক্ষা আর কোন খারাপ পাত্র নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্যে কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট। এর থেকেও বেশির যদি প্রয়োজন হয় তবে এক- তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক- তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং অবশিষ্ট এক- তৃতীয়াংশ শ্বাস- প্রশ্বাস চলাচলের জন্য।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৩৪৯)**

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অধিকাংশ রোগ পাকস্থলীতেই সৃষ্টি হয়। কারণ- এটা বিভিন্ন রোগজীবাণু, যেমন- ব্যাকটেরিয়ার আবাসস্থল। মানুষ যে খাবার খায় তা সরাসরি পাকস্থলীতেই যায়। পাকস্থলী তা হজম ও প্রক্রিয়াজাত করে শরীরের বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে থাকে। আপনি জানেন যে, পাকস্থলী সারা জীবন আরো শাণিত করে তুলতে পারে। রোযা ব্যক্তির ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা বাড়ায়, ব্যক্তিকে অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল করে তোলে। যদি কোনা ব্যক্তি মনে করে যে আমি এটা অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল করে তোলে। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে আমি এটা করবো না, সেক্ষেত্রে রোযা ব্যক্তিকে এমন ইচ্ছার বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও বাস্তবায়নে সহযোগী হয়। রোযা এমন নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যে, ব্যক্তির কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সহযোগী হয়। মানুষকে প্র্যাকটিক্যাল করে তোলে। রোযা

অভ্যস্ততার সঙ্গী হয়ে কাজ করে। রোযা ব্যক্তির শারীরিক মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করে থাকে। রোযা ব্যক্তির সার্বিক উন্নতি সাধন করে। রোযা হলো এক প্রকার সাধনা, প্রশিক্ষণ। রোযা মানুষের আচরণ পরিবর্তন করে। যদি আচরণ পরিবর্তন করা কঠিন কাজ। যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তা পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। এটাকে বলা যায় মনের সাথে জিহাদ করা। অর্থাৎ নিজের মনের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে তার কাজ চালিয়ে যায়; এটা কখনোই কোনো বিরতি পায় না। যখন রোযাদার রোযা পালন করে তখন শরীরের এই অতি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অঙ্গ দিনের বেলা কোনো খাবার পায় না। ফলে এই সংবেদনশীল এই অঙ্গ অনেকটা সময় বিরতি পায়, ফলে শরীরে যে সব দূষণ সৃষ্টি হয় তা দূরীভূত হয়ে শরীর শোধিত হয়। তাই রোযা শারীরিকভাবে অনেক উপকারী। রোযা যেমন শারীরিকভাবে অনেক উপকারী তেমনি রোযা অনেক রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। অনেক রোগ নিরাময় করে।

২. রোযার মানসিক উপকারিতা

রোযার মানসিক উপকারিতা অনেক। রোযা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, ধৈর্যশীল করে তোলে এবং অধ্যবসায়ী করে তোলে। রোযা ব্যক্তিকে আত্ম নিয়ন্ত্রণের যোগ্য করে তোলে। তাকে নিয়ামনুবর্তী করে তোলে। আত্ম সচেতন করে তোলে। রোযা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের বিবেককে আরো শাণিত পরিবর্তন করে দেয়, আমরা দু'বার খেতে অভ্যস্ত হই- একবার প্রথম রাতে- আরেক বার শেষ রাতে। আমাদের সারা বছরের খাওয়ার অভ্যাসটা পুরোটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ভাবে রোযা আমাদেরকে শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন আনে। এটা আমাদের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কামনা বাসনাকে অবদমিত করে।

৩. রোযার সামাজিক উপকারিতা

রোযার সামাজিক উপকারিতার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো- দুঃখ কষ্ট অনুধাবন বিশেষ করে ধনীরা গরীবের কষ্ট অনুধাবন করার সুযোগ পায়। গরীবদের অভাব ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া রোযা রাখলে ক্ষুধার অভাব বাসস্থান ও অন্যান্য অভাব বুঝতে পারে। আমাদের মধ্যে যারা ধনী তারা কখনো ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারেন না। তারা রোযা পালনের মাধ্যমে ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারে। এভাবে আমাদের মাঝে গরীবের প্রতি ভালবাসা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করা কঠিন কিন্তু আপনি যদি নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে না পারেন তাহলে আপনি কীভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে করবেন। তাই বলা যায়, রোযা ব্যক্তিকে বহুমুখী বা ডাইনামিক হতে শেখায়। এ কারণে রোযা জিহাদের আগেই ফরজ করা হয়েছিলো। রোযা নবুওয়তের ১৫তম বছরে ফরজ করা হয়। এটা হিজরী ২য় মাস। এর পরের বছর জিহাদ ফরজ করা হয়। তাই বলা যায়, আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই রোযার মাধ্যমেই প্রথমে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছেন। তারপর তাদের ওপর জিহাদ

ফরজ করেছেন। এ রোযা জিহাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে মানসিকভাবে অনেক সাহায্য করেছে। সাধারণত আমরা তিনবার খাই। কিন্তু রোযা আমাদের খাওয়ার এ অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দেয়। রোযা মানুষকে দয়া করতে ও দয়া পেতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যদি কেউ অন্যের প্রতি দয়াশীল হয় তাহলে আল্লাহও তার প্রতি দয়াশীল হবেন।”

রোযা আমাদের সমাজকে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করে তোলে। রোযা মানুষকে উদার হতে শেখায়, রোযা কেবল গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল দায়িত্বশীল করে তোলে না বরং রোযা পুরো মানবসমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। রোযা ব্যক্তিকে পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে সাহায্য করে। যেমন: আপনি হয়তো পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার সুযোগ পান না। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু রোযা কমপক্ষে দু'বার পরিবারের সবাইকে একত্র করে। একবার হলো সাহরির সময় যখন পরিবারের সবাই এক সাথেই সাহরি খায়, অন্য বার হলো- ইফতারের সময় ইফতারীতে সবাই একত্র হয়- এক সাথেই ইফতার করে। রোযা পারিবারিক সম্পর্ককে গভীর, দৃঢ় করে, পিতা - মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক গভীর হয়; বিশেষ করে যে বিষয়টি পশ্চিমা বিশ্বে চরম অবহেলা করা হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে রোযা সামাজিক আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বুঝতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন সে জন্য আমরা তাঁর শুকরিয়া কতটুকু আদায় করছি, কত সময় তার জন্য ব্যয় করছি তা বুঝতে পারি। তিনি আমাদের যে সমস্ত নিয়ামত যেমন- খাদ্য, পানীয়, ফলমূল দান করেছেন সেগুলোর পিছনে কত সময় ব্যয় করছি, আবার তার শুকরিয়া করছি কিনা, তিনি যে বাতাস দান করেছেন যার জন্য আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি তার শুকরিয়াই বা কতটুকু আদায় করছি ইত্যাদি বুঝতে পারি।

ধনীরা এসব নিয়ে খুব কমই চিন্তা করে থাকে। কিন্তু রোযা তাদেরকে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। রোযা তাদেরকে গরীবদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে। অন্যদের সাহায্য সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরের দুঃখ কষ্টে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করে। রোযা অপরের দোষ- ত্রুটি ক্ষমা করতে শেখায়। এভাবে রোযার সামাজিক উপকারিতা অনেক উপায়ে অর্জন হয়। যেমন রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদীস। তিনি বলেন, “যদি তোমরা দুনিয়ায় অপরের প্রতি দয়াশীল হও তাহলে তোমরা পরকালে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।” রোযা আত্মীয়তার বন্ধন বৃদ্ধি করে। অনেক সময় আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে, বন্ধুদেরকে ইফতারীতে শরীক করি যা আমাদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন বৃদ্ধি করে। এ সম্পর্কে মুসলিম এ সহীহ হাদীসে এসেছে, **রাসূল (ﷺ) বলেন, “যখন তোমাকে কেউ দাওয়াত করে তখন তুমি তা উপেক্ষা করো না।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৩৭৯)**

রমযান মাসে মুসল্লিগণ একে অপরকে ইফতারীতে দাওয়াত করে যা পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। সমাজের মধ্যে আত্ম উন্নয়ন,

ইসলাহ এবং দাওয়াতী কাজের জন্য রোযার মাস খুবই উপযোগী সময়। অনেক লোক আছেন যারা নিয়মিত মসজিদে যান না, তারাও রমযান মাসে নিয়মিত মসজিদে আসেন, তারাবীহ নামাজের জন্য মসজিদে আসেন। এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ সময়।

রোযার মাস অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার উত্তম সময়। রোযার মাসে তারাবীহ নামাজ ও ইফতারের সময় রোযাদারগণ পরস্পর সাক্ষাত হয় তাই পরস্পর ইসলাহের সুযোগ পাওয়া যায়।

রমযান মাসে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। এ সময় দাওয়াতী কাজ বেশি বেশি করা যেতে পারে। কেননা এ মাসে মনের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ এ মাসে হিদায়াত দান করতে পারেন। রমযান মাসে অন্যের ওপর সহানুভূতিশীল হওয়ার তাকিদ রয়েছে। তাই এ মাসে মানুষ বা রোযাদারগণ সহানুভূতিশীল ও দানশীল হয়। যেমন **রাসূল (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যারা অন্যের প্রতি দয়া দেখায়।"** (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, "তুমি যদি দয়াশীল হও তাহলে তোমাকেও দয়া করা হবে।" তিনি আরো বলেন, তোমার প্রতি কেউ দয়া না দেখালেও তুমি তার প্রতি দয়া দেখাও। তাই রোযা সমাজ নির্মাণ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিতে নানাভাবে অবদান রাখে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, একজন লোক কীভাবে বিনয় ও উদারতা বুঝবে? উদারতা ও বিনয় বলতে কী বুঝায়? একজন মুসলমান রমযান মাসে বিনয় ও নম্রতার জন্য কী কী করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: একজন ব্যক্তি সবসময়ই বিনয়ী হবে। বিশেষ করে রমযান মাসে সে তার কথায় ও কাজে আরো বেশি উদার ও মহৎ হবে। একজন ব্যক্তির জন্য বিনয়ী হওয়ার অনেক উপায় আছে উদাহরণস্বরূপ, কেউ মনে করলো অন্যকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা মহত্ত্ব, উদারতা। কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একমাত্র মঙ্গল কাজ নয়। বরং এটা হলো অসংখ্য মহৎ কাজের মধ্যে একটি মহৎ কাজ। আরো যেসব মহৎ কাজ আছে তার মধ্যে অন্যকে জ্ঞান দান করা, শিক্ষা দেওয়া, অন্যকে সংশোধন করা। দাওয়াতি কাজ করা, অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করা। অন্যকে ইলম শিক্ষা দেওয়াও মহৎ কাজ। অন্যকে কায়িক শ্রম দিয়ে সাহায্য করাও মহৎ কাজ। যে কোনো ধরনের কাজে অন্যকে সহযোগিতা করাও মহৎ কাজ।

সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের ৫নং হাদীসের বর্ণনা- **রাসূল (ﷺ) অন্য মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি উদার ছিলেন এবং রমযান মাসে তার উদারতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে** পৌঁছাতো। সুনানে

তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর এর ৩২৩৩ নং হাদীসে এসেছে- **রাসূল (ﷺ) বলেন, জান্নাতে কতগুলো কক্ষ থাকবে সেখান থেকে বাইরের সব দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব দেখা যাবে। এসব কক্ষগুলো তাদের জন্য তৈরি করা হবে যারা মহৎ, উদার এবং যারা গরীবদের সাহায্য করে, যারা নিয়মিত রোযা রাখে এবং যারা রাতে নামাজ আদায় করে।**

অর্থাৎ এসব লোকদের জন্য এ ধরনের বিশেষ কক্ষগুলো তৈরি করা হবে। যেমন, **সূরা "আলে ইমরান" এর ১৩৪ নং আয়াতে** এরশাদ হচ্ছে-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ্ এরূপ সদাচারীদের ভালোবাসেন।"

সূরা- আরাফ এর ১৯৯ নং আয়াতে আরো এরশাদ হচ্ছে-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ: "আরো ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলা, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে থাকো।"

সূরা- নূর এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: "তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

সুনানে ইবনে মাজাহ'র একটি হাদীসে (৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৭৪৬) আরো বর্ণিত আছে- **রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে তোমাদের কেউ কোন রোযাদারকে খাওয়ায় তাহলে সে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে। কিন্তু রোযাদারের সওয়াব কমবে না।"**

এ হাদীস দ্বারা অন্যকে খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ মহত্ত্ব এবং উদারতা।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযার মাস হলো ক্ষমার মাস এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসে পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। আপনি কি এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাস হলো ক্ষমার মাস, যেহেতু আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করি, তাই আল্লাহ আমাদেরকে অপরকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। **সূরা- তাগাবুন এর ১৪ নং আয়াতে** আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের দুষমণ। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, তাকিদ দিয়েছেন। ক্ষমার ব্যাপারে যত বেশি উদার হওয়া যায়, যত বেশি ক্ষমা করা যায় তত ভাল, মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন।

নবী- রাসূলদের জীবন থেকে আমরা সুন্দর উদাহরণ পাই। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ক্ষমার একটি সুন্দর উদাহরণ পাই। আমরা জানি, হযরত ইউসুফ (আ.)- এর সৎ ভাইয়েরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাকে হিফাজত করেন, পরবর্তীতে তিনি সে দেশের শাসক হন। তখন তিনি তার ভাইদেরকে নাগালে পান। তিনি তার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ **সূরা ইউসুফ এর ৯২ নং আয়াতে** এরশাদ করেন,

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থ: (হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদেরকে বলেন) "বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সব মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান।

ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ক্ষমার সর্বোত্তম উদাহরণ আমরা পাই মহানবী (ﷺ) এর জীবনে। মহানবী (ﷺ) যখন মক্কায় ছিলেন তখন মুশরিকরা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে এবং পরবর্তীতে তার অনেক আত্মীয়রা তার চাচাকে শহীদ করেছে। কিন্তু যখন তিনি মক্কা বিজয় করলেন তখন মক্কার মুশরিকদের ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ সূরা আহযাব এর ২১ নং আয়াতে বলেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: "তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

সূরা ফুসসিলাত এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থ: "সমান নয় ভালো ও মন্দ, জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

সূরা 'শূরা' এর ৩৭ নং আয়াতে আরো এসেছে,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

অর্থ: "যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে।"

কুরআনে এসব আয়াতের দ্বারা মহান আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

প্রশ্ন: এবারের প্রশ্ন রাগান্বিত হওয়া সম্পর্কিত। ডা. জাকির, রমযান মাস হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মাস। রোযার মাসে কোনো রোযাদার রাগান্বিত হওয়ার কারণে কোনো অজুহাত পেশ করতে পারে? অর্থাৎ রোযাকে রাগান্বিত হওয়ার কারণ বা ওজর হিসেবে পেশ করতে পারে কিনা। একজন রোযাদার বলল আমি রোযা রাখার কারণে ক্ষুব্ধ।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আসলে রোযাদার আপনার প্রশ্নের বিষয়ের বিপরীত আচরণ করবে। অর্থাৎ কোনভাবেই রাগ করবে না। একজন প্রকৃত রোযাদার অবশ্যই রেগে যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ কুরআনে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন- **সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে।** এখানে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "আমি তোমাদের ওপর রোযাকে ফরজ করে দিয়েছি, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিলো। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

অর্থাৎ রোযা হলো তাকওয়া অর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধির জন্য, আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাই একজন রোযাদার অবশ্যই রাগান্বিত হবে না। কেননা "বীর সে লোক নয়, যে শক্তিমত্তায় অন্যকে পরাজিত করে। বরং বীর সেই ব্যক্তি যে তার রাগের সময় তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য কেউ তাকে রাগান্বিত করলে সে তাকে ক্ষমা করে দেয়।"

যদি তোমাকে কেউ রাগান্বিত করে, যদি কেউ তোমাকে উত্তেজিত করে তাকে বলো, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।"

সহীহ বুখারী এর ৩য় খণ্ডের ১৮৯৪ নং হাদীসে আরো এসেছে- **রাসূল (ﷺ) বলেন, "যদি তোমাকে কেউ উত্তেজিত করে, রাগান্বিত করে, তাহলে তুমি তাকে বলো, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।"**

রোযা মূলত আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। তাই রোযা অবস্থায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। রোযা রাগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম।

প্রশ্ন: ডা. জাকির, রোযার মাসে ওমরা পালন করা উত্তম করা হয়েছে। এ বিষয়ে কি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান মাসে ওমরা পালন করার ফযিলত অবশ্যই বেশি। কেননা রাসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবিদেরকে রমযান মাসে ওমরা পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি সাহাবিদেরকে রমযান মাসে ওমরা পালন করতে বলেছেন।

সহীহ মুসলিম এর অনেকগুলো হাদীসে এ বিষয়ে আরো বর্ণনা আছে। **সহীহ বুখারী এর ৮ম খণ্ড, এর ৬১১৪ নং হাদীসে** এসেছে, **রাসূল (ﷺ) বলেন- "যদি কেউ রমযান মাসে ওমরা পালন করে তাহলে তা হজ্জের সমান হবে।"**

অর্থাৎ রমযান মাসের যেকোনো সময় হোক তা শুরুতে বা শেষে তা হজ্জের সমান হবে।

প্রশ্ন: ডা. জাকির নায়েক, হুসনুল খুলুক দ্বারা কী বুঝায়? এবং "তোমরা পরিবারের নিকট ভালো হও" দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সাধারণত রোযার সময় মানুষ বলে থাকে যে, আমি দুর্বল, অসুস্থ এবং বিরক্তি প্রকাশ করি, কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশ হলো রোযার সময় হাসিখুশি থাকতে হবে। রোযাদারকে অবশ্যই মনমরা থাকা যাবে না। তাকে সর্বদা হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের সাথে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। পরিবারের সাথে বেশি সময় কাটাতে হবে। কারণ তাহলে তারাও সাথে বেশি সওয়াব পাবে। হুসনুল খুলুক হলো- রমযান মাস- সহ অন্যান্য মাসেও সাধারণ উত্তম আচরণ করা। কিন্তু রমযান মাসে অন্যান্য মাসের চাইতে বেশি উত্তম আচরণ করতে হবে। বেশি বিনয়ী হতে হবে। হুসনুল খুলুক বলতে রমযান মাসে অপরের সাথে উত্তম আচরণের কথা বলা হয়েছে। যেমন, বন্ধুবান্ধবের সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদের সাথে হাসিখুশি থাকা, তাদের জন্য ভালো কিছু করা। অন্যদের ক্ষমা করে দেওয়া, সদাচরী হওয়া। রমযান মাসে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বেশি বেশি চিন্তা করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো- গান বাজনা সম্পর্কে। অনেক মুসলমান বলেন যে, গান জায়েয। গান- বাদ্য সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)- এর হাদীসের আলোকে আলোচনা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুসলিম আলেমদের মধ্যে অধিকাংশ একমত পোষণ করেন যে, ইসলাম গান বাদ্য অনুমোদন করে না। কিন্তু মিউজিক নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরাসরি কোনো আয়াতে নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ **সূরা- 'লুকমান' এর ৬নং আয়াতে** বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থ: "এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করে, এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অনর্থক কথা হলো- যা কোনো জ্ঞানের কথা বলে না, যা কোনো অর্থপূর্ণ কথা না, অনর্থক কিসসা- কাহিনী, যা মানুষকে গাফেল ও বিপথগামী করে। গান- বাজনা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)- এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। আপনি যদি সেগুলো অধ্যয়ন করেন, তাহলে মিউজিক বা গান- বাজনা অবৈধতা বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মতগণের মধ্যে কিছু লোক থাকবে যারা যিনা করবে....রেশমের পোশাক পরবে, মদপান করবে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবে।"

যখন এ হাদীস বর্ণনা করা হয় তখন কিছু বিষয়কে বৈধ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন মদ, যিনা হারাম। কিন্তু মিউজিককে ঐসব হারাম বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানে এটা স্পষ্ট যে, রাসূল (ﷺ) গান বাজনা কে হারাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অনেক লোক এটাকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা এটা নিজেদের জন্য জায়েয করে নিয়েছে। এই হাদীস গান- বাজনা হারাম হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা। অন্যান্য সহীহ হাদীসে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র জায়েয হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। বিশেষ করে 'দফ' সম্পর্কে।

সহীহ বুখারী এর ২য় খণ্ডের ৮৭নং হাদীসে বর্ণনায় এসেছে- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন শিশু বালিকা 'দফ' বাজাচ্ছিলো এবং গান করছিলো, তখন হযরত আবু বকর (রা.) আগমন করলেন এবং তাদেরকে (বালিকাদের) বললেন তোমরা এটা বন্ধ করো। রাসূল (ﷺ) তখন বিশ্রামে ছিলেন এবং এই ব্যাপারটি দেখলেন (হযরত আবু বকর (রা.)- কে) তিনি আবু বকর (রা.)- কে বললেন, তাদেরকে তা করতে দাও। আজ তো ঈদের দিন।" (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৯ এ বিষয়ে বর্ণনা এসেছে)

এ হাদীস নির্দেশ করে যে, বাদ্যযন্ত্র হারাম কিন্তু 'দফ' জায়েয। তাই রাসূল (ﷺ) কখনো কখনো দফ বাজাতে অনুমতি দিয়েছেন।

রমযানের ১৫ ও ১৬তম শিক্ষা

কাযা রোযা ও কাফফারা

প্রশ্ন: কাযা রোযার অর্থ কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কাযা শব্দের অর্থ হলো পূরণ করা, রোযার ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদি। যদি কেউ সঙ্গত কারণে ফরজ রোযা না রাখে, তবে পরবর্তীতে সেই রোযা পূরণ করে নেওয়াকে কাযা রোযা বলে। কেউ অসুস্থ, ভ্রমণ কিংবা ঋতুমতী হলে সে যদি রমযান মাসে রোযা রাখতে না পারে তবে তাকে রমযানের পরে অবশ্যই না রাখা রোযাগুলো পুরা করে নিতে হবে। অথবা যদি কেউ যৌক্তিক কারণে রমযান মাসে রোযা ভাঙ্গে তবে তাকে পরবর্তী রমযানের আগে রোযা গুলো পূরণ করে নিতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

অর্থ: 'আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করে নেবে।"

অর্থাৎ অসুস্থ কিংবা ভ্রমণে থাকলে রোযা পরে পূরণ করে নেওয়া যাবে। যেমন, যদি কেউ পুরো রমযান মাস অসুস্থ থাকে কিংবা ভ্রমণে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই রমযানের পরে এবং পরবর্তী রমযানের আগে তা পূরণ করতে হবে। রমযান মাস যদি ২৯ দিনের হয় তবে ২৯ টি রোযা পূরণ করতে হবে, আর ৩০টি হলে ৩০টিই করতে হবে। রমযানের রোযার সাথে কেউ যদি কোনো মানতের রোযা রাখে এবং যৌক্তিক কারণে যতি তা রাখতে না পারে বা ভেঙ্গে ফেলে তবে সেটার জন্যও পরবর্তীতে রোযা পূরণ করতে হবে এবং এই ধরনের রোযাকে কাযা রোযা বলে।

প্রশ্ন: এটা কি বাধ্যতামূলক যে রমযানের পরপরই বাদ দেওয়া রোযাগুলোর কাযা পূরণ করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : রমজানের পরপরই যে কাযা পূরণ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটা পরবর্তী রমযানের আগে যেকোনো সময় করে নেওয়া যায়। তবে যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করা যায় ততই উত্তম। কারণ কোনো মানুষ জানে না যে সে কতক্ষণ বাঁচবে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হা: নম্বর- ১৯৫০)**

অর্থ: "আয়েশা (রা:) বলেন, তিনি মাঝে মাঝে রমযানের রোযা বাদ দিতেন এবং তিনি শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে সেই রোযা পূরণ করতেন না।"

সুতরাং অহেতুক বিলম্ব করা উচিত নয়।

আল্লাহ বলেছেন, **(সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৩৩)**

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও।"

অন্য আয়াতে বলেছেন,

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

অর্থ: "তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।" (সূরা- মু'মিনুন, আয়াত- ৬১)

সুতরাং এই আয়াতগুলোর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যত দ্রুত সম্ভব রোযা পূরণ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন: ফরজ রোযা কাযা হয়ে গেলে তা পূরণ কারার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : ফরজ রোযা কাযা হয়ে গেলে তার জন্য পরবর্তীতে যে রোযা রাখা হয় তাকে কাযা রোযা বলে। কেউ যদি রমযানের রোযা ভঙ্গ করে তবে তার জন্যেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে যৌক্তিক কারণে কোনো রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তাকে অবশ্যই পরবর্তী রমযানের আগে ওই রোযা পূরণ করে নিতে হবে। যদি কোনে

ব্যক্তি কাযা রোযা করতে গিয়ে যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভেঙ্গে ফেলে, তবে তাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোযা পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রোযা কাযা করেছে এবং তা পূরণ করার আগেই মারা গেছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী? আর যে ব্যক্তি রোযা কাযা করেছে এবং অসুস্থ হয়ে গেছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কেমন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, বেঁচে থেকে যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, মৃত্যুর পর তার না পড়া নামাজের জন্য পৃথিবীতে কেউ কোনো রকম শোধ দিতে পারে না। একইভাবে যে ব্যক্তি বৈধ কারণ যেমন অসুস্থতা, বয়ঃবৃদ্ধতা ইত্যাদির কারণে রোযা কাযা করে, তার মৃত্যুর পর সেই রোযাগুলো আর কেউ শোধ দিতে পারে না। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৪)

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: "অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে।"

অতএব যে ব্যক্তি জীবিত এবং যৌক্তিক কারণে রোযা রাখতে পারে না, তবে সে প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। এটাই হলো নিয়ম। আর যে ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মৃত্যুবরণ করে তার ব্যাপারে আলেমদের ভিতর দ্বিমত দেখা যায়। একদল বলেন, মৃত ব্যক্তির যারা অভিভাবক আছেন তদের সকলকে রোযা রাখতে হবে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হা:নম্বর- ১৯৫২)

অর্থ: "আয়েশা (রা:) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখার অঙ্গীকার করলো কিন্তু মারা গেল, তবে তার অভিভাবকদেরকে সেই রোযা পূরণ করে দিতে হবে।" আরেক দল আলেম বলেন যে, তার ওয়ারিশদের রোযা রাখার দরকার নেই, তবে মৃত ব্যক্তির কাযা হওয়া প্রত্যেকটি রোযার জন্য একটি করে ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে। কারণ উল্লেখ আছে যে, (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা:নম্বর- ৪২২) **"আমর (রা:) হযরত আয়েশা (রা:) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মাতা রমযানের কিছু রোযা কাযা করে ফেলেছে এবং সে তার মাতার পরিবর্তে রোযা রেখে দিতে পারবে কি? আয়েশা (রা:) বললেন, না। তবে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে কোনো দরিদ্রকে সে**

যেন এক 'শাআ' পরিমাণ খাবার খাওয়ায়।" কিন্তু এই দুইটি হাদীসের মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তবে দ্বিতীয় দলের আলেমরা বলেন, প্রথম হাদীসে প্রতিজ্ঞা করা রোযার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে রমযান মাসের সাধারণ রোযার কথা যেখানে গরীবকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে যে, (সুনানে আবু দাউদ, হা:নম্বর- ২৩৯৫) "যদি কোনো ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় তবে আমাদের উচিত প্রতিটি রোযার পরিবর্তে দরিদ্রকে খাওয়ানো তবে সেক্ষেত্রে রোযা পূরণ করার দরকার নেই, আর যে ব্যক্তি মানত বা শপথের রোযা কাযা রেখে মারা গেল, তার ওয়ারিশদের উচিত তার সেই রোযা পূরণ করা।" অতএব অত্র হাদীস থেকেই আমরা ব্যাপারটি সাবলীলভাবে বুঝতে পারি। আরেকটি হাদীসে আছে যে, (সহীহুল বুখারী, হা:নম্বর- ১৯৫৩)

"ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসে বলল যে, তার মাতাকে এক মাসের কাযা রোযা রাখতে হবে। এখন সে কি তার মায়ের রোযা শোধ করে দিতে পারবে? নবী বললেন, হ্যাঁ, এটা করা ভালো।"

কিন্তু এখানে রমযানের রোযা নাকি শপথের রোযা সেটা উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং দ্বিতীয় দলের আলেমদের অভিমতটি অধিক শক্তিশালী, অর্থাৎ শপথের রোযার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা রোযা রেখে দেবে এবং রমযানের সাধারণ রোযার ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশরা দরিদ্রকে খাইয়ে দেবে।

প্রশ্ন: ধরা যাক কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখছিলো তবে সে কিছু দিন পরে মারা গেল। তখন রমযানের যে কয়েকদিন বাকী ছিলো যে দিনগুলো শেষ হওয়ার আগেই সে মারা গেল, তবে তার ওয়ারিশদের সেই বাকি দিনগুলোর রোযা পূরণ করে দেওয়া উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার সকল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। হাদীসে আছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা:নম্বর- ৪০০৫)

অর্থাৎ, "যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন নিম্নলিখিত কাজগুলো ছাড়া আর সকল কিছু বন্ধ হয়ে যায়। সেগুলো হলো :

১. সে যা দান করেছিলো,
২. জ্ঞান, যা সে ছড়িয়ে দিয়েছিলো এবং
৩. সন্তানাদি, যারা তার জন্য দোয়া করে।"

সুতরাং এই তিনটি জিনিস ব্যতীত আর সবকিছুই উঠিয়ে নেওয়া হয়। তাই যে ব্যক্তি রমযানের প্রথম দশটি রোযা রাখার পর মারা গেল, তার ওয়ারিশদের বাকি বিশটি রোযা পূরণ করে দেয়ার দরকার নেই। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে তার সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পরের কোনো কিছুর জন্য তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। সুতরাং বাকি রোযা পূরণ করার দরকার নেই।

প্রশ্ন: ধরা যাক কোনো ব্যক্তি রোযা শপথ করলো কিন্তু মারা গেল। এখন তার শপথকৃত রোযার সমপরিমাণ লোক রোযা রাখবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি (ধরা যাক মৃত ব্যক্তি ৩০টি রোযা শপথ করেছিলো) ৩০টি রোযা রাখতে পারবে অথবা ৩০ জন ব্যক্তি একদিনে সেগুলো পূরণ করতে পারবে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- রোযা) **"হাসান (রা:) বলেন, ত্রিশ জন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একদিনে কোনো ব্যক্তির শপথকৃত ত্রিশটি রোযা পূরণ করতে পারবে।"** সুতরাং উভয় নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রশ্ন: যে নারী মাসিকের কারণে রমযানের রোযা কাযা করেছে সে শাওয়াল মাসের ছয় দিনের রোযায় সেই রোযাগুলোর কাযা রোযা রাখতে পারবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : তার জন্য দুটি সুযোগ রয়েছে। হয় সে প্রথমে রমযানের কাযা রোযাগুলো রাখবে, তারপর শাওয়ালের রোযা রাখবে অথবা প্রথমে দুইটি পথই অনুমোদিত। তবে উত্তম হলো, প্রথমে সেই রোযা রাখা যেগুলো সে রমযান মাসে কাযা করেছে, তারপর শাওয়ালের রোযা রাখবে। কারণ রমযানের রোযা হলো ফরজ রোযা আর শাওয়ালের রোযা হলো ঐচ্ছিক রোযা। তাই ফরজ রোযা আগে পূরণ করতে হবে তার পরে ঐচ্ছিক রোযা করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা:নম্বর- ২৬১৪)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং তারপর শাওয়াল মাসের রোযা রাখে সে যেন সারা বছর অথবা সারা জীবনের জন্য রোযা রাখলো।"

সুতরাং ফরজ রোযা আগে রাখতে হবে, তারপরে রাখতে হবে শাওয়ালের রোযা, তাহলে সে অধিক সওয়াব পাবে।

প্রশ্ন: কাযা রোযা কীভাবে রাখতে হবে? ক্রমানুযায়ী নাকি এলোমেলোভাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এই ব্যাপারে দুই ধরনের সিদ্ধান্ত দেখা যায়। একদল আলেম বলেন যে, নিয়মিতভাবে রাখতে হবে; কারণ হাদীসে বলা হয়েছে যে, (বাইহাকি) "যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা কাযা করেছে তার উচিত সেই রোযাগুলো নিয়মিত বা ক্রমানুসারে পূরণ করা।" কিন্তু এটা একটি যয়িফ হাদীস। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (দার আল কুতনি) "যে ব্যক্তি কাযা রোযা রাখছে সে নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত যেভাবে তার সুবিধা হয় সেভাবে রাখতে পারে।" সুতরাং উভয় রীতিই প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৪, ১৮৫)

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

অর্থ : "যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়।" "আর যে লোক অসুস্থ বা সফরে থাকবে সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করতে পারো।"

সুতরাং এই আয়াত দুটির ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কাযা রোযা যেকোনোভাবেই রাখা যায়, হোক সেটা নিয়মিত বা অনিয়মিত। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- রোযা) "ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা কাযা করেছে সে ইচ্ছা করলে কাযা রোযাগুলো আলাদাভাবে রাখতে পারবে যদি সে সুবিধাবোধ করে।"

অপর হাদীসে আছে যে, (দার আল কুতনি) "আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা রাখতে চায় সে তা নিয়মিতভাবে রাখতে পারবে যদি সে খুশি হয়।" সুতরাং এটা ব্যক্তির খুশির ব্যাপার।

প্রশ্ন: 'ফিদিয়া' শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন? এটা কাদের ওপর ফরজ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : ফিদিয়া শব্দের অর্থ ক্ষতিপূরণ। ফিদিয়া হলো ঐ ধরনের ক্ষতিপূরণ যা সমস্যা বা অসুস্থতার কারণে না রাখা রোযার জন্য দেওয়া হয়। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৪)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: "যে ব্যক্তি অপারগ সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে আর সেটা সম্ভব না হলে রোযার পরিবর্তে গরীব লোককে খাওয়াবে।"

সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির সমস্যা থাকে, তবে সে রোযার পরিবর্তে দরিদ্রকে খাবর খাওয়াবে এবং এই রীতিকে ফিদিয়া বলা হয়।

প্রশ্ন: ত্রিশটি কাযা রোযার জন্য একদিনে ত্রিশজন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে নাকি একজনকে ত্রিশদিন ধরে খাওয়াতে হবে, কোনটি সঠিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৪)

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ এবং ভ্রমণে থাকবে তারা পরে হিসাব গণনা করে আর যাদের জন্য সেটাও কষ্টদায়ক হবে তারা প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন করে দরিদ্রকে খাওয়াব।"

সুতরাং উদাহরণস্বরুপ কেউ যদি পুরো রমযান মাসের রোযাগুলো কাযা করে তবে সে দুইভাবে কাযা রোযাগুলোর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে এবং ফিদিয়া হিসাবে একজনকে এক শাআ পরিমাণ খাবার খাওয়াতে হবে। এক শাআ সমান ১.১৫ কেজি প্রায়।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, (সহীহুল বুখারী, হা:নম্বর- ৪৫০৫) "আনাস (রা.) যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন ত্রিশটি রোযার পরিবর্তে একদিন ত্রিশজন গরীব লোক ডেকে তাদেরকে রান্না করে খাইয়েছিলেন। ইমাম হাম্বলি, মালিকির মতে, এক ব্যক্তিকে ত্রিশদিনের খাবর দেওয়া যেতে পারে। অতএব ত্রিশদিন একজনকে খাওয়ানো এবং একদিনে ত্রিশজনকে খাওয়ানো উভয়ই অনুমোদিত।

প্রশ্ন: আপনি কাফফারার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবেন কি? আর যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় যৌনকর্ম বা সহবাস করে তার শাস্তি কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : কাফফারা শব্দটি এসেছে **'কুফর'** হতে, যার অর্থ গোপন করা, লুকিয়ে রাখা। রোযার ক্ষেত্রে কাফফারা বলতে বোঝায়- কোনো ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাসে মিলিত হলে তার শাস্তি বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে রোযা রাখতে হয় তাকে। অর্থাৎ রোযা অবস্থায় যৌন মিলন করলে তার শাস্তি হলো কাফফারা। কাফফারা কী জিনিস তা হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে আছে যে, **(সহীহুল বুখারী, হা:নম্বর- ১৯৩৬)**

অর্থাৎ, "একদিন এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসে বলল, হে রাসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়েছি! আমি ধ্বংস হয়েছি! মুহাম্মদ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল আমি রোযা রাখা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি।

মহানবী (ﷺ) বললেন, তুমি একজন দাসকে মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তবে নিয়মিতভাবে টানা দুই মাস বা ৬০ দিন রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তারপর মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তবে ৬০ জন ব্যক্তিকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। এমন সময় এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর খেদমতে এক ঝুড়ি/বস্তা খেজুর পেশ করলো এবং তিনি সেই খেজুর উক্ত ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো গরীবদের ভিতরে বণ্টন করে দাও, এটা তোমার অপরাধের কাফফারা। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো এগুলো কি আমি আমার পরিবারকে দিতে পারি? মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ- পারো। তখন ঐ লোকটি বলল, আল্লাহর কসম মদীনার সর্বোচ্চ দুটি পাহাড়ের অন্তর্বর্তী স্থানে আমার চেয়ে আর কেউ দরিদ্র আছে বলে জানি না। একথা শুনে মুহাম্মদ (ﷺ) মুচকি হেসে বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে দাও।" অতএব এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে কেউ সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতিপূরণ এবং কাফফারা আদায় করবে। এক্ষেত্রে তিন ধরনের শর্ত থেকে যেকোনো একটি বাছাই করে নিতে হবে, সেগুলো হলো:

১. দাস মুক্ত করে দিতে হবে,
২. অথবা, টানা নিয়মিতভাবে ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে,
৩. অথবা, ৬০ জন দরিদ্র লোককে খাওয়াতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এই তিনটি শর্ত থেকে ইচ্ছেমত যেকোনো একটি পছন্দ করে নেওয়া যাবে না বরং প্রথম শর্তটি পালন করতে হবে, তবে সেটি সম্ভব না হলে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টিও সম্ভব না হলে তৃতীয় শর্ত তথা ৬০ জন লোককে খাওয়াতে হবে। অতএব এগুলোই হলো কাফফারা।

প্রশ্ন: ঐচ্ছিক রোযা পালনকালে যদি সহবাস করে তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : ঐচ্ছিক রোযা পালনকালে কেউ সহবাস করলে সেক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কাফফারা দিতে হবে রমযান মাসের ফরজ রোযার জন্য। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সুনানে আবু দাউদ, হা:নম্বর- ২৪৫০) **"উম্মে হানি (রা.) বলেন, মক্কা বিজয় করার সময় মুহাম্মদ (ﷺ) আমাকে পানি দিলেন এবং পান করতে বললেন, আমি পান করে বললাম যে আমি রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তুমি কি কোনো কিছু অর্জনের জন্য রোযা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, ঐচ্ছিক রোযা হলে কোননো সমস্যা নেই।"**

সুতরাং জানা গেল যে, ফরজ রোযা ভাঙলে গুনাহ হবে কিন্তু ঐচ্ছিক রোযা ভাঙলে সমস্যা নেই। অতএব, ঐচ্ছিক রোযা পালনকালে স্ত্রী সহবাস করলে তার জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সুনানে নাসাঈ, হা:নম্বর- ২৩২৩) **"একদিন সকালে উঠে মুহাম্মদ (ﷺ) হযরত আয়েশা (রা.) এ নিকট খাবার চাইলেন কিন্তু তিনি বললেন, ঘরে কোনো খাবার নেই। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তাহলে আমি রোযা রাখছি।"** অতএব ঐচ্ছিক রোযার জন্য আগের দিন রাতে নিয়ত করার দরকার নেই। এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ঐচ্ছিক রোযার ক্ষেত্রে কোনো কাফফারার বিধান নেই।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে অযথা গড়িমসি করে তবে এর জন্য সে কি কোনো শাস্তি পাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এ ব্যাপারে নিয়ম হলো যদি কেউ রমযান মাসের কোনো রোযা আদায় করে তবে তাকে অবশ্যই পরবর্তী রমযানের আগেই সেই রোযাগুলোর কাযা আদায় করে নিতে হবে। কিছু আলেম বলেন, যদি কেউ বেশি দেরি করে তবে সে প্রত্যেক রোযার জন্য একজন করে দরিদ্রকে খাওয়াবে এবং কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু সহীহ হাদীসে এই ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে দেরি করার কারণে বাড়তি কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কুরআনে এ ব্যাপারটি ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

অর্থ: "আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো।"

কিন্তু এখানে কোনো ক্ষতি পূরণের কথা বলা হয়নি অর্থাৎ পরে রোযা রাখলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এমনটি বলা হয়নি। সুতরাং সঠিক সিদ্ধান্ত হলো দেরি করার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোযা পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন: রোযা কীভাবে গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কাজ করে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ হলেন অতিশয় দয়ালু এবং তিনি রমযানকে দান করেছেন বিভিন্ন গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। এই ব্যাপারে কুরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, (সূরা- মায়েদাহ, আয়াত- ৯৫)

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

অর্থ: " অথবা তার ওপর কাফফারা কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখা যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে।" এবং (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৯৬)

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ: "যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে।"

বস্তুত যারা কুরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে। তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য যারা মসজিদুল হারামের আশেপাশে বাস করে না।" এবং (সূরা- মুজাদালাহ, আয়াত- ৩, ৪)

ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

অর্থ: "যারা তাদের স্ত্রীকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো : একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। যার এ সামর্থ্য নেই সে একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। সে যদি এতেও অক্ষম হয় তাহলে সে ষাট জন মিকীনকে খাওয়াবে।"

তাছাড়া এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেওয়া যায় যেটি কুরআনে বর্ণিত আছে, যেমন- (সূরা- নিসা, আয়াত- ৯২)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

অর্থ: "মুসলমানদের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে। কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার

স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি সঙ্গতিহীন, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্য উপর্যপুরি দুই মাস রোযা রাখবে।”

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতগুলো হতে বোঝা যায় যে, রোযা বিভিন্ন গুনাহ এবং কাজে অপারগতার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত করে বলতে না পারে যে, কতগুলো রোযা সে ভেঙ্গেছে। তাহলে সে কাযা রোযা রাখার সময় কতটি রাখবে এবং তা কীভাবে হিসাব করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যে ব্যক্তি জানে না যে সে কতগুলো রোযা কাযা করেছে, তবে সে যে পরিমাণ রোযা কাযা করেছে বলে ধারণা করে তার থেকে কিছু বেশি ধরে হিসাব করবে এবং কোনো অবস্থাতেই হিসাবটা ধারণা থেকে কম হওয়া উচিত নয়। এবং হিসাবটা তার স্মরণ শক্তির ওপর নির্ভরশীল। তাকে তিনটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। সেগুলো হলো:

১. তাকে আল্লাহর কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (নূর, আয়াত- ৩১)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: “মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।”

২. ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব কাযা রোযা রাখতে হবে এবং সেটি অবশ্যই পরবর্তী রমযানের আগে করতে হবে।

৩. একদল আলেম বলেন যে, কাযা রোযা রাখতে অনেক দেরি করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রত্যেক রোযার জন্য একজন করে দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে। এবং আরেকদল আলেম বলেন, এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে দরিদ্রকে খাওয়ানো উত্তম হবে।

প্রশ্ন: ধরা যাক, কোনো এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযান মাসের রোযা রাখতে পারে নি এবং সে যদি খাওয়ানোর জন্য কোনো মিসকীনকে না পায় তাহলে কি টাকা দান করা যাবে? যদি টাকা দান করা যায় তবে কত টাকা দান করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এই ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৪) “তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে সে অন্য সময় গণনা পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে

খাদ্য দান করবে।” সুতরাং কেউ যদি অসুস্থ থাকে এবং সে যদি কাযা রোযা না রাখতে পারে তবে তাকে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। কিন্তু টাকা দেওয়া বা দান করা যাবে না। খাদ্য দিতে হবে এবং খাদ্যের পরিমাণ কমপক্ষে এক ‘শাআ’ পরিমাণ হতে হবে (১.৫ কেজি প্রায়) তবে কেউ যদি দরিদ্র খুঁজে না পায় তাহলে কি হবে? আসলে এমন কোনো এলাকা আছে বলে মনে হয় না যেখানে গরীব মিসকীন নেই। আর যদি নাও থাকে তবে অন্য কোথাও গিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন: আমাদের জানামতে এটা অনুমোদিত যে, গর্ভবতী এবং যে নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করায় তাদের রোযা থাকার দরকার নেই এবং তারা এর পরিবর্তে দরিদ্রকে খাওয়াবে। আসল সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যে নারী গর্ভবতী এবং বুকের দুধ খাওয়ায় সে কীভাবে কাযা রোযা পূরণ করবে সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মত দেখা যায়। একদল আলেম বলেন, তাদের কাযা রোযা রাখার দরকার নেই, তারা শুধু প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন করে দরিদ্রকে খাওয়াবে। এই আলেমরা সূরা- বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াতের ওপর ভিত্তি করে এই মত দেন। (১৮৪ নং আয়াত এই আলোচনায় একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে) ১৮৪ নম্বর আয়াতের ব্যাখা দিতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, (সুনানে আবু দাউদ, হা:নম্বর- ২৩১১) “আয়াতে ব্যবহৃত অসুস্থ বলতে অনেক বৃদ্ধ, নিয়মিতভাবে অসুস্থ, এমনকি গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মাতাকেও বোঝানো হয়েছে।” কিন্তু শাইখ নাসিরউদ্দীন আলবানি বলেন, এটি একটি দূর্বল হাদীস। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (দার আল কুতনি) “ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যেহেতু সে গর্ভবতী তাই তাকে আর কাযা রোযা রাখতে হবে না বরং ফিদিয়া প্রদান করতে হবে।” সুতরাং এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেন যে, গর্ভবতী এবং বুকের দুধ দানকারী নারীদের শুধু ফিদিয়া দিলে চলবে। তবে আরেক দল আলেম আছেন যারা বলেন, সূরা- বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াতের (যারা অসুস্থ কিংবা ভ্রমণে রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে খাবার দান করবে।) ব্যাখায় গর্ভবতী এবং বুকের দুধ দানকারী নারী অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

অর্থ: “আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, জটিল করতে চান না, যাতে তোমরা গণনা করো।”

আলী (রা.) বলেন, “গর্ভবতী নারী এবং বুকের দুধ দানকারী নারী অসুস্থদের অন্তর্ভুক্ত।” আমরা জানি যে, যদি গর্ভবতী এবং দুধ দানকারী নারী রোযা রাখে তাহলে তার নিজের জীবন এবং সেই সাথে তার শিশুর জীবনও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সুতরাং তারা অসুস্থতার অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে। তবে তাদেরকে অবশ্যই কাযা রোযা রাখতে হবে। কারণ কুরআনে উল্লেখ আছে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

অর্থ: “যারা অসুস্থ কিংবা সফরে আছে তারা পরে দিন গণনা করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, জটিল করতে চান না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো।”

সুতরাং এই মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় দলের আলেমগণ বলেন যে, যদি ঐ নারীর জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে তবে তার জন্য শুধু কাযা রোযা রাখলে হবে কিন্তু সে যদি তার শিশুর জীবনের কথা চিন্তা করে রোযা না রাখে, তবে তাকে কাযা রোযা এবং সেই সাথে ফিদিয় অর্থাৎ মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। তবে দ্বিতীয় দলের আলেমদের মত অধিক বিশুদ্ধ, যেখানে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী এবং বুকের দুধ দানকারী নারী যদি রমযানের রোযা কাযা করে বা ভেঙ্গে ফেলে তবে তাকে পরবর্তী সময়ে কাযা রোযা রাখতে হবে। ইমাম আহমদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, এবং দাউদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, বুকের দুধ দানকারী নারীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কী? উত্তরে তারা উল্লিখিত সমাধান দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: নিজের সন্তান এবং নাতী- নাতনীকে ইফতার হিসাবে ফিদিয়ার খাবার দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : কুরআনে ফিদিয়া দিতে বলা হয়েছে মিসকীনকে। (সূরা- বাকারা, আয়াত - ১৮৪) নাতী- নাতনীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে-

১. ফিদিয়া মিসকীনকে দিতে হবে। সুতরাং সন্তানরা অনেক দরিদ্র হতে হবে।

২. ফিদিয়া অনেকটা যাকাতের মত। অর্থাৎ যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল তাদেরকে আপনি যাকাত দিতে পারবেন না। তাই যদি সন্তান এবং নাতীরা আপনার উপর নির্ভরশীল হয় তবে তাদেরকে ফিদিয়া দেওয়া যাবে না।

৩. যদি সন্তান বা নাতীরা অনেক দরিদ্র হয় এবং তারা যদি আপনার ওপর নির্ভরশীল না হয় তবে তাদেরকে ফিদিয়ার খাবার দেওয়া যাবে।

তবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, **(সহীহুল বুখারী, হা:নম্বর- ১৯৩৬) মুহাম্মদ (ﷺ) অতি দরিদ্র এক ব্যক্তিকে তার ফিদিয়া তার পরিবারকে খাইয়ে দিতে বলেছিলেন।** সুতরাং পরিবারের সদস্যরা যদি অতিশয় দরিদ্র হয় তবে তাদেরকে ফিদিয়ার খাবার খাওয়ানো যাবে এবং সেটা ইফতার হিসেবেও দেওয়া যাবে।

রমযানের ১৭ ও ১৮তম শিক্ষা

কবিরা গুনাহ ও অন্যান্য

প্রশ্ন: আপনি কি নির্দিষ্টভাবে কবীরা গুনাহ কি তার সংজ্ঞা দিকে পারবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : কবীরা গুনাহ হলো ঐ সমস্ত কর্মকান্ড যেগুলো আল্লাহ তায়ালা এবং মুহাম্মদ (ﷺ) করতে নিষেধ করেছেন, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে। এগুলোকেই কবীরা গুনাহ বলা হয়। হাদীসে উল্লেখ আছে, **(মুসতাদরাক, তাফসীর, ৩৪১৯) "আল্লাহ যা কিছু করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন সে সব বিষয় হতে বিরত থাকো এবং যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো অনুসরণ করো।"** মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ আল বুখারী, হা: নম্বর- ২৭৬৬) "তোমরা কি ৭টি মহাধ্বংসকারী গুনাহ সম্পর্কে জানো? তা হলো:**

১. কাউকে আল্লাহর শরীক করা।
২. যাদুবিদ্যা অনুশীলন করা।
৩. সুদের লেনদেন করা।
৪. যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পিঠ দেখান অর্থাৎ পলায়ন করা।
৫. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা।
৬. ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাকে আল্লাহ পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।
৭. কোনো নারীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কুৎসা রটনা করা।

প্রশ্ন: আপনি বলবেন কি ৭০টি কবীরা গুনাহ কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এ রকম কোনো আয়াত কিংবা হাদীস নেই যেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো হলো নির্দিষ্ট ৭০টি গুনাহ। তবে মুহাম্মদ আযযাহাবি কুরআন এবং হাদীস বিশ্লেষণ করে ৭০টি কবীরা গুনাহ তার নিজের মতো করে একটির পর একটি সাজিয়েছেন। কেউ এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) ৭০টি কবীরা গুনাহ'র কথা বলেছেন এবং মুহাম্মদ আযযাহাবি সেগুলো ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করেছেন। এই ৭০টি কবীরা গুনাহ নিম্নরুপ:

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা।
২. কাউকে হত্যা করা।
৩. নামাজ আদায় না করা।
৪. যাকাত না দেওয়া।
৫. যাদুবিদ্যা অনুশীলন।
৬. রমযান মাসে রোযা না রাখা।
৭. হজ্ব পালন না করা।
৮. পিতা- মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা।
৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।
১০. ব্যভিচার এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক করা।
১১. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া।
১২. সুদ লেনদেন করা।
১৩. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা।
১৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা।
১৫. নেতার পক্ষ হতে জনগণের মধ্যে সুবিচার না করা।
১৬. অহংকার এবং উদ্ধত আচরণ করা।
১৭. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।
১৮. মাদক গ্রহণ করা।
১৯. জুয়া খেলা।
২০. নিষ্পাপ নারীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা।
২১. ডাকাতি করা।
২২. চুরি করা।
২৩. মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা।
২৪. উৎপীড়ন করা।
২৫. অবৈধ খাজনা আদায় করা।
২৬. গনিমতের মাল হতে আত্মসাৎ করা।
২৭. যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।

২৮. নিষিদ্ধ সম্পদ ভোগ করা।
২৯. আত্মহত্যা করা।
৩০. বারবার মিথ্যা বলা।
৩১. ইসলামী আইন ব্যতীত অন্য আইন প্রয়োগ করা।
৩২. ঘুষ লেনদেন করা।
৩৩. নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করা বা ঐ রকম বাহ্যিক বেশভূষা গ্রহণ করা।
৩৪. অশ্লীলতা করা বা কূটনামি করা।
৩৫. কারোর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আবার তালাক প্রদানকারীর নিকট বৈধ করার জন্য বিবাহ করা। অতঃপ পুনরায় তাকে দিয়ে দেওয়া (তালাকদিয়ে)।
৩৬. পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া।
৩৭. নিজেকে প্রদর্শন করা।
৩৮. দুনিয়াবি জ্ঞানার্জন করা।
৩৯. বিশ্বস্ততায় ফাটল ধরানো।
৪০. নিজের দয়া সম্পর্কে অন্যকে মনে করিয়ে দেয়া।
৪১. তাকদীর অস্বীকার করা।
৪২. অপরের ব্যক্তিগত আলোচনায় নাক গলান।
৪৩. ক্ষতিকর গল্প ছড়িয়ে দেওয়া।
৪৪. কাউকে অভিশাপ দেওয়া।
৪৫. নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ না করা।
৪৬. জ্যোতিষি এবং গণকদের কথা বিশ্বাস করা।
৪৭. স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪৮. ভাস্কর্য তৈরি করা।
৪৯. অনশন করা, নিজের কাপড় চোপড়, চুল ছেঁড়া ইত্যাদি।
৫০. বিচারে সমতা বিধান না করা।
৫১. কারোর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া।
৫২. প্রতিবেশীর ক্ষতি করা।
৫৩. কোনো মুসলমানকে ক্ষতি বা অপব্যাবহার করা।
৫৪. পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা।
৫৫. আল্লাহর দাসত্বকারীকে ক্ষতি করা।
৫৬. পুরুষদের রেশম এবং স্বর্ণ পরিধান করা।
৫৭. দাস যে পালিয়ে যায়।
৫৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া।
৫৯. নিশ্চিত না হয়ে কাউকে নিজের পিতা বলে দাবি করা।

৬০. সত্য না জেনে অনিশ্চয়তার উপর তর্কাতর্কি করা।
৬১. অন্যের জায়গায় পানি প্রবাহিত হতে না দেওয়া।
৬২. সঠিক ওজন না দেওয়া।
৬৩. আল্লাহর নজরদারি থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করা।
৬৪. পচাঁ মাংস, রক্ত এবং শূকরের গোশত খাওয়া।
৬৫. যথাযথ কারণ ছাড়া জামাআতে নামাজ না পড়া।
৬৬. নিয়মিতভাবে জুমার নামাজ না পড়া।
৬৭. সম্পদ উসূল করে দিয়ে অন্যকে ক্ষতি করা।
৬৮. কপট এবং বিভ্রান্তিমূলক আচরণ করা।
৬৯. গোয়েন্দাগিরি করে কোন মুসলিমের গোপন বিষয় প্রকাশ করা।
৭০. মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাহাবিদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

প্রশ্ন: যে সমস্ত লোক এই গুনাহগুলো থেকে বিরত থাকবে তাদের জন্য কি পুরস্কার রয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- নিসা, আয়াত- ৩১)

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ: "যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারো, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি- বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।"

সুতরাং বড় গুনাহগুলো থেকে বিরত থাকলে অন্যান্য ছোটগুনাহগুলো মাফ করা হবে। কুরআনের অন্যত্র ছোটগুনাহগুলো মাফ করা হবে।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, (সূরা- শুরা, আয়াত- ৩৭)

ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

অর্থ: "যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেচেঁ থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে।"

এবং সূরা নাজম এর ৩২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

অর্থ: "যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেচেঁ থাকে, ছোটখাটো অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুন্দর বিস্তৃত।"

অর্থাৎ কেউ যদি বড় গুনাহ হতে বিরত থাকে এবং যদিও ছোট গুনাহ করে তবু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- পবিত্রতা, হা:নম্বর- ৪৫০)

অর্থাৎ, "প্রতিদিন পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ এবং এক রমযান হতে পরবর্তী রমযান হলো বড় গুনাহ হতে বিরত থাকার সময়কাল।"

অর্থাৎ কেউ যদি প্রতিদিন পাচঁবার নামাজ পড়ে, জুমার নামাজ আদায় কের এবং রমযান মাসে রোযা রাখে তবে সে বড় গুনাহ হতে বাঁচতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রশ্ন: গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহকে শরিক করা, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, (সূরা- নিসা, আয়াত- ৪৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে আল্লাহর সাথে শরিক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"

এবং একই সূরার ১১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

এ রকম অনেক হাদীস আছে যেখানে এই কবিরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে। যেমন, সহীহ বুখারীর ৬৮৭১ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা।" অপর হাদীসে উল্লেখ আছে, (সহীহ বুখারী, হা:নম্বর- ২৬৫৪) "মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তারা বলল আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সবচেয়ে ভালো জানেন। মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, সেটা হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা।"

এছাড়া কুরআনে এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত আছে। সূরা মায়েদার ৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"

অন্যত্র উল্লেখ আছে, (সূরা- লোকমান, আয়াত- ১৩)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "লোকমান (আ:) তাঁর পুত্রকে বলল, আল্লাহর সাথে শরিক করো না এটা মহা জুলুম।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ মুসলিম, হা:নম্বর- ৭১১৪) "আল্লাহ বলেছেন, আমি নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট। আমার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।"

সুতরাং তার কোনো শরিক নেই। এবং এটিই হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ।

প্রশ্ন: উল্লিখিত গুনাহটি সাধারণত অমুসলিমদের দ্বারা ঘটে থাকে কিন্তু অনেক মুসলিমও আছেন যারা এমনটি করছেন।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অমুসলিমদের পাশাপাশি অনেক মুসলিম আছে যারা শিরক করছে এবং তারা আল্লাহর কাছে সহযোগিতা না চেয়ে বিভিন্ন মানুষের নিকট সহযোগিতা চায়।

কুরআনে আছে, (সূরা- ফাতেহা, আয়াত- ৪)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ: "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"
এবং সূরা আ'রাফের ১৯৪ নম্বর আয়াতে আছে,

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

অর্থ: "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মত বান্দা।"
সূরা আহকাফের ৫ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে যে কিয়ামত পর্যন্ত ও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?"
সূরা হজ্বের ৭৩ নম্বর আয়াতে আছে যে,

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবুও তাদের তা উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (সহীহ বুখারী, হা:নম্বর- ৪৪৯৭) "যে ব্যক্তি শিরক করলে এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চেয়ে মারা গেল, মৃত্যু পরে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।" সুতরাং শিরক করে মৃত্যুবরণ করলে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্রজনকভাবে মুসলমানরাও এই কাজটি করছে। শিরক শুধু শরিক করা নয় বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কুরবানী দেয় সেও মুশরিক।

অনেক মুসলমান আছে যারা নতুন বাড়ি তৈরি করে এবং অর্জুনের নামে পশু বলি দেয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে, যেমন- (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৭৩)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

অর্থ "তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন সে সব জীবজন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।" এবং (সূরা- মায়েদাহ, আয়াত- ৩)

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

অর্থ: "তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা বস্তু হারাম করা হয়েছে।" এবং (সূরা- আনয়াম, আয়াত- ১৪৫)

فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

অর্থ: "কেননা এইগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা হারাম হলো জবেহ করা জন্তু যা অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।" (সূরা- নাহল, আয়াত- ১১৫)

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

অর্থ: "আল্লাহ হারাম করেছেন সেই বস্তু যা জবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়।"

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বলি দেওয়া শিরক, হারাম।
অন্যদিকে বলা হয়েছে, (সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৬০)

فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ

অর্থ: "আল্লাহ যদি যদি তোমাদের সাহায্য না করেন তবে এমন কে আছে যে সাহায্য করবে?" এবং (সূরা- কাউসার, আয়াত- ২)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থ: "অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।"

সুতরাং আল্লাহর রঙে রঙিন হতে হবে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, (সহীহ মুসলিম, হা:নম্বর- ৪৮৭৮) "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর লানত দেন, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বলি দান করে।"

সুতরাং মুসলমানদের জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তারাও শিরক করছে।

প্রশ্ন: অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু মিডিয়া গুলো বলছে যে মুসলমান সন্ত্রাসীরা নিরাপরাধ লোকগুলোকে হত্যা করছে। নিরাপরাধীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারটি আপনি পরিষ্কার করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, (সূরা- মায়েদা, আয়াত- ৩২)

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থ: "যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যে সব মানুষকে হত্যা করে এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।"

সুতরাং হোক সে মুসলিম অথবা অমুসলিম মানবজাতির কাউকে হত্যা করা মহা অপরাধ। এই কারণে ইসলামে কাউকে হত্যা করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মিযিয়াগুলো বলে যে, মুসলমানরা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলে থাকেন যে, নিরপরাধীদেরকে হত্যা করা হারাম।

কুরআনের সূরা আনয়াম ১৫১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ - وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থ: "স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না।"

সুতরাং কোন মুসলিম তার নিজস্ব আইনে চলতে পারবে না, তাকে অবশ্যই ইসলামি শরিয়তের আইন মেনে চলতে হবে।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৬৮৭১) কবীরাহ গুনাহসমূহের সবচেয়ে বড় দুইটি গুনাহ হলো-

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা।

২. নিরপরাধীকে হত্যা করা।

সাধারণত মুসলিম কিংবা অমুসলিম কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে কুরআনে মুসলমানদেরকে হত্যার ব্যাপারে বলা হয়েছে, সূরা নিসার ৯৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, -

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

অর্থ: "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।"

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৩১) "যদি দুইজন মুমিন ব্যক্তি একে অপরের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে এবং একজনকে হত্যা করে তাহলে উভয়ই জাহান্নামে যাবে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে কিন্তু নিহত ব্যক্তিও জাহান্নামে যাবে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, নিহত ব্যক্তির মনেও তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে হত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলো। এ কারণেই তারা উভয়ই জাহান্নামে যাবে।"

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৬৮৬২) "একজন মুমিন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে।"

সুতরাং নিরপরাধীদেরকে হত্যা করা হারাম।

প্রশ্ন: যাদুমন্ত্র বিদ্যা অনুশীলন করা ইসলামে কবীরাহ গুনাহ কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : ইসলামে যাদুবিদ্যা অনুশীলন করা কুফরী এবং এটাকে কবীরা গুনাহ বলে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ২৭৬৬) "সাতটি কবীরা গুনাহ রয়েছে তার মধ্যে যাদুবিদ্যা একটি।"

রাসূল (ﷺ) এটিকে তৃতীয় বৃহত্তম কবীরা গুনাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারাহ, আয়াত- ১০২) যে কেউ যাদুবিদ্যা অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন জায়গা নেই।" এবং (সূরা- ত্বাহা, আয়াত- ৬৪)

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের কলা- কৌশল সুসংগত করো অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আসো আর যে জয়ী হবে সেই সফলকামী হবে।"

এই ঘটনাতে মূসা (আ.) যাদুকরদের সাথে জয়ী হয়েছিলেন। সুতরাং যাদুবিদ্যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান আছে, যারা যাদুকরদের কাছে যায় এবং শত্রুদেরকে ঘায়েল করার কামনা করো এবং নিজেকে শত্রু থেকে বাঁচাতেও সাহায্য কামনা করে, এটিও কবীরা গুনাহ। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন: ইসলামে পিতা- মাতাকে সম্মান এবং আনুগত্যের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, পিতামাতাকে অসম্মান করা ইসলামের ৭০টি বড় গুনাহর একটি এবং ৮ নম্বর কবীরা গুনাহ। পিতা- মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- ইসরাহ, আয়াত- ২৪)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: "তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন, করেছে।" এবং (সূরা- আনয়াম, আয়াত- ১৫১)

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

অর্থ: "পিতা- মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।" এবং (সূরা- নিসা, আয়াত- ১)

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থ: "আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" এবং (সূরা- লোকমান, আয়াত- ১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অর্থ: "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোন নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ান হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েচি যে, আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" এবং (সূরা- আহকাফ, আয়াত- ১৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অর্থ: "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি আর তার মাতা তাকে ত্রিশ মাস দুধ খাইয়েছে.....।"

এখানে আল্লাহ পিতামতাকে শ্রদ্ধা করতে বলেছেন বিশেষ করে মায়ের সাথে। অনেক হাদীস আছে যেখানে মায়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা দেখাতে বলা হয়েছে।

একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৫৯৭১) "একদিন এক ব্যক্তি মহাম্মদ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলো যে, কে আমার সহানুভূতি এবং কৃতজ্ঞতা পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার? নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার মা, লোকটা বলল তারপর কে? তোমার মা, তৃতীয়বারও বললেন তোমার মা, চতুর্থবার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তোমার পিতা।" অর্থাৎ

কৃতজ্ঞতা এবং সহানুভূতির ১০০ ভাগের ৭৫ ভাগের দাবিদার হলেন আমাদের মাতা আর মাত্র ২৫% হলো আমাদের পিতার জন্য। তার অর্থ হলো গোল্ড মেডেল, সিলভার, ব্রোঞ্জ মেডেল তিনটিই মায়ের পাপ্য। আর পিতা পাবে শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার। ইসলামে পিতামাতার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, **(সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৩০০৪) এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। মহানবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন? সে বলল, জীবিত আছে। তিনি বললেন, বাড়ি ফিরে যাও এবং তোমার পিতামাতার সেবা করো।"**

সুতরাং পিতামাতার চেয়ে জিহাদ বড় নয়। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পাশে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তবে তোমার জিহাদে যাওয়ার দরকার নেই।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, **(সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৫৯৭০) "এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে আল্লাহর কাছে কোন ভালো কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? বলা হলো, প্রতিদিনের পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ, তারপর? পিতামাতার প্রতি কর্তব্য। তারপর? জিহাদ।"** অতএব ৫ ওয়াক্ত নামাজের পরেই পিতামাতার সেবা করা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, **(মুসনাদে আহমদ, হা: নম্বর- ৫৩৭২) তিন ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। তারা হলো:**

১. মদপানকারী।
২.পিতামাতার অবাধ্য সন্তানরা।
৩. যে ব্যক্তি পরিবারের সাহায্যার্থে পাপ কাজে লিপ্ত হয়।

সুতরাং পিতামাতাকে অশ্যদ্ধা করা, সেবা ইত্যাদি না করা গর্হিত অন্যায় তথা কবীরা গুনাহ।

প্রশ্ন: যিনার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে এবং এর শাস্তি কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যিনা অর্থ অবৈধ যৌন সম্পর্ক। যখন একজন মানুষ এবং নারী বিবাহ বহির্ভূতভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে যিনা বলে। ইসলামি শরিয়তে এই ধরনের সম্পর্ক হারাম যে কারণে এটা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেছেন, **(সূরা- ইসরা, আয়াত- ৩২)**

অর্থ: "আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা মন্দ এবং অশ্লীল পথ।"

ইসলাম নারী এবং পুরুষের সম্ভ্রমের মালিকানা রক্ষার জন্য তাগিদ দিয়েছে এবং এটি রক্ষার জন্য একাধিক পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে, হাদীস এবং ইসলামী শরিয়তে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেটি একজন ব্যক্তিকে যিনার ধারে কাছে আসা হতে বিরত রাখতে পারে। সেগুলো হলো:

* হিজাব পরিধান করতে হবে। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য। নারীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে। শুধু হাতের কব্জি এবং মুখমন্ডল বের করে রাখা যেতে পারে। তবে কিছু ফকিহ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন।

আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেছেন যে, (সূরা- নূর, আয়াত- ৩০, ৩১)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে" এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। যেগুলো সাধারণত প্রকাশমান সেগুলো ছাড়া তারা যেন অন্য কোন সৌন্দর্য প্রকাম না করে এবং তারা যে তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোকে অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।"

যিনা বা অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তি যিনার ধরণ অনুযায়ী **দুই প্রকার**। যিনার ধরণ হলো:

১. অবিবাহিত পুরুষ নারীর দ্বারা কৃত যিনা।

২. বিবাহিত পুরুষ নারীর দ্বারা কৃত যিনা।

এবং এই দুই প্রকার যিনার শাস্তিও ভিন্ন। কুরআনে এই ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সূরা- নূর, আয়াত- ২)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ: "ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারি পুরুষ তাদের প্রত্যেককে ১০০ করে বেত্রাঘাত করো।"

অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষ এবং নারী যিনা করলে তাদের শাস্তি হলো প্রত্যেককে ১০০টি করে বেত্রাঘাত করা। আর বিবাহিতদের দ্বারা কৃত অবৈধ যৌন সংসর্গ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৬৮১৪) **"এক ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এসে বলল: আমি যিনা করেছি এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো, কারণ সে ছিলো বিবাহিত।"** সুতরাং বিবাহিতদের দ্বারা ঘটিত যিনার শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। অপর হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৬৮১৯) **"একদা এক ইহুদী নারী এবং পুরুষ যিনা করা অবস্থায় ধরা ছিলো অতঃপর তাদেরকে মহানবী (ﷺ) এর নিকট আনা হলো এবং জিজ্ঞাসা করা হলো তোমাদের ধর্মে যিনার শাস্তি কি? তারা বলল ভারী বস্তু উঁচু করে রাখা এবং অঙ্গার দ্বারা মুখমন্ডল পুড়িয়ে কালো করে দেওয়া....... অতঃপর পাথর মেরে হত্যা করা।"** অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৪৯১৯) **"অবিবাহিত কোন নারী বা পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি হলো ১০০টি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের বহিষ্কার এবং বিবাহিত যিনাকারীদের শাস্তি হলো ১০০টি বেত্রাঘাত এবং পাথর মেরে হত্যা করা।"** এই হলো ভিন্ন ধরনের যিনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি। আল কাবায়ের, আযযাহাবি ব্যভিচারকে দশ নম্বর কবীরা গুনাহ হিসাবে তালিকায় স্থান দিয়েছেন।

প্রশ্ন: সমকামিতার শাস্তি কি? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন এটি জেনেটিক ব্যাপার, এটা কতখানি সঠিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : সমকামিতার শাস্তির কথা কুরআন এবং হাদীসে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত আছে যে, (সূরা- আরাফ, আয়াত- ৮০- ৮১)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

অর্থ: "আমি লুত (আ.) কে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে সারাবিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।" (সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ২৮- ২৯)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ

অর্থ: "আমি প্রেরণ করেছি লুতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করে নি, তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছো, রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কাজ করছো?. . . . ." এবং এই কর্মের শাস্তি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, এরুপ যে, (সূরা- হুদ, আয়াত- ৮২)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

অর্থ: "অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছলো, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম।"

হাদীসে বলা হয়েছে, (সুনানে আবু দাউদ, হা: নম্বর- ৪৪৪৭) "যে ব্যক্তি লুত (আ.) এর উম্মতের ন্যায় কুকাজ করে তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড।"
সমকামিতা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড।

সমকামিতা জেনেটিক হবার ব্যাপারে কথা হলো, ১৫- ২০ বছর আগে যে গবেষণা হয়েছিলো যেখানে বলা হয়েছিলো সমকামিতা জন্মগত। কিন্তু পরবর্তী গবেষণাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের গবেষণার ফলাফল একেবারেই ভুল। প্রথম গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিলো এমন একজনের দ্বারা যে নিজেই ছিলো সমকামী। এরকম অনেক লেখালেখি আছে যেগুলো 'সমকামিতা জেনিটিকাল' এই নীতির বিরুদ্ধে। আপনি যদি ২০০৪ সালের ৫ই এপ্রিলে লাইফস্টাইল, ডট কম এ প্রকাশিত আর্টিকেলটি পড়েন যেটি আমেরিকার সমকামী বিশেষ করে নারী সমকামীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেখানে তারা প্রমাণ করেছে যে সমকামিতা জেনেটিক ব্যাপার নয়। অনেক বিজ্ঞানী আছেন বিশেষ করে রবার্ট নাইট প্রমাণ করেছেন যে,

ইসপিটজা'র সিদ্ধান্ত যিনি আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক যিনি প্রমাণ করেছেন যে, সমকামিতা জেনেটিক ব্যাপার নয় এবং ১৯৭৩ সালে আমেরিকার সাইক্রিয়াট্রিষ্ট এসোসিয়েশন এর লিস্ট হতে সমকামিতা উঠিয়ে দেওয়া হয় বরং সেখানে সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এবং তিনি সমকামি পুরুষ এবং নারীদেরকে এটা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন: দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান আছে যারা সুদকে বৈধ মনে করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি কেমন গোনাহ এবং এর ব্যাপারে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : হ্যাঁ, আমি একমত যে, অনেক মুসলমান এটাকে বৈধ মনে করে। কিন্তু রিবার অর্থ হলো এমন কিছু যেটি তার মূল্যের চেয়ে বেশি। এটা সুদকে অন্তর্গত করে। আল্লাহ সুদ সম্বন্ধে কুরআনে অন্তত পক্ষে আট বার উল্লেখ করেছেন, যেমন- (সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৩০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

অর্থ: "ওহে যারা ঈমান এনেছো, সুদ ঘলধকরণ করো না, তাকে দ্বিগুণ ও বহুগুণ করে।" (সূরা- নিসা, আয়াত- ১৬১)

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থ: "আর তাদের সুদ নেবার জন্যে, যদিও তাদের তা নিষেধ করা হয়েছিলো, আর লোকের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে তাদের গ্রাস করার জন্যে। আর তাদের মধ্যের অবিশ্বাসীদের জন্য আমরা তৈরি করেছি কঠিন শাস্তি।" এবং (সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৭৫)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ: "যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াতে পারে না তার মতো দাঁড়ান ছাড়া যাকে শয়তানর তার স্পর্শের দ্বারা পতিত করেছে। এমন হবে কেননা তারা বলে ব্যবসা- বাণিজ্য তো মুদী কারবারীর মতই।" কিন্তু আল্লাহ বৈধ করেছেন ব্যবসা- বাণিজ্য, অথচ নিষিদ্ধ করেছেন সুদখুরি।

সুদ হলো একমাত্র গুনাহ যার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদ কারবারীদের শাস্তির ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৩৮৮১) "মুহাম্মদ (ﷺ) ঐ সকল ব্যক্তিকে সুদকারবারীর অংশীদার বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা সুদ নেয় এবং দেয়। যে এর হিসাব রাখে এবং ঐ দু'জন যারা এর সাক্ষী থাকে তারা সকলেই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।" অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, (মুসতাদরাক আল হাকিম, হা: নম্বর- ২২৫৯) "৭৩ প্রকারের সুদ রয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্নটি হলো নিজের মায়ের সাথে যিনা করার সমান।" আরো বর্ণিত আছে, (মুসনাদ, পৃ: ২২৫ এবং জামিয়াহ হা: নম্বর- ৩৩৭৫) "যে ব্যক্তি এক দিরহাম সুদ নিল সে যেন ছত্রিশ (৩৬) বার ব্যভিচার করলো" এই হলো সুদের শাস্তি। বর্তমানে এটা অহরহ দেখা যায় যে, পশ্চিমা বিশ্বে সুদের ব্যবহার যত্রতত্র। সবকিছুতেই সুদ আছে যেমন: লোন, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি সব কিছুতে এবং এটি দরিদ্রকে আরো দরিদ্র বানাচ্ছে। আর ধনীকে আরো ধনী বানাচ্ছে এবং এগুলো শয়তানের কাজ। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ মানুষকে অর্থনীতির সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যেটি একজনকে সর্বোচ্চ লাভ দিতে পার, যেভাবে লভ্যাংশ ভাগাভাগি হয়- সুদ নয়।

প্রশ্ন: আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সুদ কারবারী করে এমন কোনো ব্যাংকের একাউন্টে অর্থ রাখা মুসলামনের জন্য বৈধ হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : অধিকাংশ আলেম বলেন যে, বিশেষ সমস্যা বিশেষত অসুসলিম দেশে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য যদি সুদ কারবারী ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে হয় তাহলে সেখান থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে সেগুলো কোন পুরষ্কার পাওয়ার আশা না করে শর্তহীনভাবে দান করে দিতে হবে। কিন্তু আমি এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি, এটা হারাম। কারণ কুরআনে বলা হয় নি যে, সুদের টাকা ব্যবহার করো না বরং বলা হয়েছে সুদরে ধারে কাছেও যেয়ো না। এই কারণে সুদ নিয়ে সেটি দান করতে পারি না। যদি করি তাহলে পরোক্ষভাবে বরং সুদকে উৎসাহিত করা হয়, কারণ যখন কেউ একাউন্ট খোলে তখন কিন্তু তাকে ঐ ব্যাংকের নিয়মাবলীতে সাইন করতে হয়। যেখানে সুদের কারবারের শর্ত লেখা থাকে। এটা গুনাহ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যদি কেউ কোকেনের ব্যবসায় বিয়োগ করে এবং তাকে থেকে দান করে তবে কি সেটি গ্রহণযোগ্য হবে? অতএব, ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখতে হবে অথবা যেকোনো ব্যাংকের চলতি হিসাবে টাকা রাখতে হবে, না হয় নিজের বাড়ির লকালে রাখতে হবে।

প্রশ্ন: মাদকের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এটা কি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- মায়েদাহ, আয়াত- ৯০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "ওহে মুমিনগণ, নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্য ও জুয়া, আর প্রস্তর বেদী বসানো ও তীরের লটারি খেলা নিশ্চয়ই অপবিত্র, শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই এসব এড়িয়ে চলো যেন সফলকাম হতে পারে।"

সুতরাং মাদক পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে। ইমাম আযযাহাবি, আল কাবায়ের এটাকে ঊনিশ নম্বর কবীরা গুনাহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা খ্রিষ্টানধর্মেও নিষিদ্ধ। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, **(Book of proverbs, Chapter- 20, Voice- 1)** "মদ হলো উপহাসকারী, এটি শক্তি বৃদ্ধিকারী পানিয় এবং যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করে সে সৎ নয়।" এবং **(Book of Ephesians, Chapter-5, Voice- 18)** "মাদকাসক্ত হয়ো না।" কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে খ্রিষ্টান এবং ইহুদীরা এই নির্দেশ পালন করে না। সাধারণত মানুষ নৈতিক বিচারবোধসম্পন্ন প্রাণী। এই বিচারবোধ মানুষকে অবৈধ এবং ভুল কাজ করা থেকে বিরত রাখে। যেমন- যখন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায় তাহলে তার সাধারণ বিবেচরা তাকে খোলা জায়গায় না গিয়ে টয়লেটে যেতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু যখন সে মদপান করে তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যে কোনটা ভুল আর সঠিক। তখন সে মারামারি, পাগলামি, উলঙ্গ ইত্যাদি হয়ে যায়।

মাদককে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করা হয়। আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে সেখানে ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং যারা ধর্ষণ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিলো মাদকাসক্ত। আমেরিকাতে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা আট ভাগ আমেরিকান অর্থাৎ প্রতি বারো হতে ত্রিশ জনে একজন অত্যাচারে লিপ্ত। সুতরাং মাদক হলো মহামারি এইডস এর জন্য দায়ী। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নম্বর- ৩৩৭১) **"মাদকাসক্তি সকল খারাপ কাজের উৎস।"** আবারো উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নম্বর- ৩৩৯২) **"যেকোনো বস্তু হোক সেটা অল্প বা বেশি পরিমাণে মাদকযুক্ত, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ।"** মুহাম্মদ (ﷺ) দশ শ্রেণীর লোককে নির্ধারণ

করেছেন যারা মাদকের সাথে জড়িত। তিনি বলেন, (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নম্বর- ৩৩৮০) মাদকের সাথে জড়িত দশ শ্রেণীর লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ লানত দেন। তারা হলো:

১. যে চোলাই করে,
২. যে সেটা পান করে,
৩. যে বহন করে,
৪. যে ক্রয় করে,
৫. যে বিক্রয় করে,
৬. যার জন্য চোলাই করা হয়,
৭. যার জন্য আনা হয়,
৮. যাকে সরবরাহ করা হয়,
৯. যে এর থেকে অর্থ পায় এবং
১০. অন্য কারোর জন্য ক্রয়কারী।

এই দশ শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর লানত প্রাপ্ত। অনেক রোগ আছে যেগুলো মাদক গ্রহণ করার কারণে আক্রমণ করতে পারে। মাদকের দ্বারা ঘটিত রোগগুলো হলো- সিরোপসিস, ক্যানসার, হেপাটাইটিস, কার্ডিওসাপেথি, হাইপারটেনশন, হার্টএ্যাটার্ক, প্যারালাইসিস, ত্বকের রোগ, এ্যাজমা ইত্যাদি। যদিও এগুলো ক্ষতিকর তবুও মিডিয়া, বিলবোর্ড ইত্যাদিতে এগুলোর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং সরকার এগুলোর জন্য লাইসেন্স দেয়।

প্রশ্ন: পেছনে নিন্দা এবং কুৎসা রটনাকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- হুজরাত, আয়াত- ১২)

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থ: "এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা ঘৃণা কর।"

অর্থাৎ পশ্চাতে সমালোচনা নিন্দা করাকে আল্লাহ নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান বলেছেন। ভাইয়ের গোশত খাওয়া হারাম এবং মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া দ্বিগুণ হারাম। যদিও মাংসাসীরা গোশত খায় তবুও তারা তাদের স্বজাতির মৃত গোশত খায় না। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৬২৫৬) "তোমরা কি জান পেছনে নিন্দা কি? সাহাবারা

বলল, আল্লাহর রাসূল উত্তম জানেন। তিনি উত্তর দিলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতে তার নিন্দা মন্দ বলে এবং ঐ ব্যক্তি যদি তা পছন্দ না করে তবে তাকে পেছনে নিন্দা বা গীবত বলে। একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি একজনের খারাপ কাজের কথা বলি যা সে সত্য সত্য করেছে তবে? মহানবী (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ এটা গীবত হবে, আর যদি তোমার কথা মিথ্যা হয় তবে সেটি হবে কুৎসা রটনা।" সুতরাং উভয়ই নিষিদ্ধ।

কুরআনে উল্লেখ আছে যে, (সূরা- হুমাযা, আয়াত- ১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ: "প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরানিন্দাকারীর দুর্ভোগ।"

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ২৬১) "কোনো একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) একটি কবরস্তানের পাশ যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা কাতরাতে শুনলেন, কারণ তাদের শাস্তি হচ্ছিল। তিনি সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা কি জান ঐ দু'জনের কান্নার কারণ কি? সাহাবারা বলল জানি না। মহানবী (ﷺ) বললেন, ঐ দু'জনের প্রথম ব্যক্তির শাস্তির কারণ ছিলো যে, সে পেশাব করার পর পবিত্রতার ব্যাপারে সতর্ক ছিলো না আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মানুষের মাঝে শত্রুতা তৈরি করতো।"

সুতরাং কুরআন এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পরনিন্দা এবং কুৎসা রটনা করা হারাম।

প্রশ্ন: পুরুষদের জন্য গোড়ালির নিচে পোশাক পরিধান করা কি হারাম?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : গোড়ালির নিচে পোশাক পরা কবীরা গুনাহ এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান আছে যারা এই গুনাহটির দিকে যথেষ্ট পরিমাণ নজর দিয়ে না বরং তারা তাদের পায়জামা দিয়ে ঘরের মেঝ ঝাড় দেয়।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৫৭৮৭) "পায়জামার যতটুকু অংশ গোড়ালির নিচে যায় ততটুকু অংশ জাহান্নামের আগুনে পোড়ান হবে।" আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ৫৭৮৮) "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দিকে ফিরেও তাকাবেন না যে ব্যক্তি গোড়ালির নিচে পায়জামা পরে এবং দম্ভের সাথে চলাফেরা করে।" গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান মানুষকে অহংকারী এবং উদ্ধত করে তোলে এবং

অহংকার করা হারাম। অপর হাদীসে ফরমান হয়েছে যে, (সুনানে আবু দাউদ, হা: নম্বর- ৪০৮৩) "যদি তোমার পোশাক গোড়ালির নিচে যায় এবং মাটি ঝাড়ু দিতে থাকে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।"

অতএব, এটা গর্হিত অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। অনেকেই বলে যে, আমি গোড়ালির নিচে পায়জামা পরিধান করি কিন্তু কোনো অহংকার বোধ করি না; কিন্তু এই কথা ভুল, কারণ মহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সাহাবাদেরকে গোড়ালির উপরে পরিচ্ছদ পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং গোড়ালির নিচে পোশাক পরা গুনাহ এবং এভাবে পরিধান করে অহংকার বোধ করা দ্বিগুণ গুনাহ।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- নূর, আয়াত- ৪)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

অর্থ: "যারা সতিসাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না।"

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হা: নম্বর- ২৬৫৪) মুহাম্মদ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি আমাকে বলতে পারো কোনগুলো সব গুনাহর বড় গুনাহর বড় গুনাহ? সাহাবিরা বলল, আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, সেগুলো হলো:

১. আল্লাহকে শরীক করা,
২. পিতামাতার আনুগত্য না করা,
৩. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ....।

আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (সুনানে আবু দাউদ, হা: নম্বর- ৩৫৯২) "মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য।" এবং এগুলোই হলো মিথ্যা সাক্ষ্য কবীরা গুনাহ হওয়ার পিছনে মূল কারণ।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণক বিদ্যায় বিশ্বাসী তার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : গণকবিদ্যা বর্তমান বিশ্বে একটি অতি সাধারণ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পেপার পত্রিকায় আমরা এগুলোর প্রাত্যাহিক ফলাফলও দেখে থাকি। তারকা গণনায় বিশ্বাস করা শিরক, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (মুসনাদে আহমদ, হা: নম্বর- ৯৫৩৬) **"যদি কোনো লোক গণকের কাছে যায় এবং সে যা বলে তাতে বিশ্বাস করে তাহলে সে মুহাম্মদ (ﷺ) কে অবিশ্বাস করে।"** অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৫৪৪০) **"যে ব্যক্তি ভাগ্য গণকের নিকট যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত তার নামাজ কবুল হয় না।"** কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, (সূরা- মায়েদা, আয়াত- ৯০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "মুমিনগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ আর কিছু নয়, অতএব এগুলো বেচেঁ থাকো যেন কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারো।"

সুতরাং ভবিষ্যৎ গণনা করা হারাম এবং বিশ্বাস করাও তাই। সে কারণে এগুলো হতে দূরে থাকতে হবে।

রমযানের ১৯ ও ২০তম শিক্ষা

লাইলাতুল কদর ও তার গুরুত্ব

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদর শব্দের অর্থ কি এবং এর গুরুত্ব কতখানি?

উত্তর: ডা: জাকির নায়েক : লাইলাতুল কদর আরবি শব্দ। লাইলাতুন শব্দের অর্থ হল রাত, আর কদর শব্দের অর্থ হল মহিমা, সর্বোত্তম ইত্যাদি। সুতরাং লাইলাতুল কদর শব্দের অর্থ হল মহিমান্বিত রাত, শ্রেষ্ঠ রাত।

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য হলো এটি রমযান মাসের এমন একটি রাত যেটি বছরের অন্যান্য রাতের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম এবং এটাই সেই রাত, যে রাতে ক্বুর'আন অবতীর্ণ হয়েছিলো।

কুর'আনে উল্লেখ আছে,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

আমি ঐ কুর'আনে নাযিল করেছি শবে- কদরের রাতে। আপনি কি জানেন শবে- কদর কি? শবে- কদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা- আল- কদর, আয়াত ১- ৩)

সুতরাং লাইলাতুল কদর হলো বছরের সর্বোত্তম রাত এবং এই রাতে পবিত্র ক্বুর'আন নাযিল হয়েছে। এ রাত সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে যে, এই রাতে করা কোনো নেক আমল অন্য হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই হাজার মাসকে যদি ১২ দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে হিসাব দাঁড়ায় ৮৩ বছরের চেয়েও কিছু বেশি এবং এটা মানুষের গড় আয়ুর চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ শুধু এই একরাতে ইবাদত করা হলে তার মর্যাদা সারা জীবন ইবাদত করার চেয়ে আরো অনেক বেশি। এটা এমন এক রাত যেখানে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হতে থাকে।

ক্বুর'আনে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

আমি এ ক্বুর'আনকে নাযিল নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, [কেননা] আমি [মানুষকে] সতর্ককারী। এই রাত হলো সেই ভাগ্য রাত; যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরিকৃত হয়। (সূরা- আদ- দুখান, আয়াত ৩- ৪)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

আমি কুর’আনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কি?

(সূরা- আল- ক্বামার, আয়াত ৪০)

সুতরাং লাইলাতুল কদর ভাগ্যেরও রাত। আল্লাহ্ এই রাতে প্রত্যেকের জন্য পরবর্তী লাইলাতুল কদরের আগ পর্যন্ত ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন।

মুহাম্মাদ (সা) বলেন, “লাইলাতুল কদরের রাতে যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পুরস্কারের আশায় ইবাদত করে আল্লাহ্ তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২০১৪)

সুতরাং এটা হলো দয়া ও মহিমার রাত।

প্রশ্ন: আমরা জানি যে কুরআন নাযিল হয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে এটা নাযিল হয়েছে লাইলাতুল কদর- এর রাতে, তাহলে দু’টি কথা কি পরস্পর বিরোধী নয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে কোনো ধরনের স্ববিরোধীতা নেই। আপনি যদি কুরআনের তাফসীর পড়েন তাহলে সেখানে বলা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল হয়েছে পবিত্র লাইলাতুল কদরের রাতে। তার মানে আল্লাহ তায়ালা কদরের রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে নিচের আসমানে কুরআন নাযিল করেছেন এবং এই নিচের আসমান থেকে তিনি কিছু কিছু আয়াত নাযিল করেছেন পৃথিবীতে যখন তা প্রয়োজন পড়েছে। আর এই প্রক্রিয়া ২৩ বছর ধরে চলেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

প্রশ্ন: কোন রাতটি লাইলাতুল কদরের রাত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে চল্লিশটিরও বেশি মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন রমযানের প্রথম রাত, কেউ বলেন সপ্তম রাত আবার কেউ বলেন রমযানের উনিশতম রাত। কিন্তু এই ব্যাপারে সবচেয়ে সঠিক মত হলো এটা রমযানের শেষ ১০ দিনের কোনো এক বিজোড় রাত্রিতে। এ ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, **“রমযান**

মাসের শেষ দিনের বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১৭)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, “উবাই বিন কা’ব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লাইলাতুল কদর সম্ভবত রমযানের ২৭তম রাতে। কারণ ঐ রাতে মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদেরকে নামাজে দাঁড়াতে বলতেন।” (মুসলিম, হাদীস নং ২৩৬৪)

আরো বলা হয়েছে, লাইলাতুল কদর রমযান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং রমযানের শেষ রাতে খোঁজ করো।” (তিরমিযী, হাদীস নং ৭৯৪)

মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের শেষ দিনে ই’তিকাফে বসতেন এবং তিনি রমযানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদর খোঁজ করতেন।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২০)

অপর হাদীসে আছে, “রমযানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করো। তবে যদি অপারগ হও তাহলো শেষ সাত রাতে খোঁঝ করো।” (মুসলিম, হাদীস নং ২৬২১)

আরো বলা হয়েছে যে, “লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনের ভেতর রয়েছে।” (বুখারী, হাদীস নং ২০১৫)

সুতরাং এসব আলোচনা হতে আমরা জানতে পারলাম যে লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনের কোনো এক রাতে। এই কারণে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ কেউ জানে না, তবে এটা রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো এক বিজোড় রাতে এবং সম্ভবত ২৭ রমযানের রাতে কিন্তু কেউ নির্দিষ্ট তারিখ বাতলে দিতে পারে নি।

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ না করার পিছনে তাৎপর্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মূল কারণ হলো, মানুষ যেন লাইলাতুলা কদরের মহিমান্বিত, দয়াময় এবং মহামূল্যবান এই রাতটিকে নিয়ে চিন্তা করে এবং সাধ্যমত খোঁজ করে, যে কারণে আল্লাহ এই রাতের নির্দিষ্ট তারিখ গোপন করেছেন।

প্রথমত, আল্লাহ আমাদের সওয়াবকে দ্বিগুণ করে দিতে চান; তাই তিনি কামনা করেন যে তাঁর বান্দারা বেশি করে ইবাদত করুক।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ মুমিনদের ভেতর পার্থক্য দেখেন অর্থাৎ কারা রমযানের শেষ দশ দিনে রাত জেগে ইবাদত করে আর কারা অতটা করে না। সেটা পরীক্ষা করেন।

তাছাড়া আল্লাহ এই ধরনের আরো অনেক কিছুই গোপন করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, জুমার দিনে প্রার্থনা কবুল করা হবে, কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন নি ঠিক কোনো সময়ের দু'আ কবুল করবেন। হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে এবং যে ব্যক্তি এই সবগুলো নাম জানবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"** **(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৬)**

কিন্তু আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) ওই নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু আমাদেরকে তা জানতে হবে। তাছাড়া আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যুর দিন তারিখ বলেননি, কিয়ামত ঠিক কোন তারিখে সংঘটিত হবে তাও বলেন নি।

কুরআনে বর্ণিত আছে যে, অর্থ:

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" **(সূরা লোকমান, আয়াত ৩৪)**

সুতরাং এই সব কারণে আল্লাহ আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সঠিক তারিখ জানান নি।

প্রশ্ন: মুসলমানদের লাইলাতুল কদরের রাত কীভাবে খোঁজা উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: লাইলাতুল কদর খোঁজার জন্য একাধিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হাদীসে আছে যে, **আমরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে রোযা পালন করতাম এবং তিনি কখনও ইবাদত করার জন্য রাতে উঠতেন না, তবে রমযানের শেষ সাত দিনে তিনি গভীর রাতে উঠতেন, শেষ দশের শেষ সপ্তমের প্রথম রাতে তিনি রাতের তিন ভাগের এক ভাগ ইবাদত**

করতেন, ষষ্ঠ রাতে ঘুমাতেন আবার শেষ পাঁচ রাতের প্রথম রাতে আবার ইবাদত করতেন। এভাবে শেষ দিন পর্যন্ত চলতো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৭০)

আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সহিত আল্লাহর পুরস্কারের আশায় ইবাদত করে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।" (বুখারী, হাদীস নং ২০১৪)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "আয়েশা (রাঃ) মুহাম্মদ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, লাইলাতুল কদর তালাশ করার জন্য আমার কী করা উচিত? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত যে, ও আল্লাহ তুমি মহা ক্ষমাকারী এবং তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। অতএব আমাকে ক্ষমা করো।" (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১২)

হাদীসে বলা হয়েছে, "রমযানের শেষ রাতে বেশি করে দু'আ করো, প্রার্থমা করো আর নামাজ পড়।" (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪৪)

সুতরাং এই শেষ দশ দিনেই লাইলাতুল কদর খুজতে হবে।

প্রশ্ন: কুরআন হাদীসে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে আর কোনো নিশানা বা চিহ্ন আছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কুরআন- হাদীসে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে অনেক চিহ্ন রয়েছে। তবে সেগুলো সব লাইলাতুল কদর অতিবাহিত হওয়ার পরের ব্যাপারে। কারণ আল্লাহ চান না যে মানুষ শুধু কদরের রাতে ইবাদত করুক আর অন্য দিনগুলোতে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক।

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (মুসলিম, ১৬৭৫)
"লাইলাতুল কদরের পরের দিন সূর্য রশ্মিহীন এবং উঁচুতে উদিত হবে।"

আরো আছে যে, (মুসলিম, ২৬৩৩)
"লাইলাতুল কদরের পরের দিন সূর্যের রশ্মি থাকবে না।"

এবং (মুসলিম, ২৬৩৫)
"কদরের রাতে আকাশের চাঁদ মাসের সবচেয়ে বাকাঁ দেখাবে।"

আরো বলা হয়েছে যে, (তাবরানি, ইবনে খুজাইমা)

"লাইলাতুল কদরের রাত খুব বেশি গরম হবে না, আবার বেশি ঠাণ্ডাও হবে না এবং এটি হবে একটি উদার রাত এবং পরের দিনের সূর্য অনেকটা বাঁকা এবং লালাভ দেখা যাবে।"

সুতরাং এগুলোই সহীহ হাদীস থেকে লাইলাতুল কদরের আলামত পাওয়া যায়, তবে এগুলো সবই কদরের রাতের পরের আলামত। কারণ লোকে যেন কদরের রাত তালাশ করার জন্য বেশি বেশি ইবাদত করে।

প্রশ্ন: মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদরের জন্য কি ধরনের কর্মসূচি পালন করতেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রথমত, তিনি অধিক ইবাদত করতেন।
দ্বিতীয়ত, তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক করতেন না, কারণ শেষ দশ দিনে তিনি ইতিকাফে বসতেন আর ইতিকাফ বসলে স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, (বাকারা, আয়াত- ১৮৭)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

অর্থ: "আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।"

তৃতীয়ত, শেষ দশ দিনের রাতগুলোতে তিনি রাতের অধিকাংশ সময় নামাজে কাটাতেন।

চতুর্থত, তিনি তার পরিবারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন।

তাছাড়া, তিনি ঐ দিন রাতগুলোতে অধিক ইবাদত, প্রার্থনা এবং বেশি পরিশ্রম করতেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায়।

প্রশ্ন: যে নারী ঋতুমতী সে কিভাবে লাইলাতুল কদর পালন করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : মাসিক চলাকালিন নারীরা নামাজ, রোজা, কাবাঘর তাওয়াফ এবং ই'তিকাফ ছাড়া আর সব ইবাদত করতে পারে। ঋতুমতী নারী রমযানের শেষ দশ দিনে যা করতে পারে তাহলো, সে ঐ সময়টিতে আল্লাহর কাছে বেশি করে প্রার্থনা করতে পারে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (তিরমিযী, হা: নম্বর- ২৩৭০) "দু'আ হলো ইবাদতের সর্বোত্তম পন্থা

যে, আল্লাহর কাছে ‘আসতাগফিরুল্লাহ’ পড়ে ক্ষমা চাইতে পারে।” হাদীসে বলা হয়েছে, (তিরমিযী, হা: নম্বর- ৩৫১২) “আয়েশা (রা.) মুহাম্মদ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কিভাবে লাইলাতুল কদর পালন করবো? তিনি বললেন, বেশি বেশি দু’আ করো।” এছাড়া আর যে কাজ তারা করতে পারে তাহলো- তারা **সুবহান আল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ...........আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি অ- বিহামদিহি, সুবহান আল্লাহি ওয়াল আযীম।”** এবং তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। এই হলো ঋতুমতীদের জন্য নির্দেশনা।

প্রশ্ন: কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন, যদি তাই হয় তবে কেউ কোনো খুন করলে তার শাস্তি হবে কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এটা একটি জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। একটি ক্লাসে একজন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেন। এক বছর পর পরীক্ষার আগে শিক্ষক ভবিষ্যদ্বানী করলেন যে এই ছেলেটি প্রথম হবে আর ঐ ছেলেটি দ্বিতীয় হবে আর তৃতীয় ছেলেটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে। পরীক্ষার পর রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল যে তাদের ফলাফল সে রকমই হয়েছে। এখন আমি প্রশ্নকর্তার কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে, শুধু শিক্ষক বলেছে সে ফেল করবে এই কারণেই কি সে ফেল করেছে? সে কি তার ফেল করার জন্য শিক্ষককে দায়ী করবে? সে বলতে পারে যে শিক্ষক বলেছে আমি ফেল করবো তাই আমি ফেল করেছি। কিন্তু প্রকৃতভাবে এই উত্তরটি সঠিক নয়। শিক্ষক প্রথম ছেলেটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলো যে সে প্রথম হবে এবং একইভাবে তৃতীয় ছাত্রটির কথা বলেছিলো যে সে ফেল করবে। এর কারণ হলেঅ প্রথম ছাত্রটি ছিলো পড়ু য়া এবং মেধাবী আর তৃতীয় ছাত্রটি ছিলো অমনোযোগী এবং এই কারণে সে ফেল করবে। এটা বুঝতে পেরে শিক্ষক ঐ রকম ভবিষ্যদ্বানী কারেছিলেন। একইভাবে আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে না দেখা বিষয়ে।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন: কোনো পথচারি ব্যক্তি একটি মোড়ে এসে উপস্থিত হলো যেখানে পাচঁটি রাস্তা এসে মিলিত হয়েছে এবং এখান থেকে তাকে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। এবং এখানে তার যেকোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে তিন নম্বর রাস্তাটি পছন্দ করলো। তার মানে এই নয় যে আল্লাহ লিখে রেখেছেন তাই সে তিন নম্বর রাস্তা পছন্দ করেছে বরং আল্লাহ হলেন আলিমুল গায়েব। তিনি আগেই জানেন যে ঐ ব্যক্তি কোন রাস্তা পছন্দ তাই তিনি লিখে রেখেছেন যে ঐ ব্যক্তি তিন নম্বর রাস্তা পছন্দ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি খুন করে সে আল্লাহর ইচ্ছায় করে না বরং সে খুন করবে তা আল্লাহ আগে থেকে জানতে পারেন এবং তাই তিনি লিখে রাখেন। এই কারণে খুনির শাস্তি হবে। যেহেতু মানুষের সাধারণ এবং অসাধারণ বিচার বিবেচনা আছে তাই সে ইচ্ছা করলে যেকোনো কাজ করতে পারে, আবরা নাও পারে। যে কারণে আল্লাহ ভাল কাজে পুরস্কার আর মন্দ কাজে শাস্তি দেন।

প্রশ্ন: লাইলাতুল কদরের উপর ঈমান রাখা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : এটা হলো ঈমানের স্তম্ভ এবং কদরে বিশ্বাস বলতে মোটামুটি চারটি বিষয়ে বিশ্বাসের কথা বোঝায়। সেগুলো হলো:

১. আল্লাহ সবকিছু জানেন।

২. লওহে মাহফুজে বিশ্বাস করা

কুরআনে বলা হয়েছে, **(সূরা- হজ্ব, আয়াত- ৭০)**

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

অর্থ: " তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।"

হাদীসে বলা হয়েছে, **(সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৬৪১৬)** **"আল্লাহর নির্দেশে ৫৩ হাজার বছর আগে লওহে মাহফুজ তৈরি হয়েছে।"** আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **(সুনানে আবু দাউদ, হা: নম্বর- ৪৬৮৩)** **"আল্লাহ প্রথমে কলম তৈরি করেন এবং লেখার জন্য প্রস্তুত করেন, কলম প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ আমি কি লিখব? আল্লাহ শবে কদরের ঘোষণা লিখলেন, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত যা কিছু হবে তা লিখলেন এবং মাহবিচারের আগ পর্যন্ত লিখলেন।**

৩. একথার উপর বিশ্বাস করা যে আল্লাহর দ্বারা সবকিছু ঘটে।

কুরআনে বলা হয়েছে যে, **(সূরা- কাসাস, আয়াত- ৬৮)**

بُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

অর্থ: "আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা পছন্দ করেন। এতে তাদের কোনো হাত নেই।"

(সূরা- ইবরাহীম, আয়াত- ২৭)

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

অর্থ: "আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

(সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৬)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

অর্থ: "তিনিই সে আল্লাহ যিনি মায়ের গর্ভে তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, যেমন তিনি চেয়েছেন।"

(সূরা- নিসা, আয়াত- ৯০)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

অর্থ: "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন।"

(সূরা- আনয়াম, আয়াত- ১১২)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ

অর্থ: "যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন তবে তারা এমন কাজ করতো না।"

(সূরা- যুমার, আয়াত- ৬২)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

অর্থ: "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"

(সূরা- ফুরকান, আয়াত- ২)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

অর্থ: “তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।”

(সূরা- সাফফাত, আয়াত- ৯৬)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।”

(সূরা- বাকারা, আয়াত- ২২৩)

وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ

অর্থ: “আর নিশ্চিত থাক যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে।”

(সূরা- তাগাবুন, আয়াত- ১৬)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا

অর্থ: “ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শোন, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো।”

প্রশ্ন: সবকিছুই আল্লাহ দিয়েছেন, ভালো কাজ আল্লাহর জন্য এবং মন্দগুলো নিজের জন্য। এই ব্যাপারটি স্ববিরোধী নয় কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : কুরআনে অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব কিছু আল্লাহর দ্বারা ঘটে। যেমন, (সূরা- নিসা, আয়াত- ৭৯)

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

অর্থ: "আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।"

সাধারণ দৃষ্টিতে এটা স্ববিরোধী মনে হয়, কিছু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এখানে কোনো ধরনের স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় না। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যায়। যেমন- বিদ্যুতের কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এবং এটাকে আপনি ভালো- মন্দ, উপকারী- অপকারী উভয় কাজে ব্যবহার করতে পারেন। মেশিন, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বিদ্যুৎ দ্বারা চলে, কিন্তু যদি আপনি বিদ্যুতের সংযোগে আঙ্গুল রাখেন তাহলে অবশ্যই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবেন। কিন্তু এর জন্য আপনি বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করতে পারেন না। আরো একটি উদাহরণ দেয়া যাক- পিতা হলো পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। তিনি ব্যয় করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর দায়িত্বশীল। পিতা তার ছেলেকে হাত খরচের জন্য টাকা দেন। এখন ছেলে যদি সেই টাকায় জুয়া খেলা, মদপান ইত্যাদি পন্থায় ব্যয় করে তবে এর জন্য কি তার পিতা দায়ী হবে? একইভাবে আল্লাহ যা দেন তা সে বাজেভাবে গ্রহণ করে সুতরাং আয়াত দুইটির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই।

প্রশ্ন: কোনো কাজ করতে গেলে যদি বিপদ এসে পড়ে তাহলে মুসলমানদের কেমন দায়িত্বশীলতা দেখান উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যখন কোন মানুষের উপর বিপদ আসে, হয় এটি তার জন্য পরীক্ষা নয়তো শাস্তি। যদি এটা শাস্তি হয়, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- হুদ, আয়াত- ৮২)

مَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

অর্থ: "অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছলো, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে কাকর পাথর বর্ষণ করলাম।"

সুতরাং শাস্তি হিসাবে বিপদ আসলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। খারাপ কাজ করা বন্ধ করতে হবে। আর যদি পরীক্ষা হিসাবে বিপদ আসে তবে ধৈর্য ধরতে হবে। যেমন- কুরআনে উল্লেখ আছে যে, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৫৬)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অর্থ: "যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।"

অতএব ধৈর্যধারণ করতে হবে। আরো আছে যে, (সূরা- তওবা, আয়াত- ৫১)

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ: "আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।" এবং (সূরা- তাগাবুন, আয়াত- ১১)

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

অর্থ: "আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।"

বলা হয়েছে যে, (সূরা- যুমার, আয়াত- ১০)

اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়াতে সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য।" (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৫৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ৭১৩৮) "মুমিনরা ভালো কিছু ঘটলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় আর বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে পরকালে পুরস্কারের আশায়।"

সুতরাং কোনো ধরনের বিপদ আসলে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে বেশি করে ক্ষমা চাইতে হবে।

রমযানের ২১ ও ২২তম শিক্ষা

ই'তিকাফ

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: আপনি ই'তিকাফ শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ই'তিকাফ শব্দটি 'আকাফাহ' হতে এসেছে যার অর্থ- পরিষ্কার করা, শক্ত করা ইত্যাদি এবং কিছুকে অন্য কিছুর সাথে মিশিয়ে দেওয়া। সেই জিনিসটি হতে পারে ভালো কিংবা মন্দ। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, **"যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রাদায়কে বললেন: এই মূর্তিগুলো কি, যাদের তোমরা পূজারি হয়ে বসে আছো?" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৫২)**

এখানে এটা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অন্য স্থানে যেমন- **"যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম। তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী, ও রুকু সেজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫ ও ১২৭)**

ই'তিকাফের অর্থ হলো নিজেকে কোনো কিছুর সাথে পুরোপুরিভাবে মিশিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ই'তিকাফ হলো নিজেকে পুরোপুরিভাবে মসজিদের সাথে মিশিয়ে দেওয়া। ইসলামী শরীয়তে ই'তিকাফ বলতে বোঝায়- আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পুরষ্কারের আশায় নিজেকে পুরোপুরিভাবে মসজিদে নিয়োজিত করা।

প্রশ্ন: ই'তিকাফ কি সকল মুসলিমের উপর ফরজ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ই'তিকাফ সাধারণত সুন্নাত, এটা ফরজ নয়। এটা ওই ক্ষেত্রে ফরজ হবে যদি কেউ ওয়াদা করে যে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিন ই'তিকাফ করবে। যেমন- কেউ ওয়াদা করলো যে যদি সে পরীক্ষায় পাস করে তবে সে তিন দিন ই'তিকাফ করবে তবে তার জন্যে সেটা ফরজ।

কিন্তু সাধারণত ই'তিকাফ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। হাদীসে বলা হয়েছে, **"যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করার ওয়াদা করলো তার উচিত ওয়াদা পালন করা আর যে আল্লাহর ইবাদত**

করবে না বলে ওয়াদা করলো তার উচিত সেই ওয়াদা পালন না করা।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৯৬)

কুরআনে বলা হয়েছে যে,

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

অর্থ: “আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম। তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু সেজাদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

এই আয়াতে ই’তিকাফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

অর্থ: “আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের শেষ দশ দিন ই’তিকাফে বসতেন এবং তার মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) এই ধারা অব্যাহত রাখেন।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৬)

সুতরাং ই’তিকাফ সুন্নাত।

প্রশ্ন: ই’তিকাফের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : ই’তিকাফের প্রধান লক্ষ্য হলো লাইলাতুল কদর খোঁজ করা। হাদীসে আছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ২৬২৭) “নবী (ﷺ) রমযানের প্রথম দশ দিনে ই’তিকাফ করতেন, অতঃপর বলা হয়েছে, তিনি রমযানের মাঝের দশ দিন ই’তিকাতে বসতেন এবং তিনি তার চারপাশে পাটি ঝুলিয়ে দিতেন এবং আরো বলা হয়েছে সাথে থাকতে চাও তারা থাকতে পারো।”

কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- ক্বদর, আয়াত- ৩)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অর্থ: "শবে ক্বদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।"

অর্থাৎ এক হাজার মাসকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ৮৩ বছরের কিছু বেশি হয় যেটা কিনা মানুষের গড় আয়ুর চেয়ে বেশি। তার মানে কদরের রাতে কেউ ইবাদত করলে সে সারাজীবনে যত ইবাদত করেছে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ২৬২৭) "লাইলাতুল কদরের রজনী খোঁজার জন্যে মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের প্রথম দশদিন, মাঝের দশদিন এবং শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন এবং পরবর্তীতে এট বলা হলো যে, রমযানের শেষ দশদিনে লাইলাতুল ক্বদর রয়েছে।" অপর হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ মুসলিম, হা: নম্বর- ২৬২৫) "যে আমার সাথে ই'তিকাফ বসতে চায় সে বসতে পারে।" অর্থাৎ তিনি এটাকে বাধ্যতামূলক করেননি।

তবে লাইলাতুল ক্বদর খোঁজার পাশাপাশি আরো কতগুলো লক্ষ্য রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. অন্য সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।
২. অধিক ইবাদতের জন্য সব ঝামেলা হতে মুক্ত থাকা।
৩. রোযাগুলো অত্যন্ত তাকওয়ার সাথে পালন করা।
৪. অত্যন্ত মনোযোগের সাথে রাসূলুল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত পালন করা।

এইগুলো হলো ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন: ইতিকাফে অবস্থান কালে কেউ কি মসজিদ ছেড়ে যেতে পারবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইতিকাফে অবস্থানকালে সাধারণত কেউ মসজিদ ত্যাগ করতে পারবে না। যদি কেউ তা করে তবে সেটা ইতিকাফের মূলনীতি অমান্য করা হয় এবং ইতিকাফকে সারবস্তুহীন করে ফেলে। কিন্তু অতি জরুরি প্রয়োজনে মসজিদ ত্যাগ করা যাবে। যেমন- কোন ব্যক্তি যে ইতিকাফে বসেছে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া অযু করা, গোসল করা, বাইরে থেকে খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি অতি জরুরী প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে আসা যাবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) ইতিকাফ অবস্থানকালে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৯)

সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে মসজিদ ত্যাগ করা যাবে, তবে যত দ্রুত সম্ভব আবার মসজিদে হাযির হতে হবে। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"যে ব্যক্তি ইতিকাফ করছে তার জন্য সুন্নাত হলো- রোগীকে দেখতে না যাওয়া, স্ত্রীর সাথে না থাক এবং অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ ত্যাগ না করা।"** (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪৬৭)

সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, ইতিকাফে বসলে প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ ত্যাগ করা অনুমোদিত নয়।

প্রশ্ন: কোন কাজগুলো ই'তিকাফকে বাতিল বা অকার্যকর করে দেয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : যে কাজগুলো করলে ই'তিকাফ অকার্যকর হয়ে যায় সেগুলো হলো:

১. জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ ত্যাগ করলে।
২. স্ত্রী সহবাস করলে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,
(সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৭)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

অর্থ: "আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় থাকো ততক্ষণ তোমরা তোমদের স্ত্রীর সাথে মিশো না।"

তবে স্ত্রী যদি স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করে তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি আবেগের সাথে পরস্পরকে স্পর্শ করে তবে এক্ষেত্রে একদল আলেম বলেন যে, ই'তিকাফ মাকরুহ হয়ে যাবে এবং অন্যদল বলেন যে, এতে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। যে আলেমরা বলেছেন ই'তিকাফ বাতিল হবে না তাদের যুক্তি হলো তারা উল্লিখিত আয়াতের বিষয়কে শুধু স্ত্রী সহবাসের ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছেন অর্থাৎ আয়াতের অর্থ ধরে নিয়েছেন যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলেই ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আবেগের সাথে স্পর্শ করলেই ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

* **মাসিক এবং সন্তান প্রসবের পর প্রবাহিত রক্তের কারণে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।**
* **পাগলামি করলে বাতিল হবে।**
* **আল্লাহর সাথে শরীক করলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে,**

(সূরা- যুমার, আয়াত- ৫২, ৬৫)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

অর্থ: "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন।" এবং

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।"

সুতরাং এই জিনিসগুলো করলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ই'তিকাফের সময় কী কী কাজ করা গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনুমোদিত কাজগুলো নিম্নরূপ:

* জরুরি প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে বের হওয়া যেতে পারে।
* মসজিদের ভিতর ঘুমানো, খাওয়া, পান করা ইত্যাদি করা যেতে পারে তবে মসজিদের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে।
* গোসল করা, পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আতর মাখা ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। **"ইতিকাফে অবস্থানকালে মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদের ভিতর থেকে ঘরের ভিতর মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং যদিও আমি ঋতুমতী অবস্থায় থাকতাম, আমি তার মাথা মুছে দিতাম এবং চুলে তেল মেখে দিতাম।"** (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৪)

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, **'আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) ইতিকাফে অবস্থানকালে মসজিদ থেকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং তার মাথা মুছে দিতাম এবং তেল মেখে দিতাম এবং তিনি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।"** (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৯)

* ইতকাফে অবস্থানকালে স্ত্রীদের সাথে সাধারণ কথাবার্তা বলা যাবে। হাদীসে আছে, "মুহাম্মদ (ﷺ) ইতিকাফে অবস্থানকালে তার স্ত্রী সাফিয়া (রাঃ)- এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং কথাবার্তা বললেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৩৫)

আরেকটি হাদীসে আছে যে, "মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কোনো এক স্ত্রী তার সাথে ইতিকাফ করতেন।" সুতরাং স্ত্রীর সাথে কথা বলার অনুমোদন আছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৩৭)

প্রশ্ন: এগুলো ছাড়া আর কোনো নির্দেশনা আছে যেগুলো পালন করলে ই'তিকাফ আরো খাঁটি এবং মজবুত হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইতিকাফের সময় অন্যান্য নির্দেশিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

* নামাজ আদায় করতে হবে।
* যত বেশি পারা যায় তত সুন্নাত, নফল ইত্যাদি নামাজ আদায় করতে হবে।
* বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ প্রার্থনা করতে হবে।
* আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
* যিকর করতে হবে। যেমন- সুবাহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি।
* মুহাম্মদ (ﷺ)- এর রূহের প্রতি দরূদ পাঠ এবং মাগফিরাত কামনা করতে হবে।
* যথাসম্ভব বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে।
* কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তাফসীর পড়তে হবে। হাদীস পড়তে হবে।
* কোনো ব্যাপারে চরমপন্থী বা গোঁড়ামী করা যাবে না।

হাদীসে এসেছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- শপথ ও প্রতিজ্ঞা, হাদীস নং ৬৭০৪) "একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাস করলেন, কি ব্যাপার? সে বলল যে, সে আবূ ইসরাঈল এবং সে শপথ করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না। কথা বলবে না, ছাউনির বাইরে যাবে না এবং সে রোযা রাখবে। অতঃপর মুহাম্মদ (ﷺ) কোনো একজনকে বললেন, তাকে কথা বলতে বল, বসতে বল এবং তাকে রোযা সম্পূর্ণ করতে বল।" সুতরাং বাড়াবাড়ি করা যাবে না বরং স্বাভাবিক পন্থায় ইবাদত করতে হবে।

প্রশ্ন: ই'তিকাফের পূর্ব শর্তগুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শর্তগুলো হলো-

১. ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে।
২. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে।
৩. পবিত্র থাকতে হবে।
৪. মাসিক হতে মুক্ত হতে হবে।

এছাড়া আরো দুটি শর্ত রয়েছে যেগুলো ই'তিকাফের প্রধান শর্তের অন্যতম। তাহলো-

১. নিয়ত থাকতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পুরস্কারের আশায় ই'তিকাফ বসতে হবে।

২. তাকে অবশ্যই মসজিদে অবস্থান করতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন, **(সূরা- বাকার, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৭) "আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ই'তিকাফের জন্যে মসজিদে অবস্থান করো ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না।"**

তবে মসজিদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কিছু আলেম বলেন, ই'তিকাফ যেকোনো মসজিদে হতে পারে। তবে অধিকাংশ আলেম বলেন যে, ই'তিকাফে বসতে হবে ওই মসজিদে যেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার নামাজ আদায় করা হয়। কারণ যে মসজিদে নিয়মিত জামাত হয় না সেখানে কেউ ই'তিকাফে বসলে তাকে বারেবারে নামাজ পড়ার জন্য বাইরের কোনো মসজিদে যেতে হবে যেখানে জামায়াতে নামাজ হয় এবং এটা আমলে ই'তিকাফের আসল উদ্দেশ্যটাকেই ব্যাহত করে, কারণ মসজিদ ছেড়ে বার বার বাইরে যাওয়াটা ই'তিকাফের মূলনীতি বহির্ভূত। তবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয় এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা যেতে পারে, তবে জুমার নামাজও পড়ানো হয় এমন মসজিদে আরো উত্তম। আরো পূর্বশর্ত হাদীসে বলা হয়েছে। যেমন, **(আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪৬৭) "ই'তিকাফে অবস্থানকালে রোগী দেখতে না যাওয়া সুন্নাত।"**

* তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৪৬৭) "আয়েশা (রা.) বলেন, রোযা না রেখে ই'তিকাফ করা যাবে না।"** তবে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, **(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- শপথ, হাদীস নং ৬৬৯৭) "হযরত ওমর (রা.) বলেন, তিনি জাহেলিয়ার যুগে শপথ করেছিলেন যে, তিনি মসজিদুল হারামে এক রাতের জন্যে ই'তিকাফ করবেন। মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করো।"** অতএব সে সময় রাতে তিনি কিন্তু রোযা ছিলেন না কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) তাকে তখন ই'তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমোদন হতে বোঝা যায় যে, ই'তিকাফের জন্যে রোযা রাখা ফরজ নয়, তবে এটা নির্দেশিত সুন্নাত। এটা সুন্নাতে মুস্তাহব। সুতরাং রোযা রেকে ই'তিকাফ করতে হবে।

প্রশ্ন: রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফে বসার জন্যে ঠিক কোন সময়টিতে ইতিকাফে বসতে হবে? আর ইতিকাফের লক্ষ্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। একজন বলেন, ইতিকাফ শুরু করতে হবে একুশতম রাতের ফজরের নামাজের পর হতে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, যেমন ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী এবং হাম্বল তারা বলেন যে, যদি কেউ রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতে চায় তবে তাকে একুশ তম রাতের সুর্যাস্তের আগেই ইতিকাফে বসতে হবে এবং তারা বলেছেন যে, যেহেতু ইতিকাফের মূল লক্ষ্য হলো লাইলাতুল রাতের আগে ইতিকাফে বসলে একুশতম রাতটিও পাওয়া যাবে এবং মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, রমযানের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।

সুতরাং কেউ যদি ফজরের পর হতে আরম্ভ করে তবে সে একুশতম রাতটি মিস করবে এবং এই কারণে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একুশতম রাতের সূর্যাস্তের আগেই ইতিকাফে বসতে মতামত দিয়েছেন। এবং এই আলেমেরা বলেছেন যে, এমন কোন হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) ফজরের পর হতে ইতিকাফ শুরু করতেন। এটা বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ (সঃ) ফজরের নামাজের পর ইতিকাফের স্থানে আসতেন কারণ ঐ সময় বিচ্ছিন্নতা এবং নীরবতা পছন্দ করতেন। তারা আরো বলেছেন যে, ইতিকাফ আরম্ভ করতে হবে বিশতম রোযার ইফতার করার আগেই এবং ইতিকাফ শেষ করার ব্যাপারে অধিকাংশ আলেম একমত যে, ইতিকাফ শেষ করতে হবে রোযার শেষ দিনের সূর্যাস্তের পরে। অর্থাৎ রোযা যদি ২৯টি হয় তবে ২৯তম দিনের সূর্যাস্তের পর ইতিকাফ ভেঙ্গে ফেলতে হবে তবে ঈদের দিনের ফজরের আগ পর্যন্ত ইতিকাফ থাকা মুস্তাহাব। কারণ কিছু সাহাবী ছিলেন যারা এমনটি করতেন।

প্রশ্ন: ইতিকাফ কী শুধু রমযানের শেষ দশ দিনেই করা যাবে, নাকি অন্যান্য সময়েও করা যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শুরু রমযানের শেষ দশ দিনেই ইতিকাফ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি কেউ ইতিকাফ করার শপথ করে না থাকে তবে এটা ঐচ্ছিক ব্যাপার, সুন্নাত। এটা বছরের যেকোন দিন করা যেতে পারে। কিন্তু ইমাম আন নববীর মতে, সর্বোত্তম হলো শেষ দশ দিনের ইতিকাফ। কিন্তু আমরা রমযানের যেকোনো দিন এবং বছরের যেকোনো দিনেই ইতিকাফ করতে পারি।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "জাহেলিয়া যুগে ওমর (রাঃ) শপথ করেছিলেন যে তিনি মসজিদুল হারামে এক রাতের জন্যে ইতিকাফ করবেন। এ কথা শুনে মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করো।" (বুখারী, শপথ, হাদীস নং ৬৬৯৭)

অর্থ: ওমর (রাঃ) বছরের কোনো এক রাত্রে ইতিকাফে বসেছিলেন। আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) শাওয়াল মাসের প্রথম দশদিনে ইতিকাফ করতেন।" (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪১)

আরকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) পুরো রমযান মাসে ইতিকাফ করতেন।" (মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৭)

আরো বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তার মৃত্যুর পূর্বে রমযানের বিশ দিন ইতিকাফে ছিলেন।" (বুখারী, অধ্যায় ইতিকাফ, হাদীস নং ২০৪৪)

অন্য হাদীসে আছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফে থাকতেন এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরা সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।" (বুখারী, হাদীস নং ২০২৬)

সুতরাং হাদীস গুলো নির্দেশ করছে যে, রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফে বসা উত্তম। তবে ইচ্ছা করলে রমযানের যে কোনদিন বা বছরের যে কোনোদিন ইতিকাফে বসা যাবে।

প্রশ্ন: ই'তিকাফের পুরস্কারগুলো বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আবূ দাউদ মুহাম্মদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ই'তিকাফের পুরস্কার কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কিছু দুর্বল হাদীস ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এমন একাধিক দুর্বল হাদীস আছে যেখানে ই'তিকাফের পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন বলা হয়েছে, (আলবানি এবং ইবনে মাজাহ) "কোনো ব্যক্তি যে আল্লাহর পুরস্কার লাভের আশায় ই'তিকাফে বসে এবং কোনো পাপ করে না তবে সে ঐ পরিমাণ পুরস্কার পাবে যে পরিমাণ পুরস্কার পাবে সে তার মোট ভালো কাজের জন্যে। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একদিন ই'তিকাফ করে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।" তবে এগুলো যঈফ হাদীস। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়-কদর, হাদীস নং ২০১৪) "যে ব্যক্তি মনোযোগ এবং বিশ্বস্ততার সাথে কদরের রাতে নামাজ পড়ে তবে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"

সুতরাং কদরের রাত পড়ে রমযানের শেষাংশ দিনে এবং ইতিকাফ করা হয় শেষ দিনে। অতএব পুরস্কার অবর্ণনীয়। তবে পুরস্কারের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সহীহ হাদীস নেই। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, (আলবানি) **"যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করবে সে যেন দুটি হজ্ব এবং দুটি উমরা পালন করলো।"** এটি একটি যঈফ হাদীস তবে আরেকটি সাধারণ হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০২) **"যে ব্যক্তি ফরজ এবং নফল আদায় করে, আল্লাহ বলেন সেই ব্যক্তি আমার নৈকট্য লাভ করবে।"** নফল বলতে প্রার্থনা, ক্ষমা চাওয়া। নফল নামাজ এবং ই'তিকাফ ইত্যাদি বোঝায়। তবে ই'তিকাফের পুরস্কারের ব্যাপারে আমি কোনো সহীহ হাদীস মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন: মহিলাদের কি তাদের ঘরের মধ্যে ই'তিকাফ করার অনুমোদন আছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কুরআনে বলা হয়েছেন যে, (সূরা- বাকার, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৭) **"তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করো না।"** সুতরাং এই আয়াতে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে এবং এই নিয়ম নারী- পুরুষ সকলের জন্যে সমান। কিছু আলেম বলেন, ঘরের মধ্যে মহিলারা যেখানে নামাজ পড়ে সেখানে তারা ই'তিকাফে বসতে পারে। তবে অধিকাংশ আলেম বলেন, নারীরা মসজিদে ই'তিকাফ করবে। হাদীসে আছে যে, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৬) **"মুহাম্মদ (ﷺ) রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরা সেই অনুশীলন অব্যাহত রেখেছিলেন।"** সুতরাং মুহাম্মদ (ﷺ)- এর স্ত্রীরা মসজিদে ই'তিকাফ করতেন, তাছাড়া নারীদের ঘরের মধ্যে ই'তিকাফ করার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ই'তিকাফ ভঙ্গ করে তার কি কোনো কাফফারা দিতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঐচ্ছিক ই'তিকাফ ভাঙ্গলে তার জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না। তবে কেউ যদি মানতের বা শপথের ইতিকাফ ভঙ্গ করে তবে তাকে সেটি অন্য কোনো দিনে পূরণ করে নিতে হবে। আর ঐচ্ছিক ই'তিকাফ ভেঙ্গে ফেলার জন্য কোনো কাফফারা না থাকলেও সেটি পরে কোনো একসময় করে নেওয়া উত্তম।

প্রশ্ন: স্ত্রীকে ই'তিকাফ পালনে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যেহেতু ই'তিকাফের জন্যে বাড়ি ছেড়ে মসজিদে যেতে হয় এবং এটা যদি ঐচ্ছিদ ই'তিকাফ হয় তবে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আর ফরজ ই'তিকাফ হলে ইতিকাফ যেতে হবে স্বামীর অনুমতি নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: ই’তিকাফে অবস্থানকালে কাউকে উপদেশ বা কোনো কিছু আলোচনা করা যাবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এটা প্রথমেই বলা হয়েছে যে, ই’তিকাফের মূল কাজ হলো বেশি করে নামাজ পড়া, দু’আ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি। তবে যদি কেউ কাউকে শিক্ষা দিতে চায় বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা তবে কোনো সমস্যা নেই কারণ এর মাধ্যমে আপনি আরেকজনকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করছেন।

রমযানের ২৩তম শিক্ষা

আত্ম উন্নয়ন এবং ইসলাহ (সংশোধন)

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: রমযানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাহ দ্বারা কি বোঝানো হয়?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলাহ আরবি শব্দ যার অর্থ- সংশোধন করা, উন্নতি সাধন ইত্যাদি। যখন একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে সংশোধন করে কিংবা ব্যক্তি নিজেই সংশোধিত হয় তখন তাকে ইসলাহ বলে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুসলিম নামাজ পড়া বা অন্য কোনো কাজে ভুল পথে অগ্রসর হলে অন্য কোনো মুসলমান তাকে সেই ভুল থেকে সংশোধনের চেষ্টা করলে তাকে বলা হবে ইসলাহ।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, (সূরা- হুদ, আয়াত- ৮৮)

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থ: “(শোয়ায়েব (আ.) বললেন) আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হবো। আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আমার কার্য সম্পাদন তো আল্লাহরই সাহায্যে।”

সুতরাং তিনি তার উম্মতকে সংশোধন করতে চেয়েছেন।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ১১৪)

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ: "তাদের অধিকাংশ শলাপরামর্শ ভালো নয়, কিন্তু যে শলা পরামর্শ দান খয়রাত কিংবা সৎকাজ বা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করবো।"

সুতরাং এখানে আল্লাহ তায়ালা এক মুসলিম অপর মুসলিমের উন্নতি এবং সংশোধন করার কথা বলেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থ: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটান হয়েছে। তোমরা সংকাজে নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।"

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ অন্য মুসলিমের কল্যাণ কামনা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- বিশ্বস্ততা, হাদীস নং- ৭৯) যখন কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিম ভাইকে ভ্রষ্ট পথে বা কাজে পরিচালিত হতে দেখবে তখন তার উচিত সেটি হাত দিয়ে থামান। অসম্ভব হলে মুখে নিষেধ করা এবং এটিও সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে তাকে মন থেকে ঘৃণা করবে।" সুতরাং সংশোধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন: আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধনীর জন্য রমযান মাসের গুরুত্ব এত বেশি কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযান উত্তম মাস। কারণ আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৩)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: “তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনটি করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার।”

সুতরাং রমযান মাস গুরুত্বপূর্ণ। যখন রোযা রাখা হয় তখন অন্যের দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটি বেশি ঘটে থাকে ফলে সংশোধনী সহজ হয়।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (মুসনাদ আহমদ, ৭১৪৮)

অর্থাৎ, “রমযান হলো সেই মাস যে মাসে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়।”

যেহেতু শয়তানকে বেঁধে ফেলা হয় তাই শয়তানের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে, ফলত মানুষ নিজেকে সংশোধিত করতে পারে অনেকটা সহজভাবে। আর বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, যেটি মানুষকে ভালো কাজ করে উহার ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আহবান করে।

উপরে উল্লিখিত হাদীসটি সুনানে নাসাঈ এর রোযা অধ্যায়ের ২১০৬ নম্বর হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে। বুখারীতে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (সহীহ বুখারী, অধ্যায়- রোযা, হাদীস নং ১৯০১) “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।”

সুতরাং রমযানই হলো সংশোধিত হয়ে পরিচ্ছন্নভাবে জীবন শুরু করার উত্তম মাস।

রমযানের ২৪তম শিক্ষা

দুই রমযানের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের করণীয়

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: মুসলমানরা কীভাবে রমযানের অর্জনগুলো পরবর্তী সারা বছরে কাজে লাগাতে পারে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি কোনো মুসলমান রমযান মাস পায় এবং যদি রোযা রাখে এবং রাতের বেলায় কিয়ামুল লাইল নামাজ আদায় করে আর যদি সে ভালো কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখে তাহলে পরবর্তী সারা বছরে সে নিজেকে ভালো কাজের সাথে জড়িত রাখতে পারবে ইনশা- আল্লাহ এবং এই সব বৈশিষ্ট্য হলো ঈমানদারের চিহ্ন। বস্তুত, রমযান পরবর্তী অবস্থা হলো সবচেয়ে বড় চিহ্ন যার দ্বারা বোঝা যায় যে, একজন রোযাদার ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অর্জন করেছে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে সে ভালো কাজ করে, সকল ফরজ আদায় করে এবং রাত্রিকালীন নামায আদায় করে এবং এগুলো হলো বিশেষ চিহ্ন যার মাধ্যমে বুঝা যায় তার রোযা কবুল হতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, (সূরা- আহকাফ, আয়াত- ১৩)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ; অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- পবিত্রতা, হাদীস নং ৪৫০)

অর্থাৎ, "প্রত্যাহিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ, পরবর্তী জুমা এবং চলতি রোযা হতে পরবর্তী রোযা হলো পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সময়সীমা।"

সুতরাং রমযান মাসে এই রকম আচরণ করতে থাকলে রমযানের পরেও রোযার উপর কায়েম থাকা যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করা যাবে ইনশা- আল্লাহ। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- বিশ্বস্ততা, আয়াত- ৬২)

অর্থাৎ, "সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন মুহাম্মদ (ﷺ)- এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যা আমি অন্য কারোর নিকট গিয়ে শুনতে পাই নি। তিনি বললেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং এর উপর কায়েম থাকো।"

কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- ইবরাহীম, আয়াত- ২৭)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

অর্থ: "আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে মজবুদ বাক্য দ্বারা মজবুত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।"

সুতরাং লোকের উচিত সত্যের ওপর কায়েম থাকা। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ- বুখারী, হাদীস নং ৬৪৬৫)

অর্থাৎ, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ঐ ভালো কাজ যেটি নিয়মিত করা হয়, যদিও সেটা অত্যন্ত অল্প হয়।"

সুতরাং মুসলমানদের উচিত রমযানের পরে আল্লাহর বিশ্বাসের ওপর কায়েম থাকা, তবেই রমযানের পর সারা বছর ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: রমযান মাসে এবং রমযান পরবর্তী সময়ে আদর্শ অবস্থা কোনটি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযানের পরে একজন সত্যিকারের মুসলমানের অবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যে, সে প্রথমেই আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে এজন্য যে, সে পুরো রমযান মাস সুস্থভাবে রোযা রাখতে পেরেছে। একজন সত্যিকার মুসলমানের অবস্থা রমযান মাস আরম্ভ হলে যেমন ছিলো রমযানের পরবর্তী সময়ে তার চেয়ে উত্তম হয় এবং দিন দিন তার সৎ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সত্যিকারের মুসলমানরা এ ব্যাপারে শংকিত থাকে যে তাদের ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ কবুল করলেন না? এবং তারা একে অপরের সাথে ভালো কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং আশা করে যে, আল্লাহ তাদের রোযা এবং অন্যান্য ইবাদত কবুল করে নেবেন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- মায়েদাহ, অধ্যায়- ৫, আয়াত- ২৭)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ করেছিলো, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিলো এবং অপরজনের গৃহীত হয় নি। সে বলল: আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো, সে বলল: আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষে থেকেই তো কুরবানী গ্রহণ করেন।"

সুতরাং তাদের উচিত সারা বছর সৎ কাজের ভিতরে কাটান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান রমযান মাসে খুব ধার্মিক হয়ে ওঠেন কিন্তু রমযানের পর দেখা যায় সকল ভালো কাজগুলো তাদের নিকট থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকেই জামাআতে নামাজ পড়েন না,

এমনকি ফজরের নামাজও পড়েন না। তারা চিন্তা করে যে আল্লাহ শুধু রমযান মাসেই রহমত করেন। কিন্তু তিনি শুধু রমযান মাস নয় বরং সারা বছরই রহমত করেন। সুতরাং বছরের সব সময়ই আল্লাহর ওয়াস্তে ভালো কাজগুলো চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন: রমযানের পর সারা বছর আমরা কীভাবে ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে:
আল্লাহর সহযোগিতা চাইতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ১৬০)

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ: "যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে? আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।"

সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত যেন আমরা সঠিক পথে থাকতে পারি। আমরা কী দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ অধিক খুশি হবেন সেটা আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন। যেমন- (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ৮)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: "হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সব কিছুর দাতা।"

বিশেষ করে রমযানের পরে আমরা এই দু'আ করতে পারি।

* আমাদের উচিৎ সৎ এবং পরহেজগার লোকের সাথে চলাফেরা করা, যাতে করে ভালো কাজে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

* বিভিন্ন ইসলামী বক্তৃতা, আলোচনা, সেমিনার এবং কনফারেন্সে যোগ দিতে হবে।

* বিভিন্ন ইসলামী প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে ইসলামী জ্ঞানার্জন করতে হবে যেন আরোও বেশি বেশি সৎ কাজ করা সম্ভব হয়।

* ইসলামী বই, কুরআনের তাফসীর এবং সহীহ হাদীস পড়তে হবে।

* সকল ফরজ ইবাদতগুলো পালন করতে হবে।

* নফল ইবাদত আদায় বৃদ্ধি করতে হবে।

* বেশি বেশি যিকিরে মশগুল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

* শয়তানি কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অনৈসলামিক মুভি, গান এবং অনৈসলামিক ওয়েবসাইট ভিজিট করা যাবে না।

* আল্লাহর কাছে বিভিন্ন ভুল- ত্রুটির জন্য বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন: রমযান মাসের পর মুসলমানরা তাদের ইবাদতগুলো নিয়মিত চালিয়ে যেতে পারে না কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কারণগুলো নিম্নরূপ:

* লোকজন বিবেচনা করে যে রমযান মাসের কাজকর্মগুলো এক ধরনের বিশেষ রীতিনীতি অর্থাৎ রমযান মাসে এগুলো করতেই হবে। এমন অনেক লোক আছে যারা তারাবীর নামাজ পড়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ফজরের নামাজ পড়ে না।

* অনেকেই আছে যারা রমযানে যে পরিবেশে অবস্থান করতো রমযানের পরে আর সেই পরিবেশে থাকতে পারে না।

* অনেকেই রমযানের প্রথম দিকে ঈমানের ব্যারোমিটার উর্ধ্বমুখি হয় কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, ভালো কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

* হাদীসে বলা হয়েছে যে, (মুসনাদে আহমদ, ৭১৪৮)

অর্থা', "রমযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেওয়া হয় আর বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

সুতরাং রমযান মাসে ইবাদত অনেক তীক্ষ্ণ হয়, কারণ শয়তান বাঁধা থাকে কিন্তু রমযানের পরে শয়তান মুক্ত হয়ে যায় তখন ইবাদতের তীক্ষ্ণতা কমে যায়।

অতএব এগুলোই রমযানের পর ভালো কাজ বা ইবাদত করতে না পারার মূল কারণ।

প্রশ্ন: শুধু রমযান মাসেই লোকজন বেশি ইবাদত করে এবং অন্য মাসে করে না। এই ক্ষণস্থায়ী ইবাদতের মানসিকতা থেকে আমরা কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রথমত, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, রমযান কোনো বিশেষ রীতি নয় বরং এটা একটা ফরজ ইবাদত। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- হিজর, আয়াত- ৯৯) "এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।" সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এগুলো করতে হবে।

* ঈমানদার লোকজনের সাথে চলাফেরা করতে হবে।

* ইবাদতকে কঠিন অনুভব করা চলবে না, বোঝা মনে করা চলবে না এবং সঠিক পথে কায়েম থাকতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ৬৯)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।"

হাদীসে বলা হয়েছে যে, (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- আখিরাত, হাদীস নং ৬৭৭৮)

অর্থাৎ, "বেহেশতের পথ পরিশ্রম দ্বারা পরিপূর্ণ আর দোজখের পথ লোভ লালসার পরিপূর্ণ।"

সে কারণে মানুষ ভালো কাজকে কঠিন মনে করে এবং মন্দ কাজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং শয়তানের অসওয়াসা হতে দূরে থাকতে হবে।

* আল্লাহর পথে জীবনপণ সংগ্রাম করতে হবে। এর জন্য সর্বোত্তম দু'আটি কুরআনে উল্লেখ আছে। যেমন- (সূরা- আনআম, অধ্যায়- ৬, আয়াত- ১৬২)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "বলুন: আমার নামাজ, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"

এভাবে চললে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক ও সরল পথে রাখবেন বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন: রমযানের পর মানুষ যেসব মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তার জন্য টেলিভিশন কতখানি দায়ী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: টেলিভিশন ভালোর চেয়ে শতগুণ মন্দ। এটা মানুষকে নৈতিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি এটাকে "শয়তানের পদাঙ্ক" বলে আখ্যায়িত করি, কারণ-

* টেলিভিশন মানুষকে নামাজ আদায় হতে বিরত রাখে।

* এটা নারীদের নগ্নতা দেখায়। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- নূর, আয়াত- ৩০, ৩১)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে......।" এবং "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে......তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের গোপন সাজ সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।"

সুতরাং একজন মুসলিম কীভাবে টেলিভিশন দেখতে পারে যেখানে নারীরা খোলামেলা পোশাকে উপস্থিত হয়! আর বর্তমানে ৯৯% চ্যানেলই এমন নগ্নতা প্রদর্শনের চ্যানেল।

* টেলিভিশন অপচয় করতে উৎসাহ দেয়। কারণ, এর মাধ্যমে নতুন মডেলের গাড়ী, নতুন এ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি বিজ্ঞাপন দেয় এবং এগুলো দেখে মানুষ সেগুলো কিনতে উৎসাহী হয় এবং অপচয় করে। কুরআনে বলা হয়েছে, (বনী ইসরাইল, আয়াত- ২৬, ২৭)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"

* টেলিভিশন মানুষকে অযথা রূপচর্চা করতে এবং অশ্লীল পোশাক পরতে উৎসাহিত করে।

* এটা খুব বেশি মারামারি কাটাকাটি দেখায় যেটা মানুষের জীবন প্রণালীকে প্রভাবিত করে। ১৯৯৯ সালের আমেরিকার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে টেলিভিশনে প্রচারিত ভায়োলেন্স শিশুদের মনে বাজে প্রভাব ফেলে এবং এটা তাদেরকে হিংস্র এবং অসামাজিত করে তোলে।

* টেলিভিশনে যৌনবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শো ইত্যাদি দেখায়। প্রচারিত সবচেয়ে লাভজনক চ্যানেল হলো ওই চ্যানেল যে চ্যানেলে পর্ণগ্রাফি দেখানো হয় এবং এই চ্যানেলগুলো খুবই সস্তা। সুতরাং এগুলোই হলো টেলিভিশনের কুফল।

প্রশ্ন: রমযান আমাদেরকে যে ধৈর্যের শিক্ষা দেয় সেটির গুরুত্ব কতখানি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক : সবর বা ধৈর্যের কথা কুরআনে ১০২ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সবর ইসলামের অন্যতম একটি গুণ এবং সবরের মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহর খুব কাছে আসতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, আয়াত- ৪৫)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ: "ধৈর্যের সাহায্যে প্রার্থনা করো নামাজের মাধ্যমে, অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।"

আরো বলা হয়েছে- (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৫৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"

অনত্র বলা হয়েছে- (সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

অর্থ: "এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল- ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্য ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত।" এবং (সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ২০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো।" এবং (সূরা- হুদ, আয়াত- ১১৫)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "আর ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"

আরো বলা হয়েছে যে, (সূরা- নাহল, আয়াত- ১২৭)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

অর্থ: “আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।” এবং (সূরা- আসর, আয়াত- ১- ৩)

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: “কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং সবরের।”

সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হলো ধৈর্যধারণ এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য কমপক্ষে চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সেগুলো হলো:

১. ঈমান আনতে হবে।
২. ভালো কাজ করতে হবে।
৩. মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করতে হবে।
৪. মানুষকে ধৈর্যধারণের আহবান করতে হবে।

যদি এগুলোর কোনো একটি বাদ পড়ে যায় তবে জান্নাত যাওয়া সম্ভব হবে না, তবে যদি আল্লাহ মাফ করে দেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- নিসা, আয়াত- ৪৮, ১১৬)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।”

সুতরাং সাধারণভাবে চারটি বিষয়ের কোনো একটি ত্যাগ করলে জান্নাতে যাওয়া যায় না এবং ঐ চারটির মধ্যে অন্যতম হলো সবর। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- ইনশিরাহ, আয়াত- ৫- ৬)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি এবং স্বস্তির সাথে রয়েছে কষ্ট।"

অর্থাৎ কষ্ট, পরিশ্রম করলে তার পুরস্কার পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। সবরের অর্থ হলো ধৈর্য বা আত্মসংবরণ। যে ব্যক্তি কোনো কাজে ধৈর্যধারণ করে সে ভালো ফলাফল পায়, আর যে ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তি দ্রুত বেগে যায় এবং কোনো কাজে সুবিধা অনুভব করতে পারে না। অধৈর্য হওয়া খুবই বাজে অভ্যাস। সুতরাং ধৈর্যধারণের গুরুত্ব অপরিসীম।

রমযানের ২৫ ও ২৬তম শিক্ষা

রমযানে দাওয়াতের গুরুত্ব

প্রশ্ন: ইউসুফ চেম্বার: দাওয়াহ শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন কি? ইসলাহ'র (সংশোধন) সাথে দাওয়াহ'র পার্থক্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যখন কোনো ব্যক্তি দাওয়াতের কথা শোনে বিশেষ করে উপমহাদেশের লোকজন দাওয়াতের কথা শুনে তখন তাদের মনে খাসির বিরিয়ানী কিংবা মুরগির বিরিয়ানীর কথা জেগে ওঠে। আরো জেগে ওঠে লান্স পার্টির কথা ইত্যাদি। এই দাওয়াত বলতে লান্সপার্টির কথা বোঝায় না, এটার অর্থ হলো- আহবান এবং এখানে আমরা লান্সপার্টির কথা আলোচনা করবো না, আমরা আলোচনা করবো- দাওয়াতুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দিকে আহবান। আর এই দাওয়াত দেওয়া যায় শুধু ইসলামের বাইরের লোকদেরকে। দাওয়াত শুধু অমুসলিমদের জন্য। যখন অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকা হয় তখন তাকে দাওয়াত বলে। আরবি শব্দ ইসলাহ'র অর্থ হলো- সংশোধন করা, উন্নয়ন ঘটানো ইত্যাদি। সুতরাং যখন আমরা কোনো মুসলিমকে ইসলাম সম্পর্কে

বলি তখন এটাকে বলা হয় ইসলাহ এবং ইসলাহকেও এক ধরনের দাওয়াত বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে ইসলাহ শব্দটি ব্যবহার করা যথাযথ। অতএব নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ইসলাহ হলো মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে দাওয়াত দেওয়া এবং দাওয়াত বলতে বোঝায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা।

প্রশ্ন: দাওয়াত দেওয়া বা দাওয়াতি কাজ করা কী? ফরজ নাকি সুন্নাত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুসলমানের জন্য দাওয়াতি কাজকে ফরজ করা হয়েছে, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ১১০)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটান হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

সুতরাং কুরআনে মুসলমানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে। আর পদমর্যাদা বা দায়িত্ব ছাড়া কেউ সম্মানিত হতে পারে না। যেমন- কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সম্মান সাধারণ শিক্ষকদের চেয়ে বেশি এবং সাধারণ শিক্ষকদের মর্যাদা কেরানির চেয়ে বেশি। একইভাবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশি এবং সাধারণ শিক্ষকদের দায়িত্ব কেরানির চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষই দায়িত্বহীন নয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে কি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিৎ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ উক্ত আয়াতেই দিয়েছেন, বলেছেন- ভালো কাজগুলো করো আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো এবং অন্যকে ভালো কাজের পরামর্শ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দাও। আর এসব কারণেই আমাদেরকে খাইরে উম্মাহ বলা হয়েছে। যদি আমরা নির্দেশিত দায়িত্বগুলো পালন না করি তবে আমরা আর উত্তম জাতির মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী থাকি না এবং এটা মুসলমানদের উপর ফরজ। এমন অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াহ মুসলমানদের উপর ফরজ। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- আছর, অধ্যায়- ১০৩, আয়াত- ১ থেকে ৩)

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: "যুগের কসম, মানুষ ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।"

ইমাম শাফেয়ীর মতে, শুধু এই সূরাটি নাযিল হলেই তা সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট হতো এবং এই সূরাকে সকল সমস্যার সমাধান বা "রাহে নাজাদ" বলা হয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় তাকে অবশ্যই চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যেগুলো হলো:

১. ঈমান আনতে হবে।
২. সৎ কাজ করতে হবে।
৩. মানুষকে সত্যের পথে ডাকতে হবে। (দাওয়াহ)
৪. মানুষকে ধৈর্যধারণে আহবান করতে হবে।

যদি কেউ চারটি শর্তের একটি পালন না করে তবে সাধারণত সে জান্নাতে যেতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি ভালো মুসলিম হতে পারে। যে রোযা রাখে, হজ্ব করে, নামাজ পড়ে ইত্যাদি করে কিন্তু সে যদি উল্লিখিত চারটি শর্তের কোনো একটি পূরণ না করে তবে সূরা আছর অনুযায়ী সে জান্নাতে যেতে পারবে না। যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৪৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো সে যেন অপবাদ আরোপ করলো।"

সুতরাং দাওয়াতি কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। জান্নাতে যেতে হলে শুধু দাওয়াতি কাজ করলেই যথেষ্ট হবে না বরং চারটি শর্তের সবগুলোই পালন করতে হবে। সুতরাং দাওয়াহ ফরজ।

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম কৌশল কোনটি যা ব্যবহার করা যেতে পারে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দাওয়াতি কাজের জন্য একাধিক কৌশল রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। কৌশলগুলোর মধ্যে কয়েকটি অধিক কার্যকরি আবার কিছু আছে অল্প কার্যকরী। সবচেয়ে প্রচলিত কৌশলটি এমন যে, যখন একজন মুসলমান আরেকজন অমুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে তাকে ইসলামের ১০০টি গুণের কথা বলবে। যদিও ওই অমুসলিম ব্যক্তি এই ১০০টি গুণের ব্যাপারে একমত হবে তথাপি তার মনের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা থেকে যাবে। সে বলবে যে, ওহ, তুমি হলে সেই মুসলমান যে মৌলবাদী, তুমি সেই মুসলিম যে সন্ত্রাসী এবং তুমি সেই মুসলিম যে মুসলিম একাধিক বিবাহ করে। এই ধরনের বেশ কিছু নেতিবাচক ধারণা তার মাথার ভিতরে ঘুর ঘুর করতে থাকবে এবং এই সব নেতিবাচক ধারণা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।

আর এই কারণে আমি যখন কোনো অমুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন প্রথমেই আমি তাকে যে প্রশ্নটি করি তাহলো, আপনি ইসলামের কোন জিনিসগুলোকে ভুল বলে মনে করেন? এবং আমি তাকে সাবলীলভাবে ইসলামের সমালোচনা করার সুযোগ দিয়ে থাকি এবং তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিয়ে থাকি। এতে তারা সাধারণত ৪/৫টি প্রশ্ন করে যা আমি আমার ১৫/২০ বছরের দাওয়াতি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। অমুসলিমরা আমাকে মোটামুটি বিশটি প্রশ্ন করে থাকে এবং আমি আদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনি ইসলামে কি ভুল দেখতে পারছেন, এর জবাবে তারা আমাকে মোটামুটি ৪/৫টি পাল্টা প্রশ্ন করে যেগুলো ওই বিশটি সাধারণ প্রশ্নের ভিতরে পড়ে। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে সব অমুসলিমের মনের ভিতরে ওই বিশটি প্রশ্নের কয়েকটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে? এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে গণমাধ্যমের ওপর অর্থাৎ গণমাধ্যম কীভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করছে। বর্তমানে দেখা যায়- সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন, স্যাটেলাইট ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলো সার্বক্ষণিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে উত্তেজনাকর মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে।

সুতরাং সমসাময়িক গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে অধিকাংশ অমুসলিমের মনের ভিতরে সাধারণ কয়েকটি ধারণা জাগ্রত হয়েছে। অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে বর্তমানে যে ধারণা পোষণ করছে সেগুলো আজ হতে বিশ বছর আগে ছিলো না। এবং এমনটি হতে পারে যে এখনকার বিশটি সাধারণ ধারণা আগামী দশ বছর পরে অন্যরকম বিশটি ধারণাতে পরিবর্তিত হবে। তবে সেগুলো সব নির্ভর করছে মিডিয়ার রিপোর্টের ওপর। আমি মনে করি প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ ওই বিশটি প্রশ্নের যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক উত্তর জেনে রাখা এবং কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি জেনে রাখা। যদিও সে অমুসলিমকে ইসলামে আনতে না পারুক তাকে কমপক্ষে

নিরপেক্ষ মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া সম্ভব এবং এটাও মুসলমানদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া জন্য কুরআনের কোন আয়াতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ব্যাপারে কুরআনে শত শত আয়াত রয়েছে। অনেক আয়াত আছে যেগুলো দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। তবে আমি মনে করি দাওয়াতি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো এই আয়াতটি- (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ৬৪)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থ: "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের এবং তোমাদের ভিতর সমান, তা হলো- আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবো না। তার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা মানবো না।"

যদিও এই আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে বলা হয়েছে তবুও এটা আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদেরকেও বলা যাবে। সুতরাং তাদেরকে প্রথমে বলতে হবে তাওহীদের কথা। আমরা তাদের সাথে ইসলামের ভালো লাগা এবং মন্দ লাগা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি, তবে আমাদেরকে অবশ্যই তাওহীদের বিষয়টি আনতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহকে মানতে হবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। আর এই বিষয়টি উপস্থাপন ছাড়া দাওয়াত অর্থহীন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- নাহল, অধ্যায়- ১৬, আয়াত- ১২৫)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ: "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে এবং উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বির্তক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।"

সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াত দিতে বলেছেন যৌক্তিকতা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে।

প্রশ্ন: একজন হিন্দু ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ক্ষেত্রেও সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত (আগে উল্লেখ করা হয়েছে) শুনাতে হবে তাকে। এবং যেভাবে আলোচনা করতে হবে তা হলো- যখন আমরা কোনো হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কতগুলো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন: কেউ বলবে ৩ জন, কেউ ১০০, ১০০০, ৩৩০০০০০০০টি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু যখন এমন একজন হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করা হবে যার ধর্ম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রয়েছে সে বলবে যে হিন্দুদের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত। তবে সাধারণ হিন্দুরা 'প্যানথিজম' এ বিশ্বাস করে। প্যানথিজম অর্থ এটা বিশ্বাস করা যে পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বর। চাঁদ, সূর্য, গাছ, চেয়ার, টেবিল, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি সবকিছুই ঈশ্বর। অপরদিকে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে সবকিছুই ঈশ্বরের অর্থাৎ চাঁদ, সূর্য, গাছ, সাপ, পাখি ইত্যাদি সকল কিছু আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো হিন্দুরা বিশ্বাস করে সবকিছু ঈশ্বর আর মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সব কিছু ঈশ্বরের। এখানে শুধু পার্থক্য একটি বর্ণের তাহলো- **'র'**। যদি এই **'র'** বর্ণের সমস্যাটি দূর করা যায় তাহলে হিন্দু আর মুসলিমরা একত্রিত হয়ে যাবে। এটা কীভাবে করা যাবে? কুরআনে সে পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলতে হবে, (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ৬৪)

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থ: "এসো সেই পথে যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান, আর তা হলো- আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবো না। তার শরীক করবো না এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে পালনকর্তা মানবো না।"

কারণ আমরা যদি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ি তাহলে সেখানে বলা হয়েছে যে, **(ছান্দগী উপনিষদ, চ্যাপ্টার- ৬, সেকশন- ২, নিদর্শন- ১)** "ঈশ্বর একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই।" **(Shveta shvatara উপনিষদ, চ্যাপ্টার- ৬, আয়াত- ৯)** "তার কোনো ঈশ্বর নেই এবং কোনো মা- বাবা নেই।" আরো আছে যে, **(Shvata shvatara উপনিষদ, চ্যাপ্টার- ৪, আয়াত- ১৯)** "ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই।" এবং হিন্দুরা তাদের যে ধর্ম গ্রন্থটি বেশি পড়ে থাকে সেটা হলো- ভগবত গীতা, সেখানে **(গীতা, চ্যাপ্টার- ৭, নিদর্শন- ২০)** এক ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যে চারটি সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য সেগুলো হলো: **১. ঋগবেদ, ২. যুযুরবেদ, ৩. শামবেদ, ৪. অথর্ববেদ।**

বলা হয়েছে যে, **(যুযুরবেদ, অধ্যায়- ৩২, নিদর্শন- ৩)** "ওই ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই।" **(যুযুরবেদ, অধ্যায়- ৪০, নিদর্শন- ৮)** "ঈশ্বর সবসময় আকৃতিহীন।" জিনিসগুলোকে পূজা

করে।” এবং **(অথর্ববেদ, বুক- ২০, নিদর্শন- ৩)** “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান” এবং এই চারটি বেদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বেদ হলো ঋগবেদ। সেখানে বলা হয়েছে যে, **(Rigved,Book-1,Hymm-164, Voice-64)“সত্য** হলো এক, ঈশ্বর হলেন এক কিন্তু তাকে অনেক নামে ডাকা হয়।” এবং **(Rigved, Book-2, Hymm-1)** “সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ৩৩টির চেয়েও বেশি গুণের কথা বলা হয়েছে।” **(Rigved, Book-6, Hymm-46, V-16)** “ঈশ্বর একজনই, তাকেই ইবাদত কর।” ব্রাহ্মণ হিন্দুদের বেদান্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবান একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই এবং কখনও ছিলো না।” সুতরাং একজন হিন্দুকে অনুকূলে আনতে হলে প্রথমে তাকে তার নিজের ধর্মগ্রন্থ থেকেই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং প্রথমে তাকে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের কথা বলতে হবে; তারপর অন্যান্য সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্যে যেতে হবে।

প্রশ্ন: একজন খ্রিস্টানকে দাওয়াত দিতে হবে কোন পন্থায় এবং কীভাবে তার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে এক আল্লাহর প্রদর্শিত পথই আসল পথ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এক্ষেত্রে তাকেও সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াত-

অর্থ: এসো সেই কথায় যা তোমার এবং আমার মধ্যে এক..........।

শুনাতে হবে এবং আয়াত অনুযায় এগোতে হবে। যখন আমি কোনো খ্রিস্টানের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করি তখন আমি তাকে বলি যে, ইসলামই হলো খ্রিস্টানদের বাইরের একমাত্র ধর্ম যেখানে খ্রিস্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.)- কে বিশ্বাস করে। কোনো মুসলমানই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে খ্রিস্টানদের নবী ঈসা (আ.)- কে বিশ্বাস না করে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আ.) (যিশু) আল্লাহর নবী। যদিও খ্রিস্টানরা তাকে ঈশ্বর বলে মানে কিন্তু যদি বাইবেল দেখা হয় তাহলে এমন কোনো নিদের্শনা নেই যেখানে যিশু বলেছেন যে, আমি প্রভু এবং আমাকে প্রার্থনা করো। যদিও বাইবেলে লেখা হয়েছে যে, **(Gospel of John, Chapter-14, Voice-28)** “আমার পিতা আমার থেকে উত্তম।” **(Gospel of John, Chapter-10, V-29)** “আমার পিতা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম।” **(Gospel of Mathew, C-12, V-28)** “আমি প্রভুর ক্ষমতায় শয়তানকে নিক্ষেপ করি।” **(Gospel of John, C-5, V-30)** “আমি নিজে কোনো কিছু করি না। আমি শুধু শুনি, বিচার করি এবং আমার বিচার যথাযথ।”

প্রশ্ন: অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার সময় আর কোন বিষয়টি তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে যেটি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রথমে তাদের সাথে তাওহীদ তথা রিসালাত সম্পর্কে। সর্বশেষ রাসূল সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে রাজি করানোর পরে তাদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তবে এটা কীভাবে করা যায়? এটা আসলে তাদের ধর্ম গ্রন্থের কথা দ্বারাই প্রমাণ করা যায়। যেমন- ওল্ড টেস্টামেন্টে মুহাম্মদ (ﷺ) এর সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। যেমন-

(Book of Deuterenomy, Chapter-18, Voice-18,19)
(Book of Isaiah, C-29, V-12)
(Book of Solomon, C-5, V-16)
এবং নিউ টেস্টামেন্টের ভিতরেও রয়েছে, যেমন-
(Gospel of John, C-14, V-16)
(Gospel of John, C-16, V-26)
(Gospel of John, C16, V-7)
(Gospel of John, C16, V-12-14)
কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- আরাফ, অধ্যায়- ৭, আয়াত- ১৫৭)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

অর্থ: "যে সমস্ত লোক যারা আনুগত্য অবলম্বন করে ঐ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করে অসৎকর্ম থেকে, তাদেরকে যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন যাবতীয় হারাম বস্তু..........।"
এবং (সূরা- আসসাফ, আয়াত- ৬)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

অর্থ: "স্মরণ করো যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) বলল: হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তার নাম আহমদ....অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল: এতো প্রকাশ্য যাদু।"

এবং আমরা জানি যে মুহাম্মদ (ﷺ)- এর নাম আহমদ। এখন কথা হলো যে ব্যাপারে হিন্দুদেরকে কীভাবে বোঝাতে হবে? এটাও সম্ভব; কারণ তাদের ধর্মীয়গ্রন্থ থেকেই এই ব্যাপারে তাদেরকে বোঝানো যায়। যদি তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় তাহলে আমরা একশরও বেশি নিদর্শন দেখতে পাই যেখানে মুহাম্মদ (ﷺ) কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব গ্রন্থে সেগুলো আলোচিত হয়েছে- তাহলো- **(পুরান, পর্ব- ৩, খণ্ড- ৩, অধ্যায়- ৩, শ্লোক- ১০- ২৭)** এবং

(অথর্ববেদ, বই- ২০, স্তব- ১২৭, নিদর্শন- ১- ১৪)
(অথর্ববেদ, বই- ২০, স্তব- ২১, নিদর্শন- ৬)
(অথর্ববেদ, বই- ২০, স্তব- ২১, নিদর্শন- ৭) এবং
(ঋগবেদ, বই- ১, স্তব- ৫৩, নিদর্শন- ৯)

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কলকি পুরানে। **(কলকি পুরান, অধ্যায়- ২, নিদর্শন- ৫, ৭, ৯, ১১, ১৫)** এবং এই সবগুলো মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেছে। সুতরাং একইভাবে আমরা হিন্দু ভাইদেরকে ম্যানেজ করতে পারি, তাছাড়া একইভাবে বৌদ্ধদেরকেও বোঝানো সম্ভব। কারণ বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থেও নবী করীম (ﷺ) এর আলোচনা রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিসালাত।

প্রশ্ন: একজন নাস্তিককে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন কৌশল ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: একইভাবে নাস্তিককেও সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত শুনাতে হবে এবং সেভাবে এগুতে হবে। আমি যখন কোনো নাস্তিকের সাথে আলোচনা করি তখন আমি তাকে স্বাগত জানাই, কারণ অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম পালন করে এবং যে যে

ধর্ম পালন করে সেটা সে পায় তার পরিবারের কাছ থেকে। যেমন অনেকেই হিন্দু, কারণ তার বাপ- দাদারা ছিলো হিন্দু, অনেকেই মুসলমান, কারণ তার বাপ- দাদারা ছিলো মুসলমান। কিন্তু নাস্তিক হলো এমন ব্যক্তি যেকোনো প্রভুতে বিশ্বাস করে না এবং এই কারণেই আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ একজন নাস্তিক এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে 'লা- ইলাহা' অর্থাৎ কোনো ইলাহ বা প্রভু নেই এবং লা- ইলাহা হলো কালেমার প্রথম অংশ।

সুতরাং সে কালেমার প্রথম অংশ অনেক আগেই মেনে নিয়েছে এবং এখন আমার কাজ হলো তাকে এটা বিশ্বাস করানো যে, কোনো ইলাহা নেই তবে আল্লাহ ছাড়া। অর্থাৎ একজন নাস্তিক প্রথমেই মেনে নিয়েছে যে, কোনো মাবুদ নেই এবং তাকে বুঝাতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই এবং এই কাজটি আমি খুব সহজেই পারি ইনশা- আল্লাহ। অন্যান্য অমুসলিমকে এইসব ব্যাপারগুলো বোঝাতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যেমন তাকে এক আল্লাহ সম্পর্কে বোঝাতে হয় এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না সেটাও বোঝাতে হয়। কিন্তু নাস্তিকদের ক্ষেত্রে শুধু বোঝাতে হয় যে, একজন প্রভু আছেন তিনি হলো আল্লাহ। কারণ নাস্তিক আগে থেকেই বিশ্বাস করে নিয়েছে যে কোনো প্রভু নেই। এখন তাকে শুধু বিশ্বাস করাতে হয় যে, আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার দায়িত্বের অর্ধেকটা পূর্ণ হয়ে থাকে এবং আমাকে শুধু বাকি অর্ধেকের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং আমি এ দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে এবং যুক্তির সাথে পালন করে থাকি।

প্রশ্ন: তাওহীদ এবং রিসালাতের পরে আর কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেটি গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: তৃতীয়ত অর্থাৎ তাওহীদ এবং রিসালাতের পরে যে জিনিসটি আলোচনা করতে হবে তা হলো পরকালীন জীবন। তার সাথে নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

প্রথমত, এটা দেখতে হবে যে, সে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। যদি বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে আগ্রহী হয় তাহলে তার সাথে সে বিষয়ে কথা বলতে হবে। এক্ষেত্রে তার সাথে কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তারপরে আস্তে আস্তে তার সাথে নামাজ রোজা ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: দাওয়াত প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই বিজ্ঞানের যুগে অনেক মাধ্যম আছে যার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা যায়। তাদের মধ্যে একটি হলো সাধারণ আলোচনা এবং অপরটি হলো মিডিয়া এবং এগুলো হলো নিয়মিত ও অনিয়মিত।

নিয়মিত মিডিয়া গুলো হলো- ম্যাগাজিন, নিউজ লেটার, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রিমাসিক ইত্যাদি। এগুলোর পাশাপাশি আরো যে মিডিয়া আছে তা হলো- অডিও মাধ্যম। এগুলো হলো- অডিও ক্যাসেট, সিডি, অকম্যান এবং রেডিও। অপর আর একটি হলো ভিডিও মাধ্যম। সেগুলো হলো- ভিডিও ক্যাসেট সি.ডি, ডিভিডি এবং এদের চেয়ে উচ্চতর মাধ্যম হলো- স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং সর্বশেষ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। সুতরাং এই সবগুলো মাধ্যম দ্বারা দাওয়াতী কাজ করা যায়।

প্রশ্ন: দাওয়াত- এর এই মাধ্যমগুলোর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কী কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: প্রত্যেকটি মাধ্যমের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। যেমন- বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো বলছে যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু পড়ে তখন সে মাত্র ১০% মনে রাখতে পারে, যখন কোনো কিছু শোনে তখন সে ২০% মনে রাখতে পারে, যখন সে কোনো কিছু দেখে তখন সে ৩০% মনে রাখতে পারে। আর যখন সে একই সাথে শোনে এবং দেখে তখন সে ৫০% মনে রাখতে পারে। সুবিধা এবং অসুবিধার ক্ষেত্রে বলতে গেলে প্রিন্টমিডিয়া হলো বহনযোগ্য। এটা বাস, ট্রেন, গাড়ি ইত্যাদিতে বহন করা যায়। কিন্তু এক সাথে একজন ছাড়া একাধিক লোক ব্যবহার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, অডিও মাধ্যমের বহনযোগ্যতা প্রিন্টা মিডিয়ার থেকে কম কিন্তু একই সময়ে লাখ লাখ মানুষ অডিও মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনতে পারে।

তৃতীয়ত, ভিডিও মাধ্যম যেটি অডিও মাধ্যম থেকে কম বহনযোগ্য, তবে এটা টেলিভিশন এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে।

সর্বশেষ হলো ইন্টারনেট এবং এর মাধ্যমে যেকোনো ধরনের তথ্য জানা যায় এবং নিজে ওয়েবসাইট খুলে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা যায়। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কেউ ভুল এবং আপত্তিকর তথ্য সরবরাহ করতে পারে। সুতরাং এগুলো হলো দাওয়াতের বিভিন্ন মাধ্যম এবং সুবিধা এবং অসুবিধা।

প্রশ্ন: আপনার মতে দাওয়াতি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম কোনটি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেক মাধ্যমের কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। যদি আপনি আমাকে কোনো মিডিয়ার সার্বজনীনতা এবং প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলবো যে, এক্ষেত্রে স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যায় এবং এই মাধ্যমের খরচও অনেক কম। সুতরাং দাওয়াতি কাজের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো স্যাটেলাইট চ্যানেল।

রমযানের ২৭তম শিক্ষা

যাকাত

ইউসুফ চেম্বার: ডা. নায়েক। এই প্রাণবন্ত আলোচনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রশ্ন: রমজানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যাকাত। আজকে আমরা যাকাতের অর্থ এবং ইসলামে যাকাতের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: শাব্দিক অর্থে যাকাত শব্দটি এসেছে আরবি 'যাকাহ' থেকে। যার অর্থ পরিশোধন, পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা। এর আরেকটি অর্থ আশীর্বাদ, দয়া। ইসলামী শরীয়তে যাকাত অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা। যাকাত হলো এক ধরনের বাধ্যতামূলক দান। যদি কোন মুসলমানের কাছে পুরো এক বছর ধরে বিশেষ করে পুরো হিজরি বছর ধরে ঐ পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকে যেটি নিসাব পরিমাণে পৌঁছেছে তাহলে ঐ ব্যক্তি জন্য যাকাত ফরজ। ইসলামী শরীয়তে যাকাত বলতে উদ্ধৃত সম্পদকে বোঝায়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- তাওবা, আয়াত- ১০৩)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: তাদের সম্পদ হতে 'সদকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দু'আ করবে। তোমার দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ আরো বলেছেন, (সূরা- আর- রূম, আয়াত- ৩৯)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অর্থ: "মানুষের ধনসম্পদ দ্বারা তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।

যাকাত হলো ইসলামের একটি ভিত্তি। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ- বুখারী, অধ্যায়- ঈমান, খণ্ড- ১, হাদীস নং - ৮)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

অর্থাৎ, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত- ১. কালিমা, ২. নামাজ, ৩. যাকাত, ৪. হজ্ব ও ৫. রোযা।

সুতরাং যাকাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কিন্তু যাকাত কী? আর ইসলামে যাকাতের তাৎপর্যটাই বা কী? আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- আনফাল, আয়াত- ৩, ৪)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থ: "সে সমস্ত লোক যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো সত্যিকারের ঈমানদার আর তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।"

অর্থাৎ যাকাত হলো ঈমানের একটি চিহ্ন। ঈমানদার ব্যক্তিরা যাকাত প্রদান করে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ মুসলিম, খণ্ড- ৪, হাদীস নং- ৬২৬৪) "যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ হতে যাকাত দেয় তখন সেটি কমে না বরং আল্লাহ তাকে ক্ষমা এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর সে যদি এটি বিনয়ের সাথে প্রদান করে তাহলে আল্লাহ তার সামাজিক মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন।"** সুতরাং যাকাত দিলে মানুষের সম্পদ কমে যায় না বরং অনেক বেড়ে যায় এবং যাকাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। সারা পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহ একটি পরিবারের মত এবং একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের প্রতি যত্নবান হতে পারে তারা দরিদ্রদের নিকট যাকাত পৌঁছে দিতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে আমরা এক এবং সবাই একটি পরিবারের সদস্য। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ১, অধ্যায়- সালাত, হাদীস নং - ৪৮১)**

অর্থাৎ, একজন বিশ্বস্ত ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের প্রতি একই দেয়ালের ইটের ন্যায়। তারা একে অপরকে একই দেয়ালের ইটের ন্যায় সহযোগিতা করে এবং তাদের ভিতরকার সম্পর্ক ওই রকম মজবুত যেমন মজবুত আঙ্গুলের ভিতর আঙ্গুল।"

সুতরাং যাকাত মুসলমানদের ভিতরে একতা আনে, কারণ ঈমানদার হতে হলে যাকাত দিতে হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, **(সূরা- হাশর, আয়াত- ৭)**

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: "আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁরা রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

এখানে বলা হয়েছে- "তোমাদের ধনসম্পদগুলো যেন শুধু বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" সুতরাং ইসলামে যাকাত হলো একটি অর্থনৈতিক নির্দেশনা।

প্রশ্ন: একজন মুসলমানের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাত প্রত্যেকটি মুসলমানের ওপর ফরজ হোক সে নারী কিংবা পুরুষ, নাবালক কিংবা বৃদ্ধ, ধার্মিক কিংবা অধার্মিক। যার উদ্বৃত সম্পদ আছে যেটি নিসাব পর্যায়ে কিংবা তা ছাড়িয়ে গেছে এবং ওই গচ্ছিত সম্পদ যদি তার কাছে হিজরি সালের পুরো এক বছর থাকে তাহলে তার জন্য যাকাত প্রদান করা বাধ্যতামূলক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ সেটি গচ্ছিত সম্পদের আড়াই (২.৫) শতাংশ। তবে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে- ১. মুসলিম ব্যক্তি হতে হবে। ২. স্বাধীন নাগরিক হতে হবে। ৩. ব্যক্তিকে নিসাবের মালিক হতে হবে। ৪. হালাল উপার্জন হতে হবে।

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(তিরমিযী, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ৬১)**

অর্থাৎ, "যাকাত ওই উদ্বৃত সম্পদের জন্য পরিশোধযোগ্য যেটি কোনো ব্যক্তির কাছে পূর্ণ এক বছর ধরে রয়েছে এবং যাকাত দিতে হবে অবশ্যই হালাল উপার্জন থেকে।"

আরেকটি হাদীসে মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **(নাসাঈ, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ২৫২৫)** **"পবিত্রতা ছাড়া নামাজ যেমন গ্রহণযোগ্য নয় ঠিক তেমনি হালাল উপার্জন ছাড়া যাকাত গ্রহণযোগ্য নয়।"** সুতরাং যাকাত ফরজ হওয়ার আরেকটি শর্ত হলো উপার্জন বৈধ হতে হবে। যদি কোনো নাবালক কিংবা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নিসাবের মালিক হয়, তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক ওই ব্যক্তিদের সম্পদ হতে যাকাত দিয়ে দেবে।

প্রশ্ন: আপনি 'নিসাব' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন যাদের সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদেরকে যাকাত দিতে হবে। আপনি এই 'নিসাব' এবং 'নিসাব পর্যায়' ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: নিসাব আল্লাহ প্রদত্ত একটি শব্দ যেটি দ্বারা তিনি একটি 'নির্দিষ্ট পরিমাণ' নির্দেশ করেছেন। নিসাব বলতে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে কারোর উপর যাকাত ফরজ হয়ে যায় ওই সর্বনিম্ন পরিমাণকে নিসাব বলে। এবং আল্লাহ শুধুমাত্র ওই ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরজ করেছেন যে ব্যক্তির সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ গরীবদের জন্য যাকাত ফরজ নয়; এটি শুধুমাত্র ধনীদের উপর ফরজ। অন্যদিকে যাকাত হলো ওই সব দেশের গরীবদের জন্য রক্ষাকবচ, যে দেশগুলো সে দেশের দরিদ্র লোকদের উপরেও কর আরোপ করে। নিসাব মাপকাঠিটি এজন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেন কেউ নিসাবের নিচে অবস্থানকারী লোকের কাছ থেকে কোন ধরনের যাকাত বা কর আদায় না করে।

সুতরাং যারা নিসাবের মালিক হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে এবং তাদের দেওয়া যাকাতই গরীবদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে।

আবার যে ব্যক্তি তার উপর যাকাত ফরজ হয়েছে কি হয়নি এ ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে চায় তবে তার জন্য অবশ্যই তার কি পরিমাণ গচ্ছিত সম্পদ আছে সেটি জানতে হবে এবং ঠিক কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে পরে যাকাত ফরজ হবে সেটা জানার জন্যই নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নিসাবের মাধ্যমেই সে নিজের যাকাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। সম্পদ নিসাবে পরিণত হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত, এটি মৌলিক চাহিদার উপরে হতে হবে। অর্থাৎ খাওয়া, পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা, পড়ালেখা ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর কারোর কাছে যদি অতিরিক্ত সম্পদ গচ্ছিত বা জমা হয়ে যায় তবে সেটি নিসাব হিসাবে গণ্য হয়ে যায় এবং এর জন্য যাকাত ফরজ হয়ে যায়। এখন, মুসলমানদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো কি, সেটা নির্ভর করে ইসলামী শরীয়তের উপরে। কারণ আপনি যদি বর্তমানের আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন তাদের মৌলিক চাহিদা বলতে বিলাসিতা, বড় গাড়ি, বড় বিলাসবহুল বাড়ি, খাবারের আধিক্য, মদ ইত্যাদিকে বোঝায়। সুতরাং মৌলিক চাহিদাগুলো হতে হবে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর ব্যাপারে জাতিসংঘ কি বলল, আইএমএফ (**IMF**) কি বলল কিংবা আইবিএম (**IBM**) কম্পিউটার নির্মাতা কোম্পানির মালিক কি বলল সেটি দ্বারা মৌলিক চাহিদা নির্ধারিত হবে না। এটি নির্ধারিত হবে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী।

দ্বিতীয়ত, ওই গচ্ছিত সম্পদ ব্যক্তির সাথে পুরো এক বছর থাকতে হবে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (তিরমিযী, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ৬১) **"যাকাত ওই উদ্ধৃত সম্পদের জন্য প্রযোজ্য যেটি কোনো ব্যক্তির নিকটে পুরো এক বছর অবস্থান করে।"** তবে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- আনআম, অধ্যায়- ৬, আয়াত- ১৪১)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ: তিনিই লতা ও বৃক্ষ- উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তু ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন- এইগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন

উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে উহার হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

এখানে বলা হয়েছে- **“শস্যক্ষেত্র থেকে তোমরা ফল খাও এবং সেগুলো কর্তনের সময় হক দান কর এবং অপব্যয় করো না।”**

সুতরাং ফসলের ক্ষেত্রে সেগুলো কাটার সময়েই তার যাকাত দিয়ে দিতে হবে, এর জন্য এক বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, যাকাত দুই ধরনের-

প্রথমত, সে সব বস্তুর যাকাত যেসব বস্তু বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, যেমন- চাষাবাদ, এ ক্ষেত্রে ফসল কাচার সময়েই এর যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ওই ধরনের বস্তুর যাকাত, যেগুলোকে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। এগুলোর জন্য এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই এক বছরে যদি সেটি নিসাব পর্যায়ে পোঁছে তাহলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: যে সমাজে যাকাত প্রচলিত আছে সেই সমাজে যাকাত কিভাবে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের নীতির মত নয়। ইসলামি অর্থনীতি ওই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ এই পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রক্ষা করেন আবার তিনিই সবকিছু ধ্বংস করবেন। সকল ক্ষমতা, রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- আন- নূর, আয়াত- ৩৩)

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা দান করো।”

সুতরাং সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি কেবল এগুলোকে আমাদের জিম্মায় দিয়েছেন এবং সেখান থেকে অভাবী ব্যক্তিদেরকে দান করতে বলেছেন। কুরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে। (সূরা- হাদীদ, আয়াত- ৭)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন এবং ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"

সুতরাং আমরা মানব জাতিরা হলাম আল্লাহর কাছে জিম্মাদার। এই কারণে আমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ অনুযায়ী আয়- ব্যয় করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে সম্পদ কিভাবে আয় করতে হবে, বণ্টন এবং ব্যয় করতে হবে সে ব্যাপারে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। উপার্জন করার ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি নিষেধ রয়েছে। অর্থাৎ অবৈধভাবে উপার্জন করা যাবে না, উপার্জন বৈধ হতে হবে, আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৭৮, ২৭৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতি কেউ অত্যাচার করবে না।"

সুতরাং সুদের মাধ্যমে উপার্জন হারাম এবং সুদ খাওয়া অনেক বড় ধরনের অন্যায় এবং এটা হারাম। আল্লাহ আরো বলেছেন, "তোমরা ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন করতে পার না।"

তিনি বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৮)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।"

সুতরাং কাউকে ঘুষ দিয়ে যোগ্য ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে নিজে উপার্জনের সুবিধা গ্রহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। একইভাবে চুরি এবং ডাকাতির মাধ্যমে উপার্জনও হারাম। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন- (সূরা- মায়েদাহ, আয়াত- ৩৮)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে।"

অতএব চুরি ডাকাতি মহাশাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া মাদকব্যবসা, মিথ্যায় মাধ্যমে উপার্জন এবং জুয়া খেলে উপার্জন করা হারাম। আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরো নির্দেশনা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, (সূরা- নূর, আয়াত- ৩৩)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: যাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস- দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন- লালসায়

তাহাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করিও না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর যবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে বলা হয়েছে- "তোমরা নারীদেরকে যৌন বাণিজ্যে বাধ্য করো না, যে পবিত্র থাকতে চায়।"

সুতরাং দেহব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। আল্লাহ আরো বলেছেন, (সূরা- আন-নূর, আয়াত- ১৯)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক। তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"

সুতরাং কারোর কলংক প্রচার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এবং হারাম। আল্লাহ আরো বলেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ২)

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

অর্থ: "এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও, খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল বদল করো না। তাদের ধনসম্পদের সাথে নিজেদের ধনসম্পদের সংমিশ্রণ করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দকাজ।"

সুতরাং কুরআনে অনেক জিনিসের উল্লেখ আছে যার মাধ্যমে উপার্জন করা যাবে না। যেমন- ১. সুদ, ২. ঘুষ, ৩. ডাকাতি, চুরি, ৪. মাদকব্যবসা, ৫. জুয়াখেলা, ৬. মিথ্যা বলে উপার্জন করা, ৭. দেহ বাণিজ্য, ৮. কলংক প্রকাশের মাধ্যমে আয় এবং ৯. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

এগুলো থেকে উপার্জন না করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এগুলোই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হয়ে পড়েছে এবং যথাযথ এগুলো আমাদের চোখে পড়ে।

আল্লাহ আমাদেরকে উপার্জিত অর্থসম্পদ কিভাবে ব্যয় করতে হবে সেই পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৬১)

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: “যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শিষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।’

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে আমার পথে খরচ করলে আমি তাকে সাতশতগুণ মুনাফা দিয়ে দিই। ব্যবসায়ের পরিভাষায় যেটাকে বলা হয় সত্তর হাজার (৭০, ০০০) শতাংশ মুনাফা, সুতরাং অর্থব্যয় করার সবচেয়ে উত্তম পথ হলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৭১)

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ: “যদি তোমরা প্রকাশে দান খয়রাত করো তবে তা কতোই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে করো এবং অভাবগ্রস্থদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খুব খবর রাখেন।”

আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ২৭৭)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

আল্লাহ আরো বলেন, "দান করো তাকে যে চায় এবং তাকেও যে চায় না, তুমি যে ব্যক্তিকে জান, যে গরীব, যার প্রয়োজন কিন্তু চায় না তাকেও দান পৌঁছে দাও।
আল্লাহ কুরআনে আরও বলেন, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ৩৬)

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থ: "পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।"

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, (সূরা- তাওবা, অধ্যায়- ৯, আয়াত- ৩৪, ৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের অনেকেই লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে নিবৃত করছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সে দিন বলা হবে, এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এখানে জমা করে রাখার আস্বাদ গ্রহণ কর।"

সুতরাং এই কারণেই মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ আরো বলেন, (সূরা- হাশর, অধ্যায়- ৫৯, আয়াত- ৭)

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁ রসূলকে যা দিয়েছে তা আল্লাহর, রাসূলের তার আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে। যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়......।" অতএব ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন: আপনি যাকাতের শিক্ষা এবং বিচক্ষণতা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলবেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: আল্লাহ তায়ালা যে সব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন সেসবের পিছনে নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্ব এবং শিক্ষা রয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিচক্ষণতা সম্পর্কে বলেছেন এবং তার রাসূলও এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-

* যাকাত আমাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যাকাত আমাদের ঈমানকে পাকাপোক্ত করে দেয় এবং যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। সুতরাং যাকাত আমাদের ঈমান মজবুত করে।

* যাকাত আমাদের সম্পদকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে। যাকাত শব্দের অর্থ হলো-পবিত্রকরণ, পরিচ্ছন্নকরণ। সুতরাং যাকাত আমাদের সম্পদকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে।

* যাকাত আমাদের সম্পদকে বৃদ্ধি করে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যাকাত দিলে সম্পদ কমে না বরং বেড়ে যায়।

* যাকাত আল্লাহর রহমত বয়ে আনে।

* যাকাত মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে। এটি মানুষকে কৃপণতার হাত থেকে রক্ষা করে।

* যাকাত মানুষের আত্মিক শান্তি প্রদায়ক। যদি কেউ আশংকা করে যে তার সম্পদ হারিয়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তখন সে যদি যাকাত প্রদান করে তাহলে সে সম্পদের বোঝা কমার কারণে সে মানসিক শান্তি অনুভব করে।

* যাকাত মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়। মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ (ﷺ) কে তার প্রেরিত রাসূল বলে মানি, নামাজ প্রতিষ্ঠা করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসে রোযা রাখি এবং রোযার রাতে ইবাদত করি। আখেরাতে আমার জন্য কি ঘটবে? মহানবী (ﷺ) জবাব দিলেন, তুমি সিদ্দিকীন তথা আল্লাহভীরু লোকদের দলে থাকবে এবং শহীদদের সাথে থাকবে। সুতরাং যাকাত মানুষকে বেহেশতে যাবার পথ বাতলে দেয়।

* যাকাত সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর ভিতরে একতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- কাসাস, অধ্যায়- ২৮, আয়াত- ৭৭)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।” সুতরাং যাকাত মানুষের সম্পদের ব্যাপারে যত্নবান হতে উৎসাহিত করে।

* যাকাত গরীবদেরকে ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত রাখে। দরিদ্ররা যখন দেখে যে, ধনীদের গাড়ী, বাড়ী, বিলাসিতা করছে তখন তাদের ভিতরে বিদ্রোহ জেগে উঠতে পারে। কিন্তু ধনীরা যাকাত দিলে দরিদ্রদের বিদ্রোহের হাত থেকে বাঁচা যায়।

* যাকাত চুরি, ডাকাতি বন্ধ করে। যখন কোনো ব্যক্তি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন অনেক সময় সে চুরি করতে বাধ্য হয় কিংবা ডাকাতি করে এবং এদেরকে যদি যাকাত দেওয়া হয় তাহলে তারা চুরি, ডাকাতি থেকে বিরত থাকে, ফলে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা আসে।

* যাকাত আন্তরিকতা আনয়ন করে। কারণ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসা এবং ভক্তির সাথে যাকাত দেওয়া হয় তখন সেটি আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং প্রদত্ত ব্যক্তির প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। সুতরাং যাকাত মানুষের ভিতরে আন্তরিকতা সৃষ্টির মাধ্যম।

* যাকাত দুনিয়াকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

* মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ৪, হাদীস নং- ১৭৩৩৩; সহীহ বুখারী, খণ্ড- ১, হাদীস নং - ৬৬০)

অর্থাৎ, “কিয়ামতের দিন দানশীলতা ছায়াদেবে। কিয়ামতের দিন সাত (৭) শ্রেণীর লোক ছায়ার নিচে অবস্থান করতে পারবে এবং ওই সাত শ্রেণীর ভিতরে একটি শ্রেণী হবে তারা, যারা গোপনে দান খয়রাত করতো।”

সুতরাং যাকাত এবং দানশীলতা কিয়ামতের কঠিন বিপদের দিনে মাথার উপর ছায়া দেবে। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে- (তিরমিযী, অধ্যায়- ঈমান, হাদীস নং - ২৬১৬)

অর্থাৎ, “যাকাত মানুষের গুনাহগুলোকে ওইভাবে নির্বাপিত করে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।”

অতএব, এগুলোই হলো যাকাতের বিচক্ষণতা।

প্রশ্ন: মুসলমানের কোন কোন জিনিসের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যেসব জিনিসের জন্য মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. স্বর্ণ। কিন্তু, নিসাব পরিমাণে পৌঁছলে তখন এর উপর যাকাত ফরজ হবে অন্যথায় নয়। ২. রৌপ্য। ৩. সোনা এবং রোপা থেকে তৈরিকৃত গহনা এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর। ৪. কৃষি উৎপাদন। ৫. গৃহপালিত পশু। ৬. পণ্যদ্রব্য এবং ব্যবসার পণ্যের উপর। ৭. বাণিজ্যিক কার্যক্রম। ৮. অর্থ এবং মুদ্রার নোট ও ৯. মজুত বাণিজ্য।

প্রশ্ন: স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জন্য কি নিসাব একই পরিমাণে দিতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: স্বর্ণের নিসাব হলো ৮৫গ্রাম অথবা সাড়ে সাত তোলা (৭.৫) স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হবে। এখানে এক (১) তোলা বলতে ১১.৩৩ গ্রাম (প্রায়) সোনা বোঝায়। এটাই হলো স্বর্নের নিসাব এবং কারো কাছে যদি এক বছর অবস্থান করে তবে তার উপর যাকাত বাধ্যতামূলক এবং এটি করা হয়েছে নিম্নলিখিত হাদীসটির উপর ভিত্তি করে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে। (আবূ দাউদ, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৫৬৮) "স্বর্ণ যদি বিশ (২) দিনারের সমপর্যায়ে পৌঁছে তবে এর উপর যাকাত ফরজ।" অর্থাৎ বিশ দিনারের নিচে স্বর্ণ থাকলে তার জন্য যাকাত দিতে হবে না। এক (১) দিনার সমান এক (১) মিসকাল। এক (১) মিসকাল সমান ৪.২৫ গ্রাম।

সুতরাং, ২০*৪.২৫=৮৫গ্রাম সোনা, অতএব, স্বর্ণের জন্য নিসাব হলো ৮৫গ্রাম সোনা এবং এটি একবছরের জন্য থাকতে হবে।

যাকাতের শতকরা হিসাব আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, (সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ১৭৯১) "মুহাম্মদ (ﷺ) প্রতি ২০ দিনারের জন্য হাফ দিনার এবং প্রতি ৪০ দিনারের জন্য ১ দিনার যাকাত দিতেন।"

অর্থাৎ চৌদ্দভাগের একভাগ যেটি শতকরা ২.৫% সুতরাং কারোর কাছে যদি পুরো এক বছরের জন্য সর্বনিম্ন ৮৫গ্রাম কিংবা তারও বেশি 'স্বর্ণ' থাকে তবে তার উপর থেকে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিসাবের পরিমাণ হলো ৫৯৫গ্রাম অথবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য থাকা। এবং এটির জন্যও ২.৫% যাকাত প্রযোজ্য। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ১৪৪৭) "রৌপ্যের জন্য যাকাত হলো পাট (৫) 'ওয়াকিয়াহ' ১ ওয়াকিয়াহ সমান ৪০ দিরহাম। অতএব পাঁচ (৫) ওয়াকিয়াহ সমান ২০০ দিরহাম এবং ২০০ দিরহাম ৫৯৫গ্রাম রৌপ্যের সমমানের। সুতরাং রৌপ্য যদি নিসাব পর্যায় অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম অথবা ৫২.৫ তোলা'য় পৌঁছে তাহলে ওই রৌপ্যের উপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। সুতরাং স্বর্ণের নিসাব হলো ৮৫গ্রাম অথবা ৭.৫ তোলা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের নিসাব হলো ৫৯৫গ্রাম অথবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তির স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের গহনা থাকে এবং সে যদি এটি ব্যবহার করতে থাকে তবে এর জন্য যাকাত দেওয়া লাগবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ব্যবহার হতে থাকা স্বর্ণ, রৌপ্যের অলংকারের যাকাতের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। একদল পণ্ডিত বলেন, ব্যবহার হতে থাকা অলংকারের উপর

যাকাত দিতে হবে না এবং অন্য দল বলেন, যাকাত দিতে হবে। ইমাম মালিক, ঈমাম শাফেয়ী এবং ইমাম হাম্বলীদের মতানুসারে ব্যবহার করা অলংকারের জন্য যাকাত দিতে হবে না। উল্লেখিত ফকীহগণ নিম্নোক্ত হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করে উক্ত মতামত দিয়েছেন; বায়হাকি হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "হযরত আবু বকর (রা.)- এর মেয়ে আসমা বিনতে আবু বকর তার সন্তানদেরকে অলংকার পরাতেন যেগুলোর মূল্য ৫০ হাজার দিনারের চেয়েও বেশি ছিলো কিন্তু তিনি এর জন্য যাকাত দিতেন না।"

আরেকটি হাদীসে আছে, "হযরত আয়েশা (রা.) স্বর্ণালংকার ব্যবহার করতেন কিন্তু তার জন্য যাকাত দিতেন না।" সুতরাং এই হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে উক্ত ফকীহগণ ব্যবহৃত অলংকারের জন্য যাকাত দিতে হবে না বলে মত দিয়েছেন। আরেকদলের ফকীহ যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইবনে হাজার এদের মতানুসারে স্বর্ণ, রৌপ্যের অলংকারের উপর যাকাত দিতে হবে যদিও সেগুলো পুরাতন হয়ে যায়। তারা বিভিন্ন হাদীস এবং কুরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে এই মতামত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- তাওবা, অধ্যায়- ৯, আয়াত- ৩৪, ৩৫)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থ: "আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে এবং বলা হবে। এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন (সহীহ মুসলিম, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ২১৬১)

অর্থাৎ, "যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য ধারণ করে কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের জন্য আগুনের কড়াই তৈরি করা হবে এবং তা দ্বারা তাদেরকে পোজন হবে এবং তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশে ছ্যাকা দেওয়া হবে।"

কুরআনে বলা হয়েছে, (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়- ৩, আয়াত- ১৮০)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধনসম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।"

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (আবূ দাউদ, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং- ১৫৫৮) "কোনো একদিন একটি মহিলা তার মেয়েকে সাথে নিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত হল, ঐ মহিলার মেয়েটি স্বর্ণের ভারী অলংকারে সজ্জিত ছিলো, এটি দেকে মহানবী জিজ্ঞেস করলেন, এ গুলোর যাকাত দিয়ে থাকো? মহিলা বলল না। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, তুমি কি চাও যে, আল্লাহ তোমার হাত দুটি আগুনের বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করুক? তাৎক্ষণিকভাবে ঐ মহিলা অনুশোচনা করলো এবং হাতে পরিহিত স্বর্ণের বালাগুলো মুহাম্মদ (ﷺ) কে দিয়ে দিলো। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, এগুলো আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলের পথে দিয়ে দিলাম।"

আরোও একটি হাদীস আছে, (সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ১৫৬০) "একদিন হযরত আয়েশা (রা.) রৌপ্যের দুইটি চুড়ি পরেছিলেন। এবং মুহাম্মদ (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে তার হাতে এগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা এইগুলো কি পরেছো? আয়েশা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী আমার সবকিছু আপনার জন্যই। তারপর আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এগুলোর যাকাত দাও? তিনি বললেন, না। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, নিজেকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানোর জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" অতএব এইসব হাদীস এবং কুরআনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে এই দলের পণ্ডিতরা মতামত দিয়েছেন যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলংকার ব্যবহার করতে করতে পুরাতন হলেও তার জন্য যাকাত ফরজ। এই মতটি প্রথম মতের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালি যদিও প্রথম দলের মতামত ভিন্ন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতরা একটি ব্যাপারে একমত যে, যাকাত দেওয়াটাই উত্তম। যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আসমা বিনতে আবু বকর, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বলী, এদের মতে অলংকারের উপর যাকাত ফরজ নয়। আরেকটি দল যেখানে ওমর বিন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ইমাম আবু হানীফা, ইবনে মুনতের, ইবনে হাজার আসকালানী এদের মতে অলংকারের উপর যাকাত ফরজ। যদি স্বর্ণ কিংবা

রৌপ্য অলংকার নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে। এই মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং অধিক শক্তিশালী। যদিও এ ব্যাপারে ভিন্ন মতামত রয়েছে।

প্রশ্ন: গবাদিপশুর ক্ষেত্রে নিসাবের পরিমাণ কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যে সব গবাদিপশু নিজেরাই চরিয়ে বেড়িয়ে খাবার খায় এবং এগুলোর মালিককে এদের জন্য কোন খাবার সরবরাহ করতে হয় না সেক্ষেত্রে এই গবাদিপশুগুলোর জন্য যাকাত ফরজ। কিন্তু যদি গবাদিপশুগুলোর খাবারের ব্যবস্থা এর মালিকদেরকেই করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যাকাত ফরজ নয়। কিন্তু ওই গবাদিপশুগুলো বিক্রির টাকা যদি এর মালিকের কাছে এক বছর ধরে থাকে এবং এটি যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তবে ওই টাকার জন্য যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে গবাদিগুলোর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। উটের ক্ষেত্রে নিসাব হলো ৫টি উট, গরুর জন্য ৩০টি, ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি।

হাদীসে এসেছে, **(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৪৫৪)** প্রত্যেক ৫টি উটের জন্য একটি ভেড়া যাকাত দিতে হবে। উটের নিসাবের পরিমাণ ৫টি উট এবং একটি ভেড়া হলো এর যাকাত। ৪০টি ভেড়ার জন্য ১টি ভেড়া যাকাত কিন্তু ৪০টির নিচে হলে যাকাতের দরকার নেই। ভেড়া যদি ৪০ থেকে ১২০টির ভিতরে থাকে তবে এর যাকাত হলো ১টি ভেড়া, ১২০ থেকে ২০০টির ভিতরে ২টি, ২০০ থেকে ৩০০ টির ভিতরে ৩টি এইভাবে প্রতি ১০০টি বৃদ্ধির জন্য ১টি করে ভেড়া যাকাত দিতে হবে। মানুষ মনে করে যে সব জিনিসের জন্য যাকাত নির্দিষ্ট অর্থাৎ ২.৫% এবং অধিকাংশ এই রকম কিন্তু কারোর যদি ১১৯টি ভেড়া থাকে তাহলে তার জন্য যাকাত ১টি শতকরা ৮২% আসে এবং এটিই সর্বনিম্ন যাকাত। কিন্তু সর্বোচ্চ যাকাত হলো ওই কৃষি উৎপাদনের উপর যার জন্য কোন সেচ দিতে হয় না, এ ক্ষেত্রে যাকাত হলো ১০%। যদি সেচ দিতে হয় তবে তার জন্য যাকাত হলো ৫%। গবাদিপশুর জন্য যাকাত সর্বোচ্চ ১% এবং সর্বনিম্ন .৮০% এবং অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হলো ২.৫%।

প্রশ্ন: যদি কোনো দোকানীর দোকানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য থাকে তাহলে সবগুলোর জন্যই কি যাকাত প্রযোজ্য?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: দোকানের পণ্যসামগ্রী যেগুলো বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে শুধু তাই নয় বরং সম্পদ, জমি, প্রাণী, খাদ্যদ্রব্য, রকমারি ইত্যাদি যে সব জিনিস ব্যবসা করার জন্য কেনা হয়েছে বা লেনদেন করা হয়েছে এদের সবকিছুর উপরেই যাকাত প্রযোজ্য। সুতরাং দোকানে যত মালামাল আছে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে খাতায় নোট করে ফেলতে হবে। দোকানের যেসব পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের জন্য আনা হয়েছে সেগুলোর জন্য বছরে একবার নোট করতে হবে এবং এর উপর ২.৫% যাকাত দিতে হবে। বিপণী কেন্দ্রে আনয়নকৃত

পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনার পর যে মুনাফা (১বছর থাকলে সেটি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছলে) তার জন্য ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে দোকানের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, আসবাবপত্র এবং মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়ী যাকাতের আওতামুক্ত থাকবে। কিন্তু অন্য সব পণ্যসামগ্রীর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন: মূলধন এবং নোট মুদ্রার ক্ষেত্রে যাকাত হিসাব করতে হবে কীভাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কাগজের মুদ্রার যাকাতের হিসাবের জন্য মুদ্রাকে আমরা সোনা কিংবা রূপাতে বদল করে নিতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদেরকে মুদ্রার মান বের করতে হবে এবং সমমূল্যের সোনার সাথে বদল করে নিতে পারি। এ ছাড়া আরেকভাবে হিসাব বের করা যায়। যেমন, আমরা মুদ্রার নিসাব স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের নিসাবের সাথে তুলনা করে বের করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদেরকে ৮৫গ্রাম সোনা অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্য আমাদের দেশীয় বাজারে কত সেটি বের করতে হবে এবং ওই মূল্যটি হতে হবে কাগজের মুদ্রা অনুযায়ী যেটি দেশে প্রচলিত আছে। এখানে একটি দ্বিমত আছে সেটি হলো এক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাব নাকি রৌপ্যের নিসাব গ্রহণ করতে হবে এ ব্যাপারে। কিন্তু ফকীহ আছে যারা বলেছেন, যাকাতের জন্য সর্বনিম্ন নিসাব ধরতে হবে। আরেকদল বলেছেন, যাকাতের জন্য সর্বোচ্চ নিসাব ধার্য করতে হবে। এদের যুক্তি হলো সর্বোচ্চ নিসাব ধার্য করলে দরিদ্র্যরা বেশি উপকৃত হবে। কিন্তু এই মতটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বরং প্রথমটিই অধিক নিশ্চিত। অর্থাৎ মুদ্রার যাকাতের জন্য সর্বনিম্ন গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের চেয়ে কম। সুতরাং সর্বনিম্ন নিসাব হিসাবে ৫৯৫ গ্রাম রৌপৌর চলতি বাজার মূল্য বের করতে হবে।

ধরা যাক, কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট দিনে যাকাত দেওয়ার জন্য যাকাতের পরিমাণ হিসাব করবে, ধরি সেই দিনটি রমজানের প্রথম দিন অথবা অন্য কোন দিন। তাহলে তাকে ওই সময়ে ৫৯৫ গ্রাম রোপা অথবা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের বাজার মূল্য কত তা খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে ১ গ্রাম সোনার মূল্য প্রায় ১১০০ টাকা অর্থাৎ ২৩/২৪ মার্কিন ডলার। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেমন আমাদের দেশে এক রকম। আবার, দুবাই, লন্ডন ইত্যাদি জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের দেশে ১ গ্রাম স্বর্ণের দাম ১১০০ টাকা প্রায়। সুতরাং ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের দাম ৯৩৫০০ টাকা প্রায়। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ স্বর্ণের মুদ্রামান ৯৩৫০০ টাকা। আবার যদি রৌপ্যের নিসাবের মূল্য বের করতে চাই তাহলে বর্তমানে আমাদের দেশে ১ কেজি রৌপ্যের নিসাবের মূল্য বের করতে চাই তাহলে বর্তমানে আমাদের দেশে ১ কেজি রৌপ্যের মূল্য ২১০০০ টাকা প্রায়। সুতরাং ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য হবে ১২০০০ টাকা প্রায়। সুতরাং কারোর মূলধন যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে তাকে সর্বনিম্ন নিসাব হিসাবে রৌপ্যের নিসাব তথা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে যেটির নিসাব মূল্য সর্বনিম্ন সেইটির বাজার মূল্যের ২.৫%

মূল্যকে হিসাবে ধরে মূলধন কিংবা কাগজে মুদ্রার যাকাত দিতে হবে যদি সেগুলো নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে। এখানে রৌপ্যের মূল্যকে নিসাব ধরে তার মূলধনের ২.৫% হিসাবে।

প্রশ্ন: কাউকে ধার দেওয়া অর্থের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: স্বর্ণ, রৌপ্য, মূলধন কিংবা মুদ্রা যা কিছুই ধার দেওয়া হোক না কেন সেগুলোর জন্য এর মালিককে যাকাত দিতে হবে। যে ব্যক্তিকে ধার দেওয়া হয়েছে তাকে যাকাত দিতে হবে না, যাকাত দিতে ওই অর্থের প্রকৃত মালিক। এজন্য ধারদানকারীকে হিসাব রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি কাউকে এই বলে টাকা ধার দিলো যে, এই টাকার মাধ্যমে তোমার যে লাভ হবে তার অর্ধেক বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আমাকে দিতে হবে। তাহলে সেই টাকার জন্য এর মালিককে যাকাত দিতে হবে। দুই ধরনের ধার রয়েছে-

১. গোপন তথা নিরাপদ কর্জ। ২. প্রকাশ্য তথা অনিরাপদ কর্জ।

যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার কোনো নিকট আত্মীয় কিংবা বন্ধুকে বিনাসুদে অর্থ ধার দেয় তবে প্রতি বছর ধার দেওয়া অর্থের জন্য যাকাত দিতে হবে। ধারগ্রহীতা যদি ২, ৩ কিংবা তারও বেশি বছর অতিক্রম করে তবে ওই প্রতিটি বছরের জন্য এর মালিককে যাকাত দিতে হবে। যদি কাউকে একলাখ টাকা ধার দেওয়া হয় তাহলে প্রতিটি বছরের জন্য ওই টাকার মালিককে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ ১লাখ টাকায় আড়াই হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সব টাকা ধারে চলে যাওয়ার কারণে যদি তার কাছে আর কোনো টাকা না থাকে তবে ঋণগ্রহীতারা টাকা ফেরৎ দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং টাকা পাওয়ার পর যাকাত পরিশোধ করতে হবে। ধরা যাক তিন বছর পরে টাকা পাওয়া গেলো তাহলে যাকাত হবে, ৩*২.৫=৭.৫%।

আরেক ধরনের কর্জ আছে যেটাকে বলা হয় প্রকাশ্য কিংবা অনিরাপদ কর্জ। এই ধরনের ধারগ্রহীতা যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি হয় তাহলে সে ফেরৎ দিত পারবে কি পারবে না এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে এটা হবে অনিরাপদ ধার। এক্ষেত্রে কর্জদাতা যদি বুঝতে পারে যে কর্জ দেওয়া টাকা সে আর ফেরৎ পাবে না এবং সে যদি যাকাত না দিতে চায় তাহলে তার যাকাত দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি পাঁচ বছর পরে ওই টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে প্রত্যেক বছরের জন্য ওই টাকার ২.৫% হিসাবে যাকাত দিয়ে দিতে হবে। যেমন, ২.৫*৫ =১২.৫% অর্থাৎ একলাখ টাকা দিলে তার ১২.৫% যাকাত দিতে হবে (পাঁচ বছরের)

প্রশ্ন: মুসলমানদের আর এমন কোন বস্তু আছে যার জন্য যাকাত দিতে হবে না?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হ্যাঁ, কিছু নির্দিষ্ট জিনিস আছে যেগুলো যাকাত থেকে মুক্ত। যেমন-

ব্যক্তিগত দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ। যেমন: আমরা যে খাবার খাই, কাপড় যেটা পরি, ঘরের আসবাবপত্র, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, ওভেন ইত্যাদি জিনিসগুলো যাকাত থেকে মুক্ত। ঘর বাড়ী যাকাত থেকে মুক্ত। কারণ ঘর আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ঘর আমাদের জন্য অপরিহার্য। গাড়ী, যানবাহন, মটরসাইকেল, আরোহণের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়া ইত্যাদিও যাকাত থেকে মুক্ত। শাকসবজি, এবং এমন পশু যেটি তার মালিকের কৃষি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তার জন্য যাকাত দিতে হবে না। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "শাকসবজি, পাঁচ মসাকের নিচের ফসল এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত পশু যাকাত থেকে মুক্ত।" এই গুলো হলো মুসলমানদের অন্যান্য জিনিস যেগুলোর জন্য যাকাত প্রযোজ্য নয়। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি অতিরিক্ত কিংবা নিসাব পর্যায়ে পৌঁছলে তখন অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: যাকাত হিসাব করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বলবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাত হিসাব করা দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকের কাছে এক বছর ধরে থাকতে হয়; সুতরাং যেসব সম্পদগুলো নিসাব পর্যায়ে পৌঁছেছে সেগুলোর জন্য প্রতিদিন, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক রেকর্ড রাখা যেতে পারে। অতএব কোন সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছলে, ধরা যাক পহেলা জানুয়ারি কোন সম্পদ নিসাব হলো এবং ঐ দিনই সেটি লিখে রাখা হল। তারিখটি যদি ২০০৯ সালের হয় তাহলে ২০১০ সালের পহেলা জানুয়ারি ওই সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস হিসাব লিখে রাখাটা খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। নিরাপদ, নির্ভুল এবং সহজ পদ্ধতি হলো বছরের নির্দিষ্ট কোন একটি দিনকে যাকাতের হিসাব কিতাবের জন্য বেছে নেওয়া এবং ওই দিন থেকে ঠিক একবছর পরে যাকাত নির্ধারণ করা। অধিকাংশ মানুষ রমযান মাসকে যাকাতের জন্য বেছে নেয়; কারণ রমযান হলো দানশীলতা এবং অসীম রহমতের মাস। কিন্তু রমযান মাসকেই গ্রহণ করতে হবে এমনটি নয়। তবে অবশ্যই হিজরী বছর অনুযায়ী হতে হবে। অতএব, ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে জানুয়ারি ২০১০ পদ্ধতিটি ভুল।

আমাদের উচিৎ পহেলা শাবান কিংবা পহেলা জিলহাজ্ব বা পহেলা রমযান কিংবা অন্য কোন তারিখে হিসাব রাখা। তবে এক্ষেত্রে রমযান মাসের কোনো তারিখকে গ্রহণ করা উচিৎ। যদি কোনো ব্যক্তি ১৪২০ হিজরির পহেলা রমযানে তার কি পরিমাণ সম্পদ আছে সেটি হিসাব করে রাখে তবে তার উচিৎ হবে পরবর্তী, ১৪২১ হিজরিতে কি পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত আছে তা নির্ধারণ করা। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি এক বছর পরে হিসাব করে তাহলে তার জন্য যাকাত কম

দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না বরং বেশি দেওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কেন? যদি প্রতিদিন হিসাব করা হয় তাহলে সম্পদের পরিমাণ উঠানামা করে কিন্তু বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হিসাব গ্রহণ করলে সেখানে কোনো কাটা ছেঁড়া হয় না, ফলে ওই বছর যে পরিমাণ যাকাত দেওয়া হয় সেটা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ যাকাত।

ধরা যাক, রমযান মাসের এক তারিখে কোন ব্যক্তির কাছে একলাখ টাকা আছে এবং তখনও পর্যন্ত এটি হলো সর্বনিম্ন সঞ্চয় যেটি পুরো এক বছরের। সুতরাং ওই টাকার জন্য ২.৫% অর্থাৎ আড়াই হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে এবং এটি খুবই নিরাপদ। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, ওই টাকাটি বছরের সর্বোচ্চ সঞ্চয়। সুতরাং আমরা অনেক বেশি যাকাত প্রদান করছি। কিছু লোক আছে যারা বলে এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি পরিশোধ করতে হয় যেটির কোন প্রয়োজন নেই। আসলে এই পদ্ধতিতে কম দেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যে দিনটিকে হিসাবের জন্য বেছে নেওয়া সেদিনে যাবতীয় সম্পদের হিসাব করতে হবে, যেমন- নগদ অর্থ, ব্যাংক হিসাব, স্বর্ণের মজুদ, অলংকার, গুদামজাত মজুদ, শেয়ার, বিনিয়োগ, পাওনা ইত্যাদি সবকিছুর হিসাব করতে হবে। পাওনা টাকার জন্যও যাকাত দিতে হবে, কারণ ওই টাকার মালিক তার টাকার জন্য দায়বদ্ধ। একইভাবে যে ব্যক্তি দেনা তাকে ওই দেনা টাকা বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে। যেমন দেনার টাকা যদি ৫০, ০০০ টাকা হয় তাহলে হিসাব হবে মোট সম্পদ বিয়োগ দেনা। কিন্তু ধার নেওয়া টাকা দিয়ে যে মুনাফা হয়েছে তার জন্য যাকাত দিতে হবে। সুতরাং এটিই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি।

প্রশ্ন: দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কিছুলোক আছে যারা ধনবান কিন্তু কৃপণতার কারণে যাকাত দিতে চয় না কিংবা যাকাতের কথা ইচ্ছা করেই বেমালুম ভুলে যায়। এদের জন্য আপনার উপদেশ কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কুরআনের অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে যেখানে, যারা কৃপণ এবং যাকাত দিতে চায় না তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং যাকাত দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- ফজর, আয়াত- ২০)

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

অর্থ: "এবং যে সমস্ত লোক তাদের সম্পদকে অধিক ভালোবাসে।"

এখানে কৃপণদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছে, (সূরা- আদিয়াত, আয়াত- ৮)

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

অর্থ: "সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভালোবাসায় মত্ত।"

এই সব লোকেরা সম্পদকে খুব ভালোবাসে এবং সম্পদের জন্য এরা জীবনও দিতে পারে। আল্লাহ এদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, (সূরা- তাগাবুন, আয়াত- ১৫)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৩৬) প্রত্যেক উম্মতই কোনো না কোনো জিনিস দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে এবং সম্পদ আমার উম্মতের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।" এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, (সূরা- কালাম, আয়াত- ১৭- ৩৩)

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ......
......كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থ: "আমি উদ্যান ওয়ালাদের পরীক্ষা করেছি। যখন তারা শপথ করেছিলো যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশা- আল্লাহ না বলে, অতঃপর পালনকর্তার পক্ষ হতে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো, তখন তারা নিদ্রিত ছিলো এবং বাগান ছিন্নভিন্ন তৃণসম হয়ে গেল, সকালে একে অপরকে ডেকে বলল তোমরা যদি ফসল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ক্ষেতে চলো। অতঃপর তারা ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে হেঁটে চলল যেন ফকীর মিসকিনরা জানতে না পারে। তারা জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে রওনা দিল তারপর তারা যখন বাগান দেখলো তখন বলল হায়! আমরা তো পথ ভুলে গেছি, আমরাতো কপালপোড়া। তখন তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি বলল এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? তারা বলল আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমরা সীমালঙ্ঘণকারী ছিলাম। অতঃপর তারা পরস্পরকে র্ভৎসনা করতে লাগলো। বলতে লাগলো, হায় আমরা দুর্ভাগা। সম্ভবত পালনকর্তা এর চাইতে উত্তম বাগান দিনেব। শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরো গুরুত্বর।"

এই ঘটনাটিতে আল্লাহ যেটা বর্ণনা করেছেন তাহলো- কোনো এক সময় এক ব্যক্তির একটি বাগান ছিলো যেখান থেকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করতো। তা থেকে সে নিজের চাহিদা মেটাতো এবং বাকিটা ফকীর মিসকিনদেরকে দান করে দিতো, এই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সন্তানেরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা কোনো মিসকিনকে অংশ দেবে না, তারা তাদের পিতাকে মহাবোকা বলে র্ভৎসনা করতে লাগলো। অতঃপর তারা যখন ভোর বেলার অতি সন্তর্পণে বাগানের দিকে গেল তখন দেখলো যে, তাদের বাগান তৃণসম হয়ে গেছে। এটি আসলে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং যারা তাদের সম্পদকে অধিক ভালোবাসে এবং কৃপণতা করে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিয়ে দেন, তাছাড়া পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে। প্রকৃতপক্ষে উপরের ঘটনায় উল্লিখিত লোকের মতই কৃপণ ব্যক্তিরা যাকাদ দেয় না। যাকাত আসলে পবিত্রতা, যাকাত দিলে সম্পদের অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, **"দানশীলতা সম্পদ কমিয়ে দেয় না বরং বৃদ্ধি করে।"**

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- লাইল, আয়াত- ৮- ১১)

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ - وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

অর্থ: "আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনোই কাজে আসবে না। কৃপণরা মনে করে যে সম্পদই তাদের জন্য যথেষ্ট, আসলে সম্পদই তাদের ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লাহ বলেন, (সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৯২)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থ: "কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো।"

সুতরাং যাকাত মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে এর প্রতি ভালোবাসা কমায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে।

প্রশ্ন: কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: কোন কোন লোকেরা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে সেটা আল্লাহ সূরা- তাওবা'র ভিতরে বলে দিয়েছেন, (সূরা- তাওবা, অধ্যায়- ৯, আয়াত- ৬০)

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সুতরাং যাকাত গ্রহণ করতে পারবে-

১. ফকীর, যে দরিদ্র।
২. মিসকীন, যে দরিদ্রেরও দরিদ্র।
৩. যাকাত সরবরাহ কাজে জড়িত ব্যক্তি।
৪. কাউকে ইসলামের প্রতি চিত্ত আকষর্ণের জন্য।
৫. দাসকে মুক্ত করার জন্য।
৬. ঋণীব্যক্তি, যে তা শোধ করতে পারছে না।
৭. আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য। আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয়।
৮. মুসাফির।

এই আট শ্রেণীর লোকেরা যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন: কিছু লোক দাবি করে যে, সম্পদের উপর জীবনে মাত্র একবার যাকাত দিতে হবে, বিশেষ করে স্বর্ণের ব্যাপারে তারা এমনটি বলে থাকে। এই ব্যাপারে ভিন্ন মতামত আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাত সারা জীবনে একবার কিংবা প্রতি বছর দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন দলিল প্রমাণ খুঁজতে পারি। আজ তেকে চৌদ্দশত বছর আগের সাহাবা কিরাম, কিংবা তারপরের কোনো মুহাদ্দিস, পণ্ডিতব্যক্তিরা কেউ কখনো বলেন নি যে, যাকাত সারা জীবনে মাত্র একবার পরিশোধ করতে হবে। যদি আপনি কুরআন, হাদীস পড়ের এবং পণ্ডিতদের

মতামত দেখেন তাহলে কোথাও একবার যাকাত দেওয়ার বিষয়টি খুঁজে পাবেন না। সুতরাং এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। ভিন্নমতের এই ব্যাপারটি বিগত কয়েক বছর ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে মাত্র। হাদীসে এ ব্যাপারে প্রচুর দলিল প্রমাণ রয়েছে যে, যাকাত প্রতি বছর প্রদান করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোথাও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমি জানি না, সাম্প্রতিক সময়ে এ ব্যাপারে কিভাবে ভিন্নমত তৈরি হয়ে গেলো। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, **(সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৫৬৮)**

অর্থাৎ, "যদি কারোর কাছে ২০০টি দিরহাম থাকে এবং সেগুলো যদি তার সাথে পূর্ণ এক বছর জমা থাকে তবে তাকে সেখান থেকে ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে।"

শতকরা আড়াই দিরহাম, যেটি চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ, এবং কারোর কাছে ২০ দিনারের নিচে স্বর্ণ থাকলে তার যাকাত দিতে হবে না।

সুতরাং এখানে বলা হয়েছে যে, গচ্ছিত সম্পদ যদি এক বছর ধরে কারোর কাছে থাকে তবে যাকাত ফরজ কিন্তু একথা বলা হয় নি যে জীবনে মাত্র একবার দিতে হবে। হাদীস অনুযায়ী, ঐ সম্পদ যদি দুই বছরের জন্য থাকে তবে দুই বছরের যাকাত দিতে হবে। বর্তমানে যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে, তাদের উচিৎ কুরআন এবং হাদীসের দলিল দ্বারা তাদের দাবি প্রমাণ করে দেখানো। আরেকটি হাদীসে এসেছে, **(সুনান আবূ দাউদ, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৫৭৭)** "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার যার ভিতরে এই তিনটি চিহ্ন রয়েছে-

১. আল্লাহর ইবাদত করে এবং ২. ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। ৩. প্রতি বছর সে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে।

অতএব এখানে প্রতি বছরে যাকাত দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। এরকম আরো অনেক হাদীস আছে যেগুলো জীবনে একবার যাকাত দেওয়ার দাবি ভুল প্রমাণিত করে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, **(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৪০২)**

"কিয়ামতের দিন গবাদিপশু, উট ইত্যাদি প্রাণীগুলো পৃথিবীতে যে রকম স্বাস্থ্যবান ছিলো ওই রকম স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের মালিকের কাছে হাজির হবে। এদের মধ্যে যে সব লোক তাদের গবাদিপশুর জন্য যাকাত দিতো না তাদের পশুগুলো তখন তার পায়ে গুতো মারতে থাকবে।" অর্থাৎ হাদীসটি প্রাণীর উপর যাকাত দেওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করে।

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৯, ১৪০০)

অর্থাৎ, “আরবে কিছুলোক ছিলো যারা যাকাত দিতে চাইতো না এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, সুতরাং আবু বকর (রা.) ঘোষণা করলেন, আমি ওইসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করে না আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি না।

আবু বকর (রা.) বললেন, যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং যদি কেউ নামাজ এবং যাকাত এই দুইটি ফরজ ইবাদতের ভিতরে প্রভেদ সৃষ্টি করে তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)- এর যুগে যাকাত দিয়েছে কিন্তু এখন দিতে অস্বীকার করছে সে আসলে মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সাথেই যুদ্ধ করছে এবং আমিও ওই লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।” সুতরাং হাদীস থেকে এটাই জানা যায় যে, কিছু লোক যদিও বিগত বছরগুলোতে যাকাত দিতো কিন্তু পরবর্তীতে যাকাত দিতে অস্বীকার করলো এবং এই কারণে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ আবু বকর (রা.)- এর হৃদয় বিদারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং তিনি যা বলেন সেটা সঠিক। অতএব হাদীসটি এটাই নির্দেশ করে যে যাকাত অবশ্যই প্রতি বছর দিতে হবে। এছাড়া যাকাত কীভাবে আদায় করতে হবে সে ব্যাপারেও অনেক হাদীস রয়েছে। একটি হাদীসে আছে, (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং ১৪৫৪)

আবু বকর (রা.) এর ঘোষণায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এক ব্যক্তি তার কাছে আসলো এবং কিভাবে যাকাত আদায় করবে তা জানতে চাইলো। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন- যদি কারোর পাঁচটি উট থাকে তবে তাকে ১টি ভেড়া যাকাত দিতে হবে এবং এভাবে উটের পরিমাণ আরো বেশি হলে সেভাবেই হিসাব করতে হবে। কারোর ৪০টি ভেড়া দেবে এবং ৪০ থেকে ১২০ এর ভিতরে হলেও ১টি, ১২০ থেকে ২০০ এর ভিতরে হলে ২টি, ২০০ থেকে ৩০০টির জন্য ৩টি, বাবে প্রতিটি ১০০টি বৃদ্ধির জন্য ১টি করে ভেড়া যাকাত দিতে হবে।” যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করতে চায় তাকে অবশ্যই অন্যান্য সম্পদের সাথে গবাদিপশুর হিসাবও করতে হবে এবং সেগুলো যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তার কাছে পুরো এক বছর থাকে তাহলে তাকে প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে, যত বছর তার কাছে নিসাব পরিমাণ থাকবে। কিন্তু সারা জীবনে মাত্র একবার যাকাত দেওয়ার ধারণাটি একেবারেই নতুন। কয়েক বছর আগে এ

ব্যাপারে শোনা যেতো না। সুতরাং প্রতিবছর যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। বিভিন্ন আয়াত, হাদীস, এবং ফকীহরা এ ব্যাপারে একমত।

প্রশ্ন: যাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হয় তাকে কি এটা জানানোর প্রয়োজন আছে যে, তোমাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাতের অর্থ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকে এটা জানানো জরুরি নয়। যদি যাকাতদাতার জানা থাকে যে, যাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হচ্ছে সে কুরআনে বর্ণিত ৮ শ্রেণীর লোকেদের অর্ন্তভুক্ত যারা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে, তাহলে তাদেরকে যাকাতের কথা জানানোর দরকার নেই। কিন্তু যাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হবে তার ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ থেকে থাকে যে, আসলে সে কুরআনে বর্ণিত ৮ শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত কিনা, তাহলে সে যাচাই- বাছাই করতে পারে কিন্তু সাধারণদের ক্ষেত্রে তাকে যে যাকাতের অর্থ দেওয়া হচ্ছে সেটা জানানোর কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

প্রশ্ন: জমির যাকাত দিতে হবে কীভাবে? জমিটি বিক্রয় করার পরে অনেকগুলো বছরের যাকাত একবারে দিয়ে দিতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি কোনো জমি বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কেনা হয় অর্থাৎ ব্যবসা করার জন্য কেনা হয় তাহলে প্রতি বছরে ওই জমির চলতি মূল্যের উপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। যদি জমিটি তার কাছে পুরো একবছর থাকে তাহলে যাকাত দিতে হবে। তবে যাকাত দিতে হবে চলতি মূল্যের উপর কেনা মূল্যের উপরে নয়। জমির দাম উঠানামা করে সে কারণে এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময় ঐ জমির মূল্য যত হবে তার উপর ২.৫% যাকাত দিতে হবে, ধরা যাক, কারো কাছে ৭ বছর যাবৎ জমি রয়েছে তাহলে তাকে তার অন্য সম্পদের অর্থ দিয়ে ওই ৭ বছরের প্রত্যেক বছরেই যাকাত দিতে হবে। কিন্তু তার যদি ওই জমি ছাড়া অন্য আর কোনো সম্পদ না থাকে যা দিয়ে সে ওই জমির যাকাত পরিশোধ করবে তাহলে সে দেরী করতে পারে। যখন তার জমি বিক্রয় হবে তখন তাকে যাকাত পরিশোধ করতে হবে, যদি সে পাঁচ বছর যাবৎ ওই জমির যাকাত না দিতে পারে তবে বিক্রির পর, ২.৫*৫=১২.৫% মূল্য যাকাত দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরের মূল্য লিখে রাখতে হবে। যেমন, প্রথম বছরের মূল্য ক. পরের বছরের মূল্য খ. ইত্যাদি হতে পারে এবং সেগুলো হিসাব করে সেখান থেকে প্রতি বছরের জন্য ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: কিছু লোক আছে যারা রিয়েল এস্টেট (জমির ব্যবসা) ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কারণ তারা ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে চায় না। তারা দাবি করে যে, এই জমির জন্য যে ভাড়া পাওয়া যায় তার উপর যাকাত দিতে হবে, জমির মূল্যের উপরে নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, যে জমি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে সেই জমি এর মালিকের কাছে এক বছর পূর্ণ হলেও তার জন্য যাকাত দিতে হবে এবং সকল ইসলামী পণ্ডিতগণ, এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু যদি কারোর জমি থাকে এবং যে এটি ভাড়া দেয় কিংবা বাড়ী কিনে সেটি ভাড়া দেয় তাহলে ওই জমি কিংবা বাড়ীর মূল্যের উপর যাকাত প্রযোজ্য নয়। যাকাত প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র ভাড়া দিয়ে প্রাপ্ত টাকার উপর, যে মুহূর্তে সে ভাড়ার টাকাটি পাচ্ছে সেখান থেকে পরবর্তী একবছর যদি তার কাছে সেগুলো থাকে এবং যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে তাকে অবশ্যই ওই টাকার জন্য যাকাত দিতে হবে কিন্তু বাড়ীর জমির মূল্যের জন্য নয়। কিন্তু বর্তমানে অনেক লোক আছে যারা বিনিয়োগ করার জন্য জমিক্রয় করে এবং সেটিকে আবার ভাড়া দেয়।

সুতরাং এখানে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়; কারণ অনেকেই বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জমি কেনে কিন্তু তারা সেটিকে খালি ফেলে রাখতে চায় না কারণ তারা মনে করে যে, ৪/৫ বছর পরে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং সে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং এই কয়েক বছরের জন্য সে কাউকে জমিটি ভাড়া দিয়ে দেয়। তাহলে এক্ষেত্রে কি ঘটবে? সেটি যাকাত দেবে নাকি দেবে না? এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। একদল পণ্ডিত বলেন, ঠিক আছে, শুধুমাত্র ভাড়া হতে প্রাপ্ত টাকা যেটি এক বছর পরে নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তার জন্য যাকাত দিতে হবে এবং যখন জমি বিক্রি হবে তারপরে জমির মোট মূল্যের উপর ২.৫% যাকাত দিতে হবে। কিন্তু আরেকদল পণ্ডিত আছেন যারা এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তারা বলেন, যদি কেউ বাড়ী বা জমি কেনে এবং সেটি ভাড়া দিয়ে দেয় তবুও ওই জমি বা বাড়ীর চলতি বাজার মূল্যের উপর প্রত্যেক হিজরী বছরে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

এই দলে ইবনে ওয়াকিল, ইবনে আরাবী, ইমাম হাম্বলী, শেখ আবু জহরা (হানাফী), আব্দুর রহমান আল হাসান, শেখ আব্দুল ওয়াহাব খালাফ প্রমুখ। বর্তমান যুগের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পণ্ডি কারযাবী এবং অন্যান্যরা বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির জমি কিংবা অনেকগুলো বাড়ী থাকে যেগুলো সে ভাড়া দিয়েছে তবে তাকে ওই জমি কিংবা বাড়ীর মূল্যের জন্য যাকাত দিতে হবে। কিন্তু ধরা যাক কোনো গরীব লোক যার কোন আয় নেই তার বসবাস করার জন্য একটি বাড়ী আছে এবং তার আরেকটি বাড়ী আছে যেটি ভাড়া দেওয়া। এক্ষেত্রে সকলে একটি ব্যাপারে একমত তা হলো, ওই ব্যক্তি ভাড়া হিসাবে যে টাকা পায় তা যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তবে সে যাকাত দিবে। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা জমিদার কিংবা তাদের অসংখ্য বাড়ী, ফ্ল্যাট রয়েছে যেগুলো ভাড়া দেওয়া, এখন এই লোকেরা যদি প্রথম দলেন পণ্ডিতদের মতে একমত হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, যাকাত শুধু বাড়ী ভাড়ার টাকার উপর দিতে হবে। তাহলে কি ঘটবে? ধরা যাক এক ব্যক্তির ১০০টি ফ্ল্যাট আছে, যার মূল্য ১০০ লাখ ডলার এবং এখান থেকে সে যে ভাড়া পায় তা দ্বারা সে তার আগেই বাকি টাকা গুলো দিয়ে সে আরো

কিছু ফ্ল্যাট কেনে। এখন তার কাছে যদি ভাড়ার টাকা না থাকে তাহলে সে কি কোনো যাকাত দেবে না? সে প্রতিমাসে ভাড়ার টাকা পায় আর তা দিয়ে কিছুদিন পরে পরে ফ্ল্যাট কিনতে থাকে এবং দিনে দিনে সে মাল্টিমিলিয়নার হতে থাকে। কিন্তু ভাড়া হতে পাওয়া টাকা তার কাছে পূর্ণ এক বছর থাকে না তাই বলে মোটের উপর সে কোন যাকাত দেবে না? এই কারণে আমি এই দলের পণ্ডিতদের মতের সাথে একমত।

এই দলের পণ্ডিত আরাবী, ওয়াকিল.... এরা বলেন যে, যদি অনেক পরিমাণে জমি এবং অনেক বাড়ী ভাড়া দেওয়া থাকে তাহলে ওই সমস্ত জমি এবং বাড়ীর মূল্যের উপর ভিত্তি করে যাকাত দিতে হবে। বাড়ী এবং জমির চলতি মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রতি হিজরী বৎসরে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: অনেক লোক আছে যারা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বাড়ী বানায়। যে বাড়ীতে বসবাস করা হয় তার কোনো যাকাত দিতে হয় না। যদি কোন ব্যক্তি ছোট আকারের বাড়ী বানায় তাহলে সেখান থেকে যে টাকাগুলো বেঁচে যায় তার জন্য কি যাকাত প্রযোজ্য হবে? কিন্তু সে যদি বড় আকারের বাড়ী বানায় তাহলে? ওই বাড়ী কি যাকাত মুক্ত থাকবে, দয়া করে মতামত দিন।

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঘরের জন্য যাকাত দিতে হয় না। কারণ এটি আমাদেরকে আশ্রয় দান করে, নিরাপত্তা দেয়, ঝড়, বৃষ্টি, খরা, ধূলা ইত্যাদি থেকে বাঁচায়। কিন্তু আপনার প্রশ্নে বড় আকারের বাড়ীর কথা বলা হয়েছে। একজন ব্যক্তির একজন স্ত্রী, তিন চারটি সন্তান থাকতে পারে এবং তাদের জন্য ৩টি, ৪টি সর্বোচ্চ ৫টি রুম লাগতে পারে। কিন্তু কারোর যদি ১০/১২ রুমের বাড়ী থাকে যেটি সাধারণ ৫টি বাড়ীর সমান, তাহলে কি হবে? যাকাত দিতে হবে না? এ ব্যাপারে অধিকাংশ পণ্ডিত বলেন, যে ঘরে বসবাস করা হয় তার জন্য যাকাত প্রযোজ্য নয় কিন্তু এটি 'অপব্যয়' শ্রেণীর ভিতরে পড়ে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- বনী ইসরাইল, অধ্যায়- ১৭, আয়াত- ২৬)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

অর্থ: "আত্মীয়স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।" এবং আরো বলা হয়েছে। (সূরা- ফুরকান, আয়াত- ৬৭)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

অর্থ: এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না। কৃপনতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।”

অতএব, অপব্যয় করা ইসলামে হারাম। সুতরাং এই ধরনের বড়, বিলাসবহুল বাড়ী তৈরি করা নিষিদ্ধ, অনেকেই এটিকে হারাম কিংবা মাকরূহ বলে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ পণ্ডিতরা বলেন বাড়ীর উপর যাকাত প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আরেকটি দল (ইবনে ওয়াকিল, আরাকি.....) বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির এরকম বিশার বাড়ী থাকে তাহলে এটি তার মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। কারোর যদি সাধারণ ৫টি বাড়ী থাকে তাহলে সে একটিতে নিজে বসবাস করে এবং বাকি চারটির জন্য যাকাত দেয়। অতএব যে ব্যক্তির একটি বাড়ীই ৫টি সাধারণ বাড়ীর সমান, তার জন্য যাকাত ফরজ এবং আমি এই দলের পণ্ডিতদের সাথে একমত।

প্রশ্ন: কিছু মুসলিম আছেন যারা অনেক ধনী এবং তাদের একাধিক কোম্পানি ফ্যাক্টরি ইত্যাদি রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে কি তাদের সকল সম্পদের উপর যাকাত দিতে হতে নাকি শুধু উৎপাদিত পণ্যের উপর?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ব্যবসার জন্য যে সব পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা করা হয় তার জন্য যাকাত দিতে হয় কিন্তু ব্যবসায় ব্যবহৃত স্থান, মালপত্র বহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়ী ইত্যাদি যাকাত মুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি অনেক ধনী এবং যার একাধিক কোম্পানি, ফ্যাক্টরি রয়েছে যার মূল্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। তাহলে সে কি শুধু দ্রব্যের উপর যাকাত দেবে নাকি সকল সম্পদের উপর দেবে? এ ব্যাপারে একদল পণ্ডিত বলেন- এ ধরনের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় লব্দ মুনাফার উপর যাকাত দেবে যদি সেটি তাদের সাথে এক বছর থাকে এবং যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু সাধারণভাবে যেটি দেখা যায় তাহলো এই ধরনের লোকেরা যাদের একাধিক মিল, ফ্যাক্টরি আছে তারা মাসে মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা করে এবং কয়েক মাস পরেই তারা আবার আরেকটি ফ্যাক্টরি খোলে। সুতরাং এই লোকেরা শুধু পণ্যের উপরেই যাকাত দেবে? কিন্তু মোট দ্রব্যের মূল্য ফ্যাক্টরি তৈরির মূল্যের চেয়ে অনেক কম। যেখানে ফ্যাক্টরি খোলার খরচই ১০০ মিলিয়ন ডলার! অতএব আমি এই দলের পণ্ডিতদের সাথে একমত যারা বলেন, যেসব লোক একাধিক মিল ফ্যাক্টরি মালিক তাদেরকে অবশ্যই জমিসহ সকল সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ৪, অধ্যায়- ধৈর্য, হাদীস নং ৩১৮৫) **“আমি আমার উম্মতের গর্ব, অহংকারের ব্যাপারে চিন্তিত নই কিন্তু আমি তাদের বিলাসিতার ব্যাপারে চিন্তিত কারণ পূর্বে অনেক জাতি ছিলো যারা তাদের বিলাসিতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।”** আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- তাওবাহ, অধ্যায়- ৯, আয়াত- ৩৪, ৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার- বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন- সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মদুন্ত শাস্তির সংবাদ দাও। 'যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে আর বলা হবে, এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

সুতরাং আমি বলব যে, বিলাসবহুল, বড় বাড়ী এবং ভাড়া ছাড়া জমির জন্য যাকাত দিতে হবে। সাধারণত যে ব্যক্তি আসলেই অনেক ধনী তার উচিৎ সকল সম্পদের জন্য যাকাত দেওয়া তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে।

প্রশ্ন: একজন মহিলার অলংকার ছাড়া যদি আর কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে সে কি ওই অলংকারের অংশবিশেষ বিক্রি করে যাকাত পরিশোধ করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি তার স্বর্ণালংকার থাকে এবং তা যদি নিসাব পর্যায় অর্থাৎ ৮৫গ্রাম হয় কিংবা বেশি হয় তাহলে যাকাত ফরজ হবে। যদি রৌপ্যের অলংকার হয় এবং সেটি যদি ৫৯৫গ্রাম হয় তবে তার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যাবে। অন্য কোনো সম্পদ থাকলে তা দ্বারা যাকাত দেওয়া যাবে নতুবা ওই অলংকারের অংশ দ্বারা যাকাত দিতে হবে। যদি তার অন্যকোন সম্পদ থাকে তাহলে অলংকারের মোট মূল্যের ২.৫% যকাত দিতে হবে প্রতি বছর। কিন্তু যদি তার কোন আত্মীয়স্বজন, পিতা- মাতা, ভাইবোন না থাকে যে তার পক্ষে যাকাত পরিশোধ করে দেবে, তাহলে তাকে তার অলংকারের ২.৫% বিক্রি করতে হবে এবং যাকাত পরিশোধ করতে হবে। এটি প্রতি বছরের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন: যদি প্রতি বছরে ওই অলংকারের যাকাত পরিশোধ করতে হয় তাহলে ৪০ বছর পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কি হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক লোক মনে করে যে, তারা যদি ২.৫% হারে যাকাত দিতে থাকে তাহলে ৪০ বছর পরে (৪০*২.৫=১০০) আর কিছুই থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, একবছর পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তার উপর যাকাত দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির ১০০ গ্রাম স্বর্ণ আছে তাহলে সে প্রথম বছরে এর জন্য ২.৫% যাকাত দিবে এবং দ্বিতীয় বছর যাকাত দিবে বাকি ৯৭.৫ গ্রাম স্বর্ণের উপর, ১০০ গ্রাম স্বর্ণের উপর নয়। সুতরাং ৯৭.৫ গ্রাম স্বর্ণের ২.৫% কিন্তু ২.৫গ্রাম ২.৫গ্রাম হবে না। এর জন্য আরো ২০ বছর প্রলম্বিত হয়ে যাবে কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ কখনোই শূন্য হবে না। কিন্তু পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং কিছু অবশিষ্ট থাকবে। ওই লোক ২.৫% হারে যাকাত দিতে থাকলে কয়েক বছর পরে এটি ধরা যাক, কমতে কমতে ১৫ বছরের মাথায় স্বর্ণের পরিমাণ নিসাব পর্যায় অর্থাৎ ১০০ গ্রাম থেকে কমে ৮৫গ্রামে দাঁড়াবে। যে মুহূর্তে এটি ঠিক ৮৫ গ্রামের নিচে দাঁড়াবে তখন ওই স্বর্ণের জন্য আর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং অলংকারের পরিমাণ কখনোই শূন্য হবে না।

প্রশ্ন: ডায়মন্ড বা হীরা কি যাকাত থেকে মুক্ত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হীরা এবং অন্যান্য পাথর যেমন মুক্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সকল পণ্ডিতগণ একমত যে এগুলোর জন্য যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যদি এগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কেনাবেচা হয় তাহলে এগুলোর মজুদের উপর প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে। এগুলো অলংকার হিসাবে ব্যবহার করলে যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি হীরা আর স্বর্ণ একসাথে মিশিয়ে অলংকার তৈরি করা হয় এবং তখন যদি স্বর্ণের পরিমাণ নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে যাকাত দিতে হবে কিন্তু শুধু হীরকের জন্য যাকাত দিতে হবে না। তবে বর্তমানে অনেকেই বিনিয়োগ করার জন্য হীরা কিনে থাকে। কারণ দিনে দিনে এর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং হীরক যদি ব্যবসা করার নিয়তে কেনা হয় তাহলে এক শ্রেণীর ফকীহরা বলছেন যে, ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কেনা হীরক থেকে প্রাপ্ত মুনাফার উপর যাকাত দিতে হবে, যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু যদি বিনিয়োগ ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখা হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে না।

প্রশ্ন: বাণিজ্যিক দ্রব্যসামগ্রীর যাকাত দিতে হবে কীভাবে? দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নাকি ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ব্যাপারে পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, শেখ সালেহ'র মত অনুযায়ী, যদি কোন পাইকারী বিক্রেতা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্য কেনে তবে সে পাইকারী বিক্রয়ের মূল্যের উপর যাকাত দেবে একইভাবে খুচরা বিক্রেতাও তার বিক্রিত

মূল্যের উপর যাকাত দেবে অর্থাৎ বিক্রয়মূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। কিন্তু আরেকদল পণ্ডিত বলেন যে, যাকাত নির্ধারিত হবে প্রান্তিক মুনাফা এবং ক্রয়মূল্যের মধ্যে যেটি সুবিধাজনক তার উপর ভিত্তি করে এবং মুনাফা কেমন হবে সেটি নির্ভর করে ব্যক্তি কোন ধরনের দ্রব্য কেনাবেচা করে। কেউ যদি বইয়ের ব্যবসা করে তাহলে তার ২৫%, ৪০% এমন কি ৬০% মুনাফাও আসতে পারে।

ধরা যাক কোন ব্যক্তির অনেকগুলো বইয়ের দোকান আছে এবং সে এক লাখ টাকার বই কিনলো এবং সেগুলো আড়াই লাখেরও বেশি দামে বিক্রয় করলো অর্থাৎ তার দেড়শ গুণেরও বেশি মুনাফা লাভ করলো। এখন এই ব্যক্তি মুনাফা তথা বিক্রয় মূল্যের উপর যাকাত দিতে চাইলে তার জন্য সেটি বোঝা হয়ে যায়, কারণ মোটা অংকের যাকাত আসবে। এখানে দেখতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে তার আসল মূলধন কত। তার মূলধন হলো ১ লাখ টাকা, অতএব তার জন্য ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত দেওয়া উত্তম হবে। আমি এই মতের সাথে একমত।

প্রশ্ন: কোম্পানির মালিকানায় ভাড়া দেওয়া গাড়ী বা যানবাহনের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে যে নিয়ম সেটিই গাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অধিকাংশ পণ্ডিতরা বলেন, ভাড়া দেওয়া গাড়ীর জন্য যাকাত প্রযোজ্য হবে না। ট্যাক্সিড্রাইভার যে গাড়ীভাড়া নেয় সে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র এবং সে খুবই সীমিত টাকা আয় করে। তাই সে যদি গাড়ীর মুল্যের জন্য যাকাত দিতে চায় তাহলে সেটি তাদের জন্য অনেক বোঝা হয়ে যায়। তাই গাড়ীর জন্য যাকাত না দেওয়াটা ঠিক আছে। কিন্তু অন্যদিকে যে ব্যক্তি অনেক গাড়ীর মালিক যেগুলো ভাড়া দেওয়া রয়েছে সেগুলো অবশ্যই তার সম্পদ। তাই আমি মনে করি, ওই সব গাড়ির জন্য প্রতিবছর হ্রাসকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন: অনেক মুসলমান আছেন যারা পূর্বে যাকাত দিতেন না কিন্তু পরে তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং যাকাত দিতে চায়। কিন্তু তারা পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত হিসাব করবে কীভাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি ওই ব্যক্তি তার সম্পদের হিসাব রেখে থাকে তবে ভালো কিন্তু যদি এরকম কোনো হিসাব না থাকে তাহলে বিগত ৫/১০ বছরের সম্পদের উপর যুক্তিযুক্ত একটি পরিমাণ ধরে নিতে হবে এবং তার উপর প্রতি বছরের জন্য ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে এবং ভুল- ভ্রান্তি, অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

প্রশ্ন: কেউ যদি ভুল করে তার যাকাত এমন কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে ফেলে যে যাকাত প্রাপ্তির যোগ্য নয়, তাহলে কি তার যাকাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: "ভুল করে কোন কিছু করলে এবং পরবর্তীতে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি মাফ করে দেন। হাদীসে বলা হয়েছে, (সহীহ বুখারী, খণ্ড- ২, অধ্যায়- যাকাত, হাদীস নং - ১৪২১)

অর্থাৎ, কোনো একদিন এক ব্যক্তি হাতিয়ার দান করার উদ্দেশ্যে বের হলো এবং ভুলবশত সে একজন চোরের হাতে দিল, পরের দিন লোকে বলা শুরু করলো যে, সে একজন চোরকে হাতিয়ার দান করেছে। তখন ওই লোকটি বলল, ঠিক আছে আমি আবার দান করবো, পরের দিন সে আবার বের হলো এবং সে ব্যভিচারীকে দান করল তবে সে যে ব্যভিচারী তা দানকারীর জানা ছিলো না, লোকেরা আবার ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এবার সে আবারও দান করার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু সে ভুলবশত একজন ধনী ব্যক্তিকে দান করল, অতএব লোকেরা যথারীতি হৈচৈ করতে লাগলো। সর্বশেষ সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।"

সুতরাং নিয়ত যদি সৎ থাকে তবে ভুল হলেও আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্ন: সদকা এবং যাকাতের ভিতর পার্থক্য কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাত শব্দের অর্থ, পবিত্রকরণ, বৃদ্ধি করা। সংজ্ঞানুযায়ী, যদি কোনো মুসলমানের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পরে তার কাছে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকে এবং তা যদি এক বছর তার নিকট অবস্থান করে তবে তাকে যাকাত বলে। সদকা শব্দটির মৌলিক শব্দ হলো 'সিদক' যার অর্থ- আন্তরিকতা। সুতরাং সদকা হলো আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি গভীর আন্তরিকতা, ইসলামী শরীয়তে যাকাত বলতে বাধ্যতামূলক দানকে বুঝায় এবং সদকা বলতে ঐচ্ছিক দান বোঝায়, যাকাত এবং সদকা উভয়ই আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। যাকাত এবং সদকার ভিতরে প্রধান পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ-

* যাকাত, দিতে হয় নির্দিষ্ট কতগুলো বস্তুর জন্য কিন্তু সদকা এ রকম কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য দিতে হয় না।

* যাকাতের জন্য এর মালিককে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু সদকা যেকোনো সময়ই দেওয়া যায়।

* গচ্ছিত সম্পদ যদি নিসাব পর্যায়ে পৌঁছে তাহলে যাকাত দিতে হয় কিন্তু সদকার জন্য এমন কোনো সীমানা নেই।

* যাকাতের অর্থ ৮ শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু সদকার অর্থ এই ৮ শ্রেণী ছাড়া অন্যেরাও গ্রহণ করতে পারে।

* যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয় সে যদি যাকাত দেওয়ার আগেই মারা যায় তবে তার সন্তানদের জন্য সেই যাকাত পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু কেউ সদকা দিতে চেয়ে তার আগেই মারা গেলে সেটি পরিশোধের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

* যাকাত পরিশোধ না করলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন কিন্তু সদকা না দিলে তার জন্য কোন শাস্তি দেবেন না।

* যার উপর নির্ভর করা হয় তাকে যাকাত দেওয়া যায় না। যেমন: বাবা এবং সন্তান উভয় উভয়কে যাকাতের অর্থ দিতে পারে না। কিন্তু সদকার জন্য এরকম কোন বিধিনিষেধ নেই।

* যাকাতের অর্থ ধনী ব্যক্তিকে দেওয়া যায় না। কিন্তু সদকার অর্থ দেওয়া যায়।

* অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যায় না। কিন্তু সদকা অমুসলিমকে দেওয়া যায়।

* যাকাত হলো এমন দান যেটি এর মালিক দিতে বাধ্য। কিন্তু সদকা হলো ইচ্ছামূলক দান। কেউ দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে।

রমযানের ২৮তম শিক্ষা

যাকাতুল ফিতর

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর শব্দের অর্থ কী এবং ইসলামি শরীয়তে যাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে কি ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যাকাত শব্দের অর্থ হলো- পরিষ্কার করা, পবিত্র করা এবং ফিতর শব্দের অর্থ রোযা ভেঙে ফেলা। সুতরাং যাকাতুল ফিতরের অর্থ হলো পবিত্রকরণ, দানশীলতা যেটি রোযা ভেঙে ফেলার জন্যে দেওয়া হয়। এবং এই খাদ্যের পরিমাণ

বিশেষভাবে নির্ধারিত এবং এটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক। সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, (বুখারী, যাকাত, ১৫০৩) **"মহানবী (ﷺ) প্রত্যেক মুসলমানকে ফিতরের যাকাত হিসাবে এক 'শাআ' পরিমাণ খেজুর অথবা বার্লি দিতে নিদের্শ দিয়েছেন।"** সুতরাং এটি প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

অপর একটি হাদীসে আছে, (আবু দাউদ, যাকাত, ১৬১৮) **"মুহাম্মদ (ﷺ) প্রত্যেক মুসলমানের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।"** তবে এখানে অল্প কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন যারা বলেন এই যাকাত পূর্বে ফরজ ছিলো এখন আর ফরজ নেই। তারা এই মতামত প্রদান করে নিম্নের হাদীসের উপর ভিত্তি করে। (সুনানে নাসাঈ, যাকাত, ২৫০৯) **"কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের উপর যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে ফিতরের যাকার ফরজ করেছিলেন এবং যাকাত ফরজ হওয়ার পরে তিনি যাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে কোন আদেশ বা নিষেধ করেন নি কিন্তু আমরা যাকাতুল ফিতর অনুশীলন করি।"**

সুতরাং তারা বলে যে, যাকাতুল ফিতর আগে ফরজ ছিলো পরে সেটি আর ফরজ থাকে নি ইত্যাদি।

কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এই হাদীসে কিন্তু এটা বলা হয়নি যে, যাকাতুল ফিতর ফরজ নয় এবং ফরজ রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ কিন্তু বর্ণনাকারী সাহাবি দেন নি। যখন এটি ফরজ নির্দেশিত হয় এবং পরবর্তীতে যদি আরেকটি ফরজ আসে এবং যদি প্রথম ফরজটির বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া যায় তাহলে উভয়ই চলতে থাকবে এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। সুতরাং যাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো এটি মুসলমানদের উপর ফরজ।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কি শুধু তাদের উপর ফরজ যারা যাকাত দেয়, না কি সকলের জন্যে ফরজ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: অনেক মুসলমান আছেন যারা সে রকম ধারণা করে যে রকম আপনি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু যাকাতুল ফিতর সকল মুসলিমের উপর ফরজ তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে খুব দরিদ্র। **মহানবী (ﷺ)** (বুখারী, যাকাত ১৫০৩) **প্রত্যেক মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর হিসেবে এক 'শাআ' খেজুর অথবা বার্লি দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন।"** কিন্তু যে এখনো তার মায়ের গর্ভে অবস্থান করছে তার উপর যাকাতুল ফিতর বাধ্যতামূলক নয় যদিও এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) এমন ব্যক্তির জন্যে

যাকাতুল ফিতর আদায় করেছিলেন যে তখনো তার মায়ের গর্ভে অবস্থান করছিলো। তবে এটা ঐচ্ছিক ব্যাপার। কিন্তু যে জন্মগ্রহণ বা পৃথিবীতে বেঁচে আছে তার উপর ফরজ। হাদীসে মহানবী (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, যাকাতুল ফিতর, ৭৬৮৩) **"তোমাদের অধীনস্থ বা তত্ত্বধানে যারা আছে তাদের জন্যেও যাকাতুল ফিতর আদায় করো, হোক সে তরুণ অথবা বৃদ্ধ, দাস অথবা মুক্ত।"** সুতরাং সন্তান স্ত্রী এমনকি নিজের পিতা যদি সে ছেলের তত্ত্বাবধানে থাকে তবে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। এটা ফরজ তবে যে অতি দরিদ্র তার উপর নয়।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা আল বাকারা- ২৮৬)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তা- ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে......।"

এবং আরো বলেন, (তাগাবুন- ১৬)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا

অর্থ: "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, শোনো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো।"

সুতরাং যে অপারগ তার জন্যে যাকাতুল ফিতর আদায় করার দরকার নেই। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (বুখারী, ৭২৮৮) **"যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু করতে নির্দেশ দিই তখন তোমরা সেই পরিমাণ করো যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়।"** অন্যত্র তিনি বলেছেন, (মুসলিম, যাকাতুল ফিতর, ২১৪৭) **"দাসের জন্যে যাকাতুল ফিতর ব্যতীত অন্য কোনো সদকা নেই।"**

একদল চিন্তাবিদ আছেন যারা বলেন, দাস- দাসী যদি অমুসলিমও হয় তবুও তাদের জন্যে যাকাত দিতে হবে; কিন্তু আরেকদল বলেন যে, এটা সঠিক নয়, কারণ সহীহ হাদীসে এই ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, (আবু দাউদ, যাকাত, ১৬০৫)

"মহানবী (ﷺ) বলেছেন, রমযান মাসে রোযাদারদের দ্বারা কৃত বিভিন্ন বাজে কাজ হতে পবিত্রতা লাভের জন্যে যাকাতুল ফিতর আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামুলক।"

সুতরাং এই হাদীস থেকে এটা জানা গেলো যে, প্রথমে তাকে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে এবং রোযা রাখতে হবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো যাকাতুল ফিতর দিতে হবে ওই দাসের জন্যে যে মুসলিম এবং রোযা রাখে।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর প্রদানের পেছনে বিশেষ বিচক্ষণতাগুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মহানবী (ﷺ) বলেছেন, **"রমযান মাসে কৃত বিভিন্ন বাজে কাজ হবে রোযাকে পবিত্রকরণের জন্যে ফিতরের যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ এবং যাকাত হিসাবে দরিদ্র মুসলিমকে খাওয়াতে হবে। যদি কেউ ঈদুল ফিতরের আগে দেয় তবে সেটি যাকাত আর পরে দিলে সেটি সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৬০৫)**

সুতরাং এ হাদীস থেকেই আমরা যাকাতুল ফিতরের মাহাত্ম্য বুঝতে পারি। যাকাতুল ফিতরের মাহাত্ম্যগুলো নিম্নরূপ:

* ফিতরের যাকাত হিসেবে কোন দরিদ্র মুসলিমকে ঈদের দিন সকালেই খাওয়াতে হয়।

* যাকাতুল ফিতর দেওয়া হয় রমযান মাসে ভুল- ভ্রান্তিতে কৃত বিভিন্ন বাজে কাজ হবে পবিত্র হওয়ার জন্যে।

* এটার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

* যাকাতুল ফিতর রমযান মাসে কৃত সগিরা গোনাহ হতে মুক্ত হওয়ার জন্যে পবিত্রকারী হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর হিসাবে ঠিক কি জিনিস দিতে হবে? এক্ষেত্রে কী টাকা দেওয়া গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই যাকাত খাদ্য হিসাবে দেওয়া উচিত। সেটা হতে পারে খেজুর, বার্লি, গম, চাউল ইত্যাদি। তবে এটা দেশে দেশে ভিন্ন হতে পারে এবং এটা শস্য জাতীয় হলে অধিক উত্তম। **মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা যাকাতুল ফিতর হিসাবে এক 'শাআ' পরিমাণ খেজুর অথবা বার্লি দাও।" (বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫০৩)**

অন্যত্র বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর সময় তিনি যাকাতুল ফিতর হিসেবে এক শাআ পরিমাণ খাবার দিতেন এবং সেগুলো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।(বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫১০)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "রমযানের সদকা (যাকাতুল ফিতর) হলো এক শাআ পরিমাণ। যদি কেউ আটা, খেজুর, বার্লি, যব ইত্যাদি দেয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে।" (ইবনে খুজাইমা, ২৪১৭)

সুতরাং সবগুলোই অনুমোদিত তবে এটা উত্তম হবে যদি সেটি হয় খাদ্য শস্য জাতীয় কোনো কিছু। দ্বিতীয় প্রশ্নটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, টাকা দেওয়া যাবে না। কারণ হাদীসে বল হয়েছে যে, ফিতরের যাকাত ঈদের নামাজের আগেই দিয়ে দিতে হবে যাতে করে তারা খেতে পারে। সেহেতু সেটা অবশ্যই খাদ্য হতে হবে। তবে ওই সমস্ত দায়িত্ববান ব্যক্তি কিংবা সংগঠনকে টাকা দেওয়া যেতে পারে। যারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আপনার টাকা নিয়ে যথাসময়ে দরিদ্র লোকদেরকে খাদ্য কিনে খাওয়াবে। কিন্তু সরাসরি টাকা দেওয়ার কোনো প্রমাণ বা বিধান এই ক্ষেত্রে নেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ দ্বীনের ভিতরে নতুন কোন কিছু আনয়ন করে তবে তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।" (বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭)

আরেকটি হাদীসে আছে, "যদি কেউ দ্বীনের ভেতরে নতুন কোন কিছু আনয়ন করে তবে তা অবশ্যই পরিত্যক্ত হবে।" (মুসলিম, অধ্যায় আকীদাহ, হাদীস নং ৪২৬৭)

সুতরাং টাকা দেওয়া কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না বরং খাবার দিতে হবে।

প্রশ্ন: সুন্নাহ অনুযায়ী ঠিক কী পরিমাণ বস্তু যাকাতুল ফিতর হিসেবে দিতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: হাদীস অনুযায়ী এই পরিমাণটা হলো- এক "শাআ"। হাদীসে এসেছে, "ইবনে আব্বাস বলেছেন রমযানের যাকাতের পরিমাণ হলো এক শাআ পরিমাণ।" (ইবনে খুজাইমা, ২৪১৭)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সময়ে যাকাতুল ফিতর হিসেবে এক শাআ পরিমাণ খাবার দেওয়া হত।" (বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫১০)

অন্যত্র বলা হয়েছে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) যাকাতুল ফিতর হিসেবে এক শাআ পরিমাণ খেজুর, বার্লি ইত্যাদি দিতে বলেছেন।"** (বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫০৩)

সুতরাং খেজুর, বার্লি ইত্যাদির পরিমাণ হলো এক শাআ কিন্তু গম বা আটার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"এক শাআ আটা কিংবা গম দাও দুইজন ব্যক্তির জন্যে এবং এক শাআ পরিমাণ খেজুর কিংবা বার্লি দাও একজন ব্যক্তির জন্যে।"** (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৭৭৫)

সুতরাং সাধারণ নিয়ম হলো একজনের জন্যে এক শাআ কিন্তু গম আটার ক্ষেত্রে এক শাআ হলো দুইজন ব্যক্তির জন্যে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"ওজন হতে হবে মক্কায় প্রচলিত ওজনের সমান এবং মাপ হতে হবে মদীনায় প্রচলিত মাপের সমান।"** (আবু দাউদ, অধ্যায় বয়ান, হাদীস নং ৩৩৩৪)

সুতরাং মুহাম্মদ (ﷺ) এক শাআর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদীনার মাপ অনুযায়ী এক শাআ হলো চার হাত ভর্তি এবং ইসলামি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এটা প্রায় তিন (৩) কেজি।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদেরকে দেওয়া উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: লোকজনের ভিতরে এ রকম ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, তারা মনে করে যে, যাকাতুল ফিতর তাদেরকে প্রদান করতে হবে যাদেরকে যাকাতের মাল প্রদান করা যায় বা যারা যাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ আট শ্রেণীর লোক যারা যাকাত নিতে পারে। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। বরং যাকাতুল ফিতর দিতে হবে এমন ব্যক্তিকে যে একেবারেই দরিদ্র, মিসকিন এবং যার কোন খাদ্যের সংস্থান নেই।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর প্রদানের সঠিক সময় কখন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় শুরু হয়। যাকাতুল ফিতর প্রদানের সর্বোত্তম সময় হলো ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে। তবে এটা ঈদের নিকটবর্তী কোনো দিনে দেওয়া যাবে কিন্তু সময়ের ব্যাপারটি হাদীসে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (আবু দাউদ, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৬০৫) **"যদি কেউ ঈদের আগে দান করে তবে সেটি যাকাতুল ফিতর হিসেবে গণ্য হবে এবং ঈদের পরে দিলে সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।"** এটি দিতে হবে লোকজন ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই।

আরেকটি হাদীসে আছে যে, **“ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার পূর্বে দরিদ্রদেরকে যাকাতুল ফিতর প্রদান করো।”** **(মুসলিম, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ২১৫৯)**

সুতরাং ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়তে যাওয়ার পূর্বের সময়টি যাকাত প্রদানের সর্বোত্তম সময়। কিন্তু অন্য হাদীস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, **এই যাকাত ঈদের দুই দিন আগে দেওয়া যেতে পারে। বলা হয়েছে, “লোকজন ঈদের এক কিংবা দুইদিন আগে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতো।”** **(বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫১১)**

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে, “একজন লোক জিজ্ঞাসা করলো যে, সে কখন যাকাতুল ফিতর প্রদান করবে। উত্তর দেওয়া হলো- কর সংগ্রহকারীর কর সংগ্রহ করা শেষ হলে। লোকটি জিজ্ঞেস করলো কর আদায় করা শেষ হবে কখন? উত্তর দেওয়া হলো- ঈদের এক বা দুই দিন আগে।” **(ইবনে খুজাইমা, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ২৪২১)**

সুতরাং যাকাত প্রদানের সঠিক সময় হলো ঈদের নামাজের পূর্বে কিংবা ঈদের দুই এক দিন আগে।

প্রশ্ন: যাকাত এবং যাকাতুল ফিতরের ভেতর কী পার্থক্য রয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এদের ভিতরে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

* যাকাত অর্থ পবিত্রকরণ, বৃদ্ধি করা আর যাকাতুল ফিতর অর্থ পবিত্রকরণ দানশীলতা যা রোযা শেষ করার কারণে দিতে হয়।

* যাকাত দেওয়া হয় কারোর সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌছলে তা পবিত্র করার জন্যে কিন্তু যাকাতুল ফিতর প্রদান করা হয় রোযাদ্বারের রোযা পবিত্র করার জন্যে।

* যাকাত ওই সব ব্যক্তির ফরজ যাদের সম্পদ নিসাব পর্যায়ে পৌছেছে কিন্তু যাকাতুল ফিতর সকল মুসলমানের উপর ফরজ। (মিসকিন ব্যতীত)

* যাকাতের মাল গ্রহণকারীরা ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত এবং এই শ্রেণীগুলো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। তারা হলো- **(সূরা তওবা, আয়াত ৬০)**

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. যাকাত আদায়কারী, ৪. চিত্ত আকর্ষণ দরকার এমন ব্যক্তি, ৫. দাসকে মুক্তির জন্য, ৬. ঋণ গ্রস্তদের জন্য, ৭. আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে ও ৮. মুসাফির এদের জন্য। কিন্তু যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে দরিদ্র মুসলমানদেরকে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাতুল ফিতর অতি দরিদ্র মুসলিমকে দিতে হবে।

* যাকাত বছরের যেকোনো দিন দেওয়া যায় কিন্তু যাকাতুল ফিতর দিতে হবে ঈদের দিন সকালে কিংবা ২/১ দিন আগে।

* যাকাতুল ফিতর দিতে হয় খাদ্য হিসাবে কিন্তু যাকাত হিসেবে যেকোনো মাল দেওয়া যায়।

প্রশ্ন: কোনো এক ব্যক্তি ঈদের এক সপ্তাহ আগে যাকাত দিয়েছে, এটা কি বৈধ? এখন কি করা উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সকল ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত যে, যাকাতুল ফিতর দিতে হবে ঈদের নামাজের আগেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈদের বেশ কিছু দিন পূর্বেই যাকাত প্রদান করে তার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম মালিক এবং হাম্বল বলেছেন, যাকাতুল ফিতর প্রদানের প্রারম্ভিক সময়টি হতে পারে ঈদের দুই কিংবা একদিন আগে। তারা এই মতামত দিয়েছেন নিম্ন বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, **"এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলা হলো যে, যাকাত সংগ্রাহকের সংগ্রহ কার্য শেষ হলে তুমি যাকাত প্রদান করো। তারপর সে জিজ্ঞাসা করলো সংগ্রাহকের সংগ্রহ কখন শেষ হবে? উত্তর দেয়া হলো ঈদের ২/১ দিন আগে।"** (বুখারী, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৫১১) এবং (ইবনে খুজাইমা, ২৪২১)

আরেকটি হাদীসে আছে যে, **ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদের দুই বা তিন দিন আগে যাকাত সংগ্রহকের নিকট যাকাত পাঠিয়ে দিতেন।"** (মুয়াত্তা, হাদীস নং ৬৩০)

সুতরাং কেউ যদি যাকাত সংগ্রহকের নিকট দিতে চায় তবে তা ঈদের এক, দুই কিংবা তিন দিন আগে দেওয়া যাবে। ইমাম আবূ হানিফা এবং শাফী'র মতে, যাকাতুল ফিতর রমযান মাসের যে কোনো দিন দেওয়া যাবে। কিন্তু অল্প কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন যারা বলেন, বছরের যে কোনো

দিন যাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে। কিন্তু এই মতামত ঠিক নয়। সঠিক নিয়ম হলো যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিতে চায় তাহল ঈদের নামাজের আগেই দিতে হবে এবং যদি সংগ্রহকের নিকট দেওয়া হয় বে ঈদের এক, দুই কিংবা তিন দিন আগে দেওয়া যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ঈদের এক সপ্তাহ আগে যাকাত দেয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে পুনরায় যাকাত দিতে হবে। যদি সে যাকাত সংগ্রাহকের কাছে দেয় তবে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর শুধু যে শহরে বাস করা হয় সেখানেই দিতে হবে, না কি অন্য কোনো শহরে দেওয়া যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যেখানে বসবাস করা হয় সেখানেই যাকাত দেওয়া উচিত। যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে তবে সে সেখানে যাকাত দেবে। এমনকি যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে কোনো স্থানে গেল এবং যদি সেখানে সে ঈদের মুখোমুখি হয় তবে সে সেখানেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করবে।

প্রশ্ন: কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের জন্যে কি এর মালিককে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে, না কি তারা নিজেরাই যাকাত আদায় করবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, যারা তোমার তত্ত্বাবধানে আছে তাদের জন্যে যাকাতুল ফিতর আদায় করো।" (বায়হাকি, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ৭৬৮৩)

কিন্তু যারা কর্মচারী, চাকুরিজীবী তারা তাদের মালিকের তত্ত্বাবধানের অধীন নয় বরং তারা তাদের কাজের বিনিময়ে পরিশোধিত হয়। সুতরাং তাদের জন্যে যাকাত দেওয়ার দরকার নেই। তারা নিজেরাই তাদের যাকাত দেবে কিংবা যারা তাদের অভিভাবক বা দায়িত্বশীল আছে তারাই দেবে।

প্রশ্ন: যদি কেউ যাকাতুল ফিতর আদায় করতে ভুলে যায় এবং ঈদের পরে যদি মনে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে কী করা উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সহীহ হাদীস সমূহে বলা হয়েছে যে, যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে ঈদের নামাজের পূর্বে। তবে যদি কেউ ভুলে যায় তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তৎক্ষণাৎভাবে যতদ্রুত সম্ভব তা দিয়ে দিতে হবে।

রমযানের ২৯তম শিক্ষা

ঈদের চাঁদ দেখা

প্রশ্ন: ইসলামি মাস কীভাবে শুরু হয় ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলামি মাস শুরু হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (সূরা বাকারা, আয়াত- ১৮৯)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থ: "তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম।"

মুহাম্মদ (ﷺ) একাধিক সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে বলেছেন, যেমন- (সহীহ বুখারী, রোযা, ১৯০৯) "আবূ হুরায়রা বলেছেন, যখন তোমরা রমযানের নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ এবং যখন শাওয়ালের চাঁদ দেখ তখন রোযা ভেঙ্গে ফেল আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যায় তবে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো একই ভাবে শাবানেরও।" এবং (আবু দাউদ, ২৩১৮) আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) শাবান মাসের দিন গণনার ক্ষেত্রে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং যখনই তিনি নতুন চাঁদ দেখতেন তখন রোযা রাখা শুরু করতেন। আর যদি তিনি নতুন চাঁদ দেখতে না পেতেন তাহলে শাবানের ত্রিশদিন পূর্ণ করে রোযা রাখতেন। সুতরাং তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন নি যে, কখন রমযান মাস শুরু হয়। চাঁদের প্রত্যক্ষদর্শী সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, (নাসাঈ, ২১১৮) "যখন দুইজন মুসলিম ব্যক্তি চাঁদ দেখে তখন রোযা ভেঙ্গে ফেল অথবা রোযা আরম্ভ করো।" অর্থাৎ চাঁদ উঠেছে কিনা তা জানার জন্য দুইজন মুসলিম প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়োজন। কিন্তু কিছু আলেম বলেন যে, রোযা শুরু করার জন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীই যথেষ্ট, কারণ হাদীসে আছে, (আবু দাউদ, ২৩৩৫) "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন লোকজন রমযানের নতুন চাঁদ দেখার চেষ্টা করছিলো তখন আমি মুহাম্মদ (ﷺ) কে বললাম, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি, তখন তিনি রোযা আরম্ভ করলেন এবং সকলকে রোযার জন্য নিদের্শ দিলেন।"

সুতরাং অধিকাংশ আলেম বলেন যে, রোযা শুরু করার জন্য একজন দর্শক হলেই চলবে তবে রোযা ভঙ্গ করা তথা রোযা শেষ করার জন্য দুইজন চাঁদ প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়োজন।

প্রশ্ন: কোন ধরনের লোক চাঁদ দেখলে তাদের চাঁদ দেখার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সুনানে নাসাঈ, ২১১৮) "দুইজন মুসলমান ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখলে রোযা আরম্ভ অথবা ভেঙ্গে ফেল।"

সুতরাং প্রধান শর্ত হলো দুইজন মুসলমান হতে হবে। এখানে আরবি **'আদল'** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আদল বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যেসব ফরজ ইবাদতগুলো পালন করে এবং যেকোনো কবীরা গুনাহ করে না।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, (সূরা- কাসাস, আয়াত- ২৬) **"বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতা তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার চাকর হিসাবে সে- ই উত্তম হবে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"**

তৃতীয়ত, তাকে বিশ্বস্ত হতে হবে। কুরআনে এসেছে যে, (সূরা নামল, আয়াত- ৩৯) **"দৈত্য- জ্বীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।"** সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীকে বিশ্বস্ত হতে হবে।

প্রশ্ন: রোযার চাঁদ দেখার জন্য জ্যোতিষীর সাহায্য নেওয়া যাবে কি? যদি কেউ এভাবে চাঁদ দেখে তবে সাধারণ মানুষের সেই চাঁদ দেখার দরকার আছে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: জ্যোতিষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখার ঘটনা ঘটে তাদের দ্বারা যাদের ইসলামী জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, (আবূ দাউদ, ২৩১৩) **"ইবনে ওমর (রা.) বলেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন কোনো ধরনের জ্যোতিষীর প্রমাণ ছাড়াই।**

সুতরাং জানা গেল যে, রোযা রাখতে হবে শুধুমাত্র চোখ দ্বারা চাঁদের উপর ভিত্তি করে। শেখ ইবনে তাইমিয়া বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "আমরা অশিক্ষিত জাতি ছিলাম।" এর দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি আমাদেরকে প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, আমরা ছিলাম খুবই সাধারণ এবং আমাদের অন্য কোনো মাধ্যম ছিলো না কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। অর্থাৎ আমরা একটা অত্যন্ত সহজ পথ অনুসরণ করি। তাছাড়া মহানবীর (ﷺ) উদ্দেশ্য ছিলো সহজ সরল পথে চলা যেখানে মানবজাতির অন্য সবকিছুর সহজ করা হয়েছে সেই কারণে তিনি কোনো অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেন নি।

সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যার পন্থা রোযার চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় বরং নিজের চোখে স্বাভাবিক পন্থায় চাঁদ দেখতে হবে।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখেছে বলে দাবি করছে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: জ্যোতির্বিদ্যা ব্যবহার করার ধারণাটা একেবারেই ভুল। কোনো মুসলমানের নতুন চাঁদ দেখার দাবির পুনঃনিশ্চয়তার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবেই ভুল। তার কারণ হলো:

* জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ যদি প্রত্যক্ষদর্শীর দাবির বিপক্ষে যায় তাহলে ঐ ব্যক্তি, কুরআন এবং হাদীসের উপর সন্দেহ পোষণ বোঝায় অর্থাৎ কুরআন হাদীসে আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস নেই।

* জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে গেলে সকল ইবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে।

* এটা মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাদীসের বিপক্ষে যায়।

* কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- নিসা, অধ্যায়- ৪, আয়াত- ১৭১)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

অর্থ: "হে আহলে কিতাব, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।"

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (নাসাঈ, ৩০৫৯) "অতিরঞ্জন করো না, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো অতিরঞ্জনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।" সুতরাং বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

* লোকেরা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৯) যখন তোমরা চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ এবং যখন চাঁদ দেখ তখন রোযা ভেঙ্গে ফেল।"

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (সহীহ মুসলিম, ২৩৯৩) "এক সময় একজন সাহাবা উমরার হজ্ব পালন করছিলেন। মক্কায় পৌঁছার পূর্বে তিনি নতুন চাঁদ দেখেছিলেন যেটি ছিলো দুই তিন দিনের পুরাতন। যখন তিনি একথা ইবনে আব্বাস (রা.) কে বললেন তখন তিনি বললেন,

যখন চাঁদ দেখ তখন রোযা আরম্ভ করো আর যদি চাঁদ পুরাতন হয় তবে সম্ভব হলে ত্রিশটি রোযা পূরণ করো।” সুতরাং এই একটি হাদীসই জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার না করার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি তার নিজ দেশে অবস্থান কালে রোযা আরম্ভ করলো তারপর অপর একটি দেশে ভ্রমণ করতে গেল। দ্বিতীয় দেশটিতে তার নিজের দেশের চেয়ে দু’দিন পরে মাস আরম্ভ হয়। এমতাবস্থায় সে কি নিজের দেশের সময় অনুযায়ী নাকি ভ্রমণকৃত দেশের সময় অনুযায়ী রোযা শেষ করবে? ভ্রমণকৃত দেশের সময়ানুযায়ী রোযা করলে রোযা ৩১/৩২টি হয়ে যাবে। তাহলে কোনটি সঠিক, কি করতে হবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৭, ১৯০৯) “তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং নতুন চাঁদ দেখলে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে।” এবং (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৭) “রোযা ঐদিনে আরম্ভ হবে যেদিস সকলে রোযা রাখবে আর ঐদিন রোযা ভাঙ্গতে হবে যেদিন সকলে ভাঙ্গে এবং কুরবানি করতে হবে ঐ দিনে যেদিন সকলে কুরবানি করে।” অর্থাৎ এখানে জামায়াতের সাথে বা সংঘবদ্ধভাবে রোযা পালন করতে বলা হয়েছে। একাকী করতে বলা হয় নি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তখন রোযার ক্ষেত্রে তাকে ঐ দেশের নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হবে যে দেশে সে অবস্থান করছে। ঐ ব্যক্তি যখন নিজের দেশ থেকে দ্বিতীয় কোনো দেশে যাবে তখন তাকে ঐ দেশের লোকের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে যদিও তাকে ২/৩টা রোযা বেশি রাখতে হবে। একই ভাবে, সূর্যাস্তের সময় হিসাব করতে হবে এবং দ্বিতীয় দেশে যদি ঐ ব্যক্তির নিজ দেশের চেয়ে ২ দিন আগে রোযা আরম্ভ হয় তবুও ঐ দেশের সাথে তাল মিলিয়ে যেতে হবে যদিও তার রোযা ২৮টি হবে। তবে পরে তাকে অবশ্যই একটি বা দুইটি রোযা রাখতে হবে, কারণ রোযা কখনও ২৮টি হয় না। সুতরাং তাকে দুইটি রোযা ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

প্রশ্ন: পৃথিবীর মুসলমানরা সকলে এক সাথে রোযা রাখা, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা পালন করার ব্যাপারে একতাবদ্ধ নয় কেন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। এক দল আলেম বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমানদের মক্কার সময় অনুসরণ করা উচিত। অন্য দলের আলেমগণ বলেন, এই সময়টি বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সময়ে হওয়া উচিৎ।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৫)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: “রমযান মাসই হলো এমন মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যবাদীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; জটিলতা কামনা করেন না- যাতে তোমরা পূরণ করো..........।”

মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৭, ১৯০৯) “তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ এবং নতুন চাঁদ দেখলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।” সুতরাং এই হাদীসটির উপর ভিত্তি করে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন যে, সারা বিশ্বের সব জায়গা থেকে একই দিনে রমজানের নতুন চাঁদ দেখা অসম্ভব। সুতরাং মক্কার সময়টি সারাবিশ্বের একযোগে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। মুহাম্মদ (ﷺ) আরো বলেছেন, (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৭) “ঐ দিন রোযা আরম্ভ হবে যেদিন সকলে রোযা রাখবে, রোযা ভাঙ্গতে হবে ঐ দিন যে দিন সকলে রোযা ভাঙ্গে আর কুরবানি করতে হবে ঐ দিন যে দিন সকলে কুরবানি করে।”

কুরআনে বলা হয়েছে যে, (সূরা- বাকারা, অধ্যায়- ২, আয়াত- ১৮৭)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থ: “আর আহার করোও পান করো যতক্ষণ না তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোরবেলার সাদা কিরণ কালো ছায়া থেকে, তারপর রোযা সম্পূর্ণ করো রাত্রি সমাগম পর্যন্ত।

কিন্তু সূর্যোদয় সারা বিশ্বে একই সময় হয় না বরং একেক দেশে সময় হয়ে থাকে। সুতরাং রোযা পালনে স্থানীয় সময় অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন: যে শহরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রমযান এবং ঈদ পালন করা হয় সেই শহরের লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এই ব্যাপারটি হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন, (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৭) **"রোযা শুরু এবং ভাঙ্গার দিন ঐটি যে দিন সকলে রোযা শুরু করে এবং ভাঙ্গে। একইভাবে কুরবানির দিন ঐটি যে দিন সকলে কুরবানি করে।"** সুতরাং একই শহরের লোকদের একই সাথে রোযা এবং ঈদ করা উচিত কারণ এমন কোন বড় শহর নেই যেখানে একই দিনে চাঁদ দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের এক সাথে রোযা পালন করা উচিত।

প্রশ্ন: রমযানের নতুন চাঁদের প্রত্যক্ষদর্শী যদি কোনো নারী হয় তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফার মতে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে নারীর চাঁদ দেখার ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফী রহ. বলেন, নারীদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। শেখ হুতাইসিম বলেন, নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তিনি এ ব্যাপারে যে কারণ দেখিয়েছেন তাহলো- হাদীসে বলা হয়েছে যে, রমযানের নতুন চাঁদের ব্যাপারে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়োজন এবং সেখানে যে আরবি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো- 'শাহেদাইন' কিন্তু নারীদের জন্য ঐ শব্দটি হলো 'শাহেদা', 'শাহেদা' নয়। সুতরাং এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে তারা বলেন যে, নারীরা এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আরেক দল আলেম আছেন যারা বলেন, শরীয়তের নিয়ম নারী পুরুষ সকলের জন্য সামন। তারা বলেন, আয়েশা (রা.) ২২০০টিরও বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদি তার হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য হয় তবে নারীদের সাক্ষ্য বা চাঁদ দর্শন গ্রহণযোগ্য হবে না কেন? সুতরাং এই মতটি অনেক শক্তিশালী। অতএব নারীদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

রমযানের ৩০তম শিক্ষা

ঈদ ও ঈদের দিন করণীয়

প্রশ্ন: জনাব জাকির নায়েক, বিশেষ ব্যবহৃত শব্দ "ঈদ" এর সংজ্ঞা দেবেন কি?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঈদ এমন একটি শব্দ যার অর্থ হলো এমন কোনো কিছু যেটি নিয়মিত ঘটে থাকে। অন্য অর্থ হলো ফিরে আসা, পুনরায় ঘটা ইত্যাদি। সংক্ষেপে হলো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার ঈদ শব্দটিকে একটি বিশেষ জায়গাকে বোঝান যেতে পারে যেখানে মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর মিলিত হয় এবং বিশেষ ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। অর্থাৎ ঈদ হলো এক ধরনের বিশেষ সমাবেশ। মুসলমানরা প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট

সময়ে এই সমাবেশে ফিরে আসে সেই কারণে এটাকে ঈদ বলা হয়। এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবী বলেছেন, এই বিশেষ সমাবেশকে ঈদ বলা হয়, কারণ প্রতিবছর মুসলমানদের সমাবেশের ঘটনা ঘটে থাকে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ঈদ শব্দটি আরবি **'আদাহ'** হতে এসেছে যার অর্থ- রীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস অনুযায়ী ঈদের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, **"কোনো একদিন মুহাম্মদ (ﷺ) মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং এর আগে জাহেলিয়াত যুগে সেখানে বছরে দুইটি দিনকে আনন্দ উল্লাসের সাথে পালন করা হতো। তাদের একটি হলো- নেহরাজ এবং অপরটি হলো 'মাহরাজান'। বর্তমানে আল্লাহ ঐ দুটি দিনকে অন্য দুইটি দিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন। যেটি পূর্বের তুলনায় অধিক উত্তম। একটি হলো নহরের দিন অর্থাৎ কুরবানির দিন এবং অপরটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং এই দুইটি দিন দ্বারা দুই ঈদের দিনকে বোঝান হয়েছে।"** (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২০০৬)

সুতরাং এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঈদ অর্থ আনন্দ, উল্লাস ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ঈদের নামাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গুলো কী?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: "আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, দুইটি দিনে রেযা রাখা নিষিদ্ধ। একটি হলো ঈদুল ফিতর এবং অপরটি ঈদুল আযহা।" (মুসলিম, অধ্যায় রোযা, হাদীস নং ২৫৩৪)

ঈদের নামাজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফী ও ইমাম মালিকদের মতে ঈদের নামাজ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ; মুস্তাহাব।

তারা এই মতামত দিয়েছেন নিম্নোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে। হাদীসটি হলো- **"পাঁচ ওয়াক্ত নির্দেশিত নামাজের বাইরে আল্লাহ তা'আলা আর কোনো নামাজ আমাদের জন্যে ফরজ করেন নি।"** (আল মুগনি, পৃ. ২২৩)

সুতরাং দুই ঈদের নামাজ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম হাম্বলি বলেছেন, এটি ফরজে কিফায়া অর্থাৎ কোনো সম্প্রাদায়ের কিছু লোক এই নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট। সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তৃতীয় মত হলো, ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন, এটি ফরজ এবং ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন, ঈদের নামাজ ফরজ। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুরআনের উপর ভিত্তি করে।

অর্থ: “আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।” (সুরা-কাউছার, আয়াত ২)

সুতরাং তারা বলেন যে, দুই ঈদের নামাজ আদায় করা ফরজ এবং অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে মুহাম্মদ (ﷺ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের উচিত ঈদের নামাজ আদায় করা এবং এটি শুধু সাধারণ মুসলিমদেরকেই বলা হয় নি বরং ঋতুবতী নারীদের ক্ষেত্রেও এমনটি বলেছেন যে, তাদেরকেও ঈদের মাঠে যেতে হবে যদিও তারা নামাজ আদায় করতে পারবে না।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, **“মহিলাদের কমপক্ষে ঈদের নামাজের স্থানে যাওয়া উচিত এবং শিশুদেরও ঈদে যাওয়া উচিত.............।”** **(বুখারী, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ৩৫১ ও ৩২৪)**

সুতরাং হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে আবূ হানিফা এবং ইবনে তাইমিয়া ঈদের নামাজ ফরজ বলে মতামত দিয়েছেন। মহানবী এরশাদ করেন, **আমাদের একই সাথে দুইটি ঈদ অতিবাহিত করছি। একটি হলো ঈদুল ফিতর এবং যুমআর সালাত। অতঃপর ঈদের সালাত আদায় শেষে তিনি বললেন, যারা যুমআর নামাজ আদায় করেনি তারা ইচ্ছা করলে আর আদায় করার দরকার নেই।”** **(আবূ দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১০৬৮)**

এটা নির্দেশ করে যে যেহেতু ঈদের নামাজ আদায় কর হয়েছে, তাই যুমআর নামাজ আদায় না করলেও চলবে। যদিও যুমআর নামাজ নির্দেশিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং হাদীস থেকে এটা নির্দেশিত হয় যে, ঈদের নামাজ ফরজ এবং আমি নিজে এই মতের সাথে একমত।

প্রশ্ন: ঈদের দিন কত সকাল থেকে এবং সর্বশেষ কোন সময়ে নামাজ আদায় করা যাবে? (ঈদের নামাজ)

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: সকালে সূর্য যখন দিগন্ত থেকে প্রায় তিন মিটার উপরে থাকে এবং সেটি যখন মধ্যাহ্নে পৌঁছে, এই সময়ের ভিতরে যেকোনো মহূর্তে ঈদের সালাত আদায় করা যাবে। অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন যে, ঈদের নামাজের সময় শুরু হয় সূর্যোদয় হতে এবং সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। হাদীসে এসেছে, **“কোন এক সময় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে ছিলেন এবং তিনি সেখান থেকে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আজহার সালাত আদায় করতে গেলেন এবং তিনি এটা পছন্দ করলেন না**

যে, ইমামের নামাজে দাঁড়াতে দেরি করা উচিত।” (আবূ দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৩১)

সুতরাং সকাল সকাল নামাজ আদায় করে নেওয়া উত্তম। ইবনে কুদামা তার বইতে লিখেছেন যে, “পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের ক্ষেত্রে, যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় ততই উত্তম এবং ঈদুল ফিতরের নামাজের ক্ষেত্রে একটু দেরি করা উচিত। কেননা ঈদুল ফিতরের দিনে লোকেরা সকাল বেলা ফিতরা, দান খয়রাত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং এগুলো হলো ঈদের নামাজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। (আল মুগনি, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৪)

প্রশ্ন: ঈদের নামাজ পড়ার সহীহ- শুদ্ধ পদ্ধতি কেমন?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

* কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার নামাজ অবশ্যই দুই রাকআত আদায় করতে হবে। একটি হাদীসে ওমর (রাঃ) বলেছেন, মুসাফিরের জন্যে নামাজ দুই রাকাত। ঈদের নামাজ দুই রাকাআত এবং জুমার নামাজ দুই রাকাআত এবং এগুলো মুহাম্মদ (ﷺ)- এর নিকট থেকে এসেছে।” (সুনানে বায়হাকি, অধ্যায় জুমা‘আ, হাদীস নং ৫৭১৯)

সুতরাং ঈদের নামাজ দুই রাকাআত পড়তে হবে।

* ঈদের নামাজের জন্যে কোনো আযান এবং ইক্বামাতের দরকার নেই। সাহাবী যাবির ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, “তিনি মুহাম্মদ (ﷺ)- এর সাথে এক কিংবা দুইবার উভয় ঈদ পালন করেছেন এবং সেই সালাতে কোনো আযান এবং ইক্বামাত ছিলো না।” (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫৫)

* ঈদের নামাজ আদায় করা শুরু করলে আদায়কারীকে প্রথমে ‘তাকবীর আল ইহরাম’ বলা উচিৎ অর্থাৎ আল্লাহু আকবার এবং প্রথম রাকাআতে এটি সাত বার অনুসরণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ‘পাঁচ তাকবীর’ বলতে হবে। এগুলো আমরা সহীহ হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, “মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করতেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর বলতেন।” (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৪৫, ১১৪৬)

এরপর পড়তে হবে আউযুবিল্লাহ .... রহমানির রহিম এবং তারপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। প্রথম রাকাআতে ফাতিহার পরে সূরা কা'ফ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতিহার পরে সূরা কামার অথবা প্রথম রাকাআতে সূরা আলা' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা গশিয়াহ' পড়তে হবে এবং এই উভয়ই সহীহ হাদীস থেকে গৃহীত। কিন্তু এই দুটি ছাড়া অন্য সূরা দ্বারা নামাজ পড়লেও নামাজ গৃহীত হবে, সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। তবে হাদীসে উল্লিখিত সূরা দ্বারা নামাজ আদায় করা সুন্নাত।

* ঈদের সালাত আদায়ের পরে খুৎবা দিতে হবে। হাদীসে উল্লেখ **আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "মুহাম্মদ (ﷺ) ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) এর সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। তাদের সকলেই প্রথমে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন তারপরে খুৎবা পাঠ করেছেন।" (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৬২)**

সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের সালাত আদায় করার পরে এবং খুৎবা পড়ার আগে বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা খুৎবা শুনতে চাও, তারা শুনতে পারো। আর যারা শুনতে চাও না তারা যেতে পারো।" (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫১)**

কিন্তু বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অধিকাংশ সময় ইমামরা বলেন যে, আপনারা কেউ উঠবেন না। এবং তিনি মুসল্লিদেরকে চলে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং এটাও বলেন যে, চলে যাওয়া হারাম। এগুলো খুবই অন্যায় কথা। তবে খুৎবা শ্রবণ করা উত্তম কিন্তু সেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছার সুযোগ রয়েছে।

যেমনটি আছে, **জুমার দিনে আগে ঈদের নামাজ আদায় করলে পরে জুমার নামাজ আদায় করা আর না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার। সুতরাং এগুলোই ঈদের নামাজের পদ্ধতি। (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১০৬৮)**

প্রশ্ন: ঈদের নামাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঈদের নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক, এমনকি শিশু ও নারীদের জন্যেও, যদিও হোক সে ঋতুমতী। হাদীসে বর্ণিত আছে, **উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা নির্দেশিত হয়েছিলাম যে প্রত্যেক নারীকে ঈদের নামাজের জন্যে যেতে হবে যদিও সে ঋতুমতী হয়। যদিও ঋতুমতী নারীরা ঈদের নামাজে যাবে কিন্তু তাদের সেখান থেকে দূরে থাকা উচিত।" (বুখারী, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ৩৫১)**

মুছান্নাফ ইবনে শায়বা'র ৫৭৮৬ নং হাদীসে বলা হয়েছে যে, "ইবনে ওমর ঈদের দিনে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতে যেতেন।" সুতরাং ঋতুমতী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের ঈদের মাঠে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার উচিত যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা। বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায়ের ২৫ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের জামায়াতে যোগ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কী করা উচিত? উত্তরে বলা হলো, যতদ্রুত সম্ভব ঈদের নামাজ আদায় করে নেবে।"

আরো বর্ণিত আছে, "কিছু লোক মহানবী (ﷺ)- এর নিকট এসে বললো, আমরা গত কাল নতুন চাঁদ দেখেছি। তখন মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, রোযা ভঙ্গ করো এবং আগামী কাল ঈদের নামাজ আদায় করে নিবে।" (আবু দাউদ, অধ্যায় সালাত, হাদীস নং ১১৫৩)

অর্থাৎ যদি কেউ যৌক্তিক কারণে ঈদের জামায়াত মিস করে তবে যতদ্রুত সম্ভব সেটি আদায় করে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: ঈদের দিন এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানান উচিত? এক্ষেত্রে 'ঈদ মুবারক' বলাটা কতখানি যৌক্তিক?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঈদের দিনে অপরকে অভ্যর্থনা জানানোর সুন্নতি মাধ্যম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাহাবিরা ঈদের দিন একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাতে "তাকাব্বাল্লাহু মিন্নাহু মিনকুম" বাক্যটি ব্যবহার করতো।" (ফাতহুল বারি, অধ্যায়- ২, পৃ. ৪৪৬)

যেহেতু রমজান মাসে রোযা রাখা, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ক্ষমা প্রার্থনা এবং দু'আ করা হয়। সেহেতু যখন রমযান মাস সমাপ্ত হয়ে যায় তখন একে অপরকে এই বলে অর্ভ্যথনা করা হয় যে, "আল্লাহ তোমাদেরকে এবং আমাদের থেকে গ্রহণ করুন।" এটিই হলো ঈদের দিনে একে অপরকে অভ্যর্থনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ঈদ মুবারক শব্দটি বিশেষত উপমহাদেশের দেশগুলোতে ব্যবহৃত হয়। মুবারক শব্দটির অর্থ দয়া। সুতরাং ঈদ মুবারক শব্দের অর্থ হলো- দিনটি দয়াপূর্ণ হোক। এবং এটাকে তারা অভ্যর্থনা হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং ঈদ মুবারক শব্দটি অভ্যর্থনা হিসাবে ব্যবহার করা সুন্নাত সম্মত নয়। কিন্তু এটি বলা হারাম কিংবা মাকরূহ নয় বরং এটি মুবাহ

ঐচ্ছিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে অভ্যর্থনা হিসাবে ঈদের দিনে যেটি ব্যবহার করা উচিত সেটি হলো- **"তাকাব্বাল্লাহু মিন্নাহু মিনকুম"** এবং এটাই হলো সুন্নাত।

প্রশ্ন: ঈদের দিনে কী কী কাজ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ঈদের দিনে যে সকল কাজ কাতে হবে সেগুলো হলো:

* গোসল করতে হবে। আল মুয়াত্তার ৪২৮ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদের নামাজের পূর্বে গোসল করতেন।" সুতরাং ঈদের নামাজের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত।

* পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উত্তম জামা কাপড় পরিধান করা সুন্নাত।

* মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় খেজুর খেতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে খেজুর খেতেন।"** **(বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৩)**

* ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়া উচিত। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের দিন নামাজ আদায় করার জন্যে ঈদগাহে যেতেন।"** **(অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৬)**

সুতরাং ঈদগাহে নামাজ আদায় করা সুন্নাত অন্যথায় এই নামাজ মসজিদে আদায় করতে হবে। আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করা মসজিদুল হারা ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো মসজিদে নামাজ আদায় করার তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। তথাপি তিনি ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যে মসজিদ ত্যাগ করে ঈদগাহে যেতেন।"** **(বুখারী, অধ্যায় হারামাইন, হাদীস নং ১১৯০)**

আরো উল্লেখ আছে যে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদগাহ থেকে বাড়ী ফেরার পথে ভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করতেন অর্থাৎ যাওয়ার সময় এক রাস্তা ব্যবহার করতেন এবং ফিরে আসার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে আসতেন।"** **(বুখারী অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৮৬)**

* সকাল সকাল ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া উচিত।

* হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "মুহাম্মদ (ﷺ) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন।" (বুখারী অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৫৩০) সুতরাং পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। সিলসিলা আল নাহিয়ান গ্রন্থের ১৭১ নম্বার হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের দিন বাড়ী হতে বের হয়ে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর/তালবিয়া পাঠ করতেন।" এবং সর্বোত্তম তালবিয়া হলো সেটি, যেটা ইবনে মাসউদ (রাঃ) পাঠ করতেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, "ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিম্নের তাকবীর পাঠ করতেন। তাহলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।" (দার আল কুতনি এবং মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং ৫৬৬০)

সুতরাং আমাদেরও এটা পাঠ করা উচিত। অতএব এগুলোই হলো ঈদের দিনে পালনীয় কর্মসমূহ।

প্রশ্ন: ঈদের দিন গান, বাদ্য, আনন্দ ফূর্তি ইত্যাদি করা কী অনুমোদিত?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: ইসলামী শরীয়তের সীমানার আওতায় এগুলো করার অনুমোদন আছে। বর্ণিত আছে যে, "পূর্বে মদীনাবাসী দুইটি দিনে আনন্দ ফূর্তি উদযাপন করতো এবং আল্লাহ তায়অলা ঐ দুটি দিনকে পরে দুইটি ঈদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দিয়েছেন।" (সুনানে নাসাঈ, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ১৫৫৭)

ঈদের দিনে গান বাদ্য করার ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঈদের দিনে লোকেরা খেলাধূলা করতো এবং গান গাইতো।" অর্থাৎ ঈদের দিনে এগুলো হতে পারে। (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫০)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিনে দুটি আনসারি তরুণী গান গাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা গান গাচ্ছো তাও আবার মুহাম্মদ (ﷺ)- এর বাড়ীতে? অতঃপর তিনি তাদেরকে গাইতে দাও। কারণ আজ ঈদের দিন।" (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫২)

সুতরাং সীমিত আকারে গান হতে পারে কিন্তু ইন্সট্রুমেন্ট, বাদ্য ইত্যাদি বাজান হারাম এবং ইসলামী সংগীত গাইতে কোনো সমস্যা নেই। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "আজ হলো ঈদের দিন। সুতরাং খাও এবং পান করো।" অতএব, সীমিত আকারে গান, আনন্দ- ফূর্তি করা যেতে পারে। (মুসলিম, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ২৫৩৯ ও ২৫৪০)

প্রশ্ন: ঈদ পালন করার সময় মুসলমানরা সাধারণত কোন ধরনের ভুলগুলো করে থাকে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: এক্ষেত্রে অনেক ধরনের ভুল করে থাকে। এগুলো করা হয় যথার্থ জ্ঞানের অভাব কিংবা গুরুত্ব না দেয়ার কারণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই ঈদের জামায়াতে যোগ দেয় না। মেয়েদের সাথে বেশি মেলামেশা করে, ঈদের মাঠে গল্প গুজব করে, মেয়েরা সুগন্ধি মেখে ঈদের মাঠে আসে হিযাব ব্যবহার করে না। গান বাদ্য করে, সিনেমা দেকে ইত্যাদি। হাদীসে বলা হয়েছে, **"যদি কোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং তা যদি কোন ব্যক্তি ঘ্রাণ নেয় তবে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে।"** (নাসাঈ, অধ্যায় জিনাহ, হাদীস নং ৫১২৯)

সুতরাং নারীদেরকে এটা ত্যাগ করতে হবে। **বুখারী শরীফের পানাহার অধ্যায়ের ৫৫৯০ নম্বর হাদীসে** উল্লেখ আছে **যে, "মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, এমস একটি সময় আসবে যখন আমার উম্মতের কিছু লোক বলবে যে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মদ্যপান, রেশমী কাপড় পরিধান এবং উগ্র উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বাদ্য শোনা হালাল।"** সুতরাং আমরা যেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* অনেক লোক মনে করে যে, রমযান একটি বোঝা এবং এই মাসটি অতিবাহিত হয়ে গেলে তারা খুব বেশি খুশি হয়। কিন্তু এ রকম ধারণা করা উচিত নয় বরং পুরো রমযান মাসটি সুস্থতার সাথে অতিবাহিত করতে পারার জন্যে আল্লাহর কাছে বেশি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

সুতরাং বর্ণিত ভুলগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

প্রশ্ন: মুসলমানদের জন্যে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়া কি বাধ্যতামূলক, না কি মসজিদেও এই নামাজ পড়া যাবে?

উত্তর: ডা. জাকির নায়েক: মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদের নামাজ ঈদগাহে যেয়ে পড়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, **"মুহাম্মদ (ﷺ) ঈদগাহে যেতেন এবং ঈদের নামাজ আদায় করতেন।"** (বুখারী, অধ্যায় ঈদ, হাদীস নং ৯৫৬)

এছাড়া ঈদগাহে গিয়ে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে; ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং ইমাম হাম্বল (রঃ) বলেন, ঈদের নামাজ ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা জরুরি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যদি মসজিদ এ রকম বড় হয় যে, সেটি অত্র এলাকার সকল মুসল্লিকে ধারণ করতে পারে তবে ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে পারে তবে ঈদগাহের দরকার

নেই। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) নিজের মসজিদ ছেড়ে ঈদের দিন তিনি ঈদগাহে নামাজ আদায় করেতে যেতেন, যেটি এই অধ্যায়ের প্রথম দিকের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মসজিদে নববীর চেয়ে ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করার উত্তম স্থান বলে পছন্দ করেছেন। সুতরাং ঈদগাহে নামাজ আদায় করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো যৌক্তিক অসুবিধা থাকে, তবে ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা যেতে পারে। যেমনটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, **"কোনো একবার বৃষ্টির কারণে মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন।"**
(মুসতাদরাক আল হাকিম, সালাতুল ঈদ, ১০৯৪)

সুতরাং গুরুতর কারণে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা যাবে কিন্তু ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা অধিক উত্তম।

রমযান সম্পর্কিত আরো ২০টি বই পেতে এবং
ভালো ভালো ইসলামিক বই পেতে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
www.islamerpath.wordpress.com

ফেসবুকে আমাদের পেইজে লাইক দিন
www.facebook.com/islamerpoth